কে ও কী

নতুন টেকনিকে লেখা পারিবারিক উপন্যাস

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

মূল্য—

প্রথম সংস্করণ
১৩৫৫

সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং ১৫নং কলেজ স্কোয়ার হইতে শ্রীবলাইলাল সেন কর্তৃক প্রকাশিত ও অন্নপূর্ণা প্রেস ৩৩এ, মদন মিত্র লেন হইতে শ্রীফকিরচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

—উপহার—

স্নেহময়ী শ্রীমতী কমলা দেবীকে সস্নেহে দিলাম

পরিচয়

'কে ও কী' ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের পৌষ থেকে ১৩৫৫'র মাঘ পর্যন্ত ধারাবাহিক-রূপে 'মাসিক বসুমতী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বর্তমানে বিশিষ্ট প্রকাশক 'সেন ব্রাদার্স' এণ্ড কোং কর্তৃক তাহা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো।

'গল্পদাদু' নামে আমার যে-সব গল্প উপন্যাস ছেপে বেরিয়েছে, সাধারণতঃ সে-গুলিতেই চলতি ভাষা ব্যবহার করেছি। এর আগে আমার লেখা আর কোন উপন্যাস এই টেকনিকে লিখি নাই—নতুন টেকনিকে লিখিত এই বইখানি পাঠক মহলের প্রীতিপ্রদ হলে পরবর্তী উপন্যাস সম্পর্কে এই ধারার অনুবর্তী হতে প্রয়াস পাব।

কোন বিশিষ্ট চিত্র প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গ্রন্থখানি শীঘ্রই চিত্রে রূপায়িত হবে।

সাহিত্য-ভবন
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৩

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কে ও কী

পীতাম্বর কালীপ্রতিমা গড়ছিল বাইরের চালা-ঘরটির দাওয়ায় বসে। দাওয়াটি বেশ চওড়া, চারিদিকের আলো এসে পড়েছে, আশে পাশে সাজ-সরঞ্জামগুলি সাজানো। চালাটির পিছনে একটি দরজা, বাড়ীর ভিতরে এই দরজা দিয়ে যাতায়াত চলে। সামনে এক ফালি জমি, তার পরেই গ্রামের রাস্তা। ষাটের কোঠায় পড়লেও পীতাম্বরের দেহ এখনো ভেঙ্গে পড়েনি—দীর্ঘ সবল দেহযষ্টি দিব্যি মজবুত, মনটিও বেশ নির্মল আর স্নেহপ্রবণ, সহজেই গলে যায়; কিন্তু অতি-বড় কোন প্রিয়জনও যদি তাঁর মতের বিরুদ্ধে কিছু বলে বা করে, তাহলেই এই স্নেহময় মানুষটি এক লহমায় একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে ওঠে। এর ফলে, এমন অনর্থও তাঁকে পোহাতে হয় যে কহতব্য নয়!

একসঙ্গে অনেকগুলি প্রতিমার বায়না নিয়ে যা-তা করে কাজ চালিয়ে দেবার পাত্রই নয় পীতাম্বর। প্রতি প্রতিমাখানি সে ভক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে গড়ে, তাতেই তার আনন্দ। পীতাম্বর ব্রাহ্মণ, শুদ্ধাচারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। সুতরাং ধ্যানমূর্ত্তির সঙ্গে মিলিয়ে সে, সত্যিকারের প্রতিমাই গড়ে, এ ব্যাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল সে। আর্টের নামে কেহ তাকে ঐ পর্য্যন্ত আদর্শ-ভ্রষ্ট করতে পারেনি, আর এদিক দিয়ে আর্থিক ক্ষতিকেও সে দৃকপাত করেনি। কাজেই তার এই পেশাটি রীতিমত সাধনার মত হয়ে আয়ের পথেও অনেকখানি বাধার সৃষ্টি করেছে।

আজ পীতাম্বরের মনটি প্রসন্নতায় ভরে উঠেছে। খুব ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে একটানা এতক্ষণ কাজ করে প্রতিমার চক্ষুদুটি এঁকে নিশ্চিন্ত হয়েছে সে। গুন্ গুন্ করে একটি প্রাসঙ্গিক রামপ্রসাদী

কৌও কী

গান গাইতে গাইতে নিবিষ্ট মনে তুলি চালাচ্ছিল ; হাতের কাজটি শেষ হতে তুলিটা তুলে ভাবময় দৃষ্টিতে প্রতিমার সমুজ্জ্বল মুখখানির পানে তাকাতে তার মুখখানিও আনন্দে ভরে গেল—জগন্মাতার ধ্যান-মূর্ত্তির প্রতিবিম্বই ফুটিয়ে তুলেছে সে। এতক্ষণে তার ছুটি—এখন সে নিশ্চিন্ত। স্নিগ্ধ স্বরে জোর গলায় ডাকল : মায়া, মায়া, কোথায় রে ?

ভিতর থেকে মায়া উত্তর দিল : এই যে বাবা, কেন ?

পীতাম্বর : দেখে যা মা—মায়ের প্রতিমায় চক্ষুদান করেছি, মনের মতই প্রতিমা গড়েছি রে ! অমনি তামাকটা সেজে আনিস মা।

বাহিরের চালার ওদিকে বাড়ীর ভিতরে ঢুকলে প্রথমেই পড়ে পীতাম্বরের শয়ন-ঘর। তার একমাত্র কন্যা চতুর্দ্দশী তরুণী মায়া তখন স্নানান্তে সবেমাত্র ঘরে ঢুকেছে, পরনে ডুরে শাড়ী, ভিজে চুলগুলি পিঠে ছড়িয়ে পড়েছে, কাঁখে জলভরা কলসী।

ঘরের একধারে ছোট একটি জলচৌকির উপর ভরা কলসীটি রাখতে রাখতে মায়া সোল্লাসে বলল : নেয়ে এসেছি বাবা, কাপড়-খানা ছেড়েই যাচ্ছি।

আন্‌লা থেকে কাপড়খানি নিতে হাত বাড়িয়েছে, এমন সময় সেই ঘরখানির পিছনে বাগান থেকে অজকণ্ঠের অনুকরণে একটা বিকৃত স্বর শোনা গেল : মা—য়া !

মায়ার স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুন্দর মুখখানা অমনি বিরক্তিতে কঠিন হয়ে উঠলো, কাপড়খানা টেনে নিয়ে বললো : আবার সেই হাবাতে ছাগলটা এসেছে বুঝি ? দাঁড়া, আজ ঠেঙিয়ে তোর ছালখানা ছাড়াচ্ছি—

কিন্তু জানালার দিকে দু'পা এগিয়েই দেখে—আওয়াজটা ছাগলের নয়—একটা ছেলের। মায়ার চেয়ে বছর পাঁচেক বড়—দিব্যি সুশ্রী

সুন্দর বাড়ন্ত ও বলিষ্ঠ গড়নের সেই ছেলেটি জানালার গরাদে ধরে দাঁড়িয়ে —চোখ-মুখ দিয়ে সকৌতুক-হাসি যেন ঠিকরে পড়ছে মায়ার দিকে।

দেখেই মায়ার মুখেও হাসি ফুটে উঠছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কপট কোপে মুখখানা বেঁকিয়ে মুখের হাসিটুকু ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা করে বলে উঠলো সে: দাঁড়াতো রে, ছাগলটার কান ধরে বিদেয় করি, রোজ রোজ চুরি করে বাগানে ঢোকা বা'র করি।

ছেলেটির নাম মৃগেন। পাড়া-প্রতিবাসী যাদব রায়ের ছেলে। গরাদের ফাঁক দিয়ে কানটা বাড়িয়ে দিয়েই সে হাসিমুখে বললো: ঐ হাতে ধরা দেবার জন্যই ত রাত-দিন আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়াই; কিন্তু ধরা ত দূরের কথা, দেখাই পাই না যে দু'দণ্ড কথা কই!

মায়া জোর করেই যেন সহাস্য মুখখানাকে শক্ত করে একটু ভারিক্কি ভাবেই বললো: খুব হয়েছে—আর যাত্রার ঢংয়ে কথা কইতে হবে না মশাই! রাত-দিন যাত্রার পালা লিখে লিখে সব সময়ই যেন যাত্রার র‍্যাক্টো চলেছে। এদিকে যাত্রা, ওধারে মনসার পালা, বাবা রে বাবা—কানযেন ঝালাপালা!

মনসার পালার নামেই যেন ছেলেটির পিলে চমকে গেল ভয়ে, বলে উঠলো সে: তোমার ছোড়দা, মানে আমাদের অতুলদা বাড়ী আছে না কি?

ছেলেটির ভয় দেখে মেয়েটির মুখে উঠলো হাসির ঝিলিক, কিন্তু ছেলেটির চোখে সে হাসি যাতে না পড়ে এমন কৌশলে চেপে সে কপট গম্ভীরভাবে বললো: আছে বোলে? দেখ না ওদিকে গিয়ে! তোমারই ত খোঁজ করছিল। দেখতে পেলে না কি……এই পর্য্যন্ত বলেই সে হাতখানি তুলে মারবার ইঙ্গিত করলো।

শুনেই মৃগাঙ্ক মুখখানা চূণ-করে বললো : তবে আমি যাই।

মৃগেন গরাদে ছেড়ে নামছিল, কিন্তু মায়া এগিয়ে গিয়ে হাতখানি খপ্ করে ধরে বুললো : কাকাবাবু বেছে বেছে নাম রেখেছেন মৃগ, ঠিক হোয়েছে ; আমি হোলে আরো একটু এগিয়ে যেতুম, নাম রাখতুম—ভ্যাড়া।

মুখখানা আর একটু বাড়িয়ে মৃগেন বললো : তোমার কাছে ত ভ্যাড়া হয়েই আছি ! তাতে ত লজ্জা নেই মায়া ! কিন্তু তোমার ঐ ছোড়দার চাউনি পর্য্যন্ত যে সইতে-পারি না—আচ্ছা মায়া, তোমার বড়দা ত ওরকম নয় !

বড়দা'র নামে একটু উচ্ছ্বসিত হয়েই মায়া বললো : বড়দা আমাদের দেবতা, তা ছাড়া তিনি তোমাকে চিনেছেন ঠিক আমার মতন করে·······

চোখদুটো বড় করে মৃগেন বললো : তার মানে ! তোমার মতন তিনিও ভেবেছেন যে আমি একটি ভ্যাড়া ?

মুখ টিপে হেসে মায়া বললো : নৈলে তোমাকে অত ভালবাসেন।

উৎসাহিত হয়ে মৃগেন বলে উঠলো : সত্যি মায়া, গোকুল দা' আমাকে ভারি ভালবাসেন, দেখলেই হেসে কথা বলেন, কিন্তু অতুলদার কথা আর বোল না—দেখলেই এমনি চোখ-মুখ করে, যেন আমি চোর ! আর কানাই এলে আহ্লাদে অমনি আটখানা ! সেটাও এসে জুটেছে ত ওঁর ঘরে ?

মুখখানা মচকে মায়া বললো : কে রাখে ওই হতচ্ছাড়া বয়াটে ছোঁড়ার খবর, দেখলেই আমার গা জ্বলে যায়—

খুসি হয়ে গলার একটু বেশী জোর দিয়ে মৃগেন বললো : ঠিক বলেছ, ঐ ছোঁড়াই ত যত নষ্টের গোড়া, তোমার ছোড়দাকে লাগায় আমার নামে—

কে ও কী

মুখ-চোখ-হাতের ভঙ্গিতে ইঙ্গিত করে চাপা গলায় ম্যুয়া বলে ওঠে এই সময়ঃ চেঁচিও না, বাবা ওঘরে ঠাকুর গড়ছেন।—ঐ যাঃ, বাবা যে তামাক চাইলেন, আর এমনি তুমি দুষ্টু, কাপড়খানা ছাড়বার পর্য্যন্ত সময় দিলে না—দাঁড়াও, আসছি।

* *

*

বাইরের ঘরে প্রতিমার সামনে বসে পীতাম্বর। চেয়ে চেয়ে দেখছে এখনো কোথাও কোন খুঁত্ আছে কিনা। কিন্তু কোন ত্রুটি না দেখে খুসিতে মনটি ভরে গেছে—গানের সুরটি ভাঁজতে ভাঁজতে রংয়ের সরা-তুলি তুলে কুলুঙ্গীর উপর রাখতে গেছে, এমন সময় দেখতে পেল রাস্তা দিয়ে যাদব রায় হন্ হন্ করে চলেছে। পীতাম্বর ডাক দিল: যাদব নাকি হে? বলি, দেখতেই যে পাই না আজকাল! চলেছো কোথায়?

যাদব রায় প্রতিবাসী এবং স্বজাতি। বয়সে পীতাম্বরের চেয়ে ৩।৪ বছর ছোটই হবে। ডাক শুনে থমকে দাঁড়িয়ে তারপর পীতাম্বরের বাড়ীর হাতায় ঢুকতে ঢুকতে বললোঃ আর বলো কেন? সত্য বাগ্‌দি বেটার কাছে খাজনার তাগিদে চলেছি। নামে সত্য হলে কি হবে—বেটা মিথ্যের ধাড়ি—সাক্ষাৎ কলি। তিন দিন ধরে হাঁটছি, তবু তার চুলের টিকিটির খোঁজ নেই।

পীতাম্বর হেসে বললোঃ আরে এসো এসো, একটু গুড়ুক খেয়ে যাও—বসো।

—দাও দুটো টান মেরেই যাই।....বলতে বলতে তালগাছের গুঁড়ি দিয়ে বাঁধা পৈইটে দিয়ে যাদব দাওয়াটির উপরে উঠে এলো। পীতাম্বর বেতের মোড়াটি এগিয়ে দিতেই বসে পড়লো তার ওপর। পীতাম্বর

বসলো তার চৌকিতে। বসতে বসতেই বললো সে : তোমরা বেশ আছ ভাই! টাকা ‥সম্পত্তি‥‥খাজনা · এক গাছ আশা, তা পাওনা টা কত?

যাদব : সে কথা আর বলো কেন। এক টাকা তিন আনা আড়াই পাই—এই আদায় করতে তিন দিনে পায়ের চামড়া উঠে গেল।

পীতাম্বর : ও, তাহলে ত মস্ত সম্পত্তি হে! উঠে-পড়ে লেগে যাও।

যাদব : তুমি ত ঠাট্টা করবেই হে! কিন্তু টাকা-কড়ির ব্যাপারে তিল কুড়িয়ে যে তাল করতে হয়—এ জ্ঞানটুকু তোমার থাকলে ও-সব ছেড়ে-ছুড়ে পুতুল তৈরী করতে লেগে যাও!

পীতাম্বর : কি বললে? আমি কি তৈরী করি?

যাদব : আরে-আরে, চট কেন? বলি, সংসারধর্ম্ম করতে হলে আয়-টায় বাড়াবার দিকেও একটু নজর দিতে হয়। এই যে ঝোঁকের বশে অতবড় বায়নাটা সেদিন ছেড়ে দিলে, বলি কাজটা কি খুব ভাল করেছিলে?

পীতাম্বর : যাও যাও, তোমার তাগাদায় যাও, আর বক্তৃতা দিতে হবে না।

যাদব : আমার কি বল না, তোমার ভালর জন্যই বলি। আমার মৃগকে ত আর তোমার মেয়ের আশায় ফেলে রাখতে পারিনে। তার বিয়ের চেষ্টা করতে হবে। আর, তোমার মেয়েটারও একটা গতি করতে হবে না কি?

ঠিক এই সময় কলকের ফুঁ দিতে দিতে মায়া বাপের হুঁকাটি নেবার জন্যে বাইরের চালাঘরে আসছিল, সংলাপগুলি শুনতে পেয়েই দরজার আড়ালে থমকে দাঁড়ালো। কানদুটি তার বাইরের দুই শ্রদ্ধাভাজনের কথোপকথনে নিবিষ্ট হোল।

পীতাম্বর : সে ব্যবস্থা আমি না করেছি না কি ? ঐ তালতলার বন্দের দুবিঘে লাখরাজ ছেড়ে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দেব। তোমার পণের টাকা কড়ায়-গণ্ডায় পেলেই ত হলো ? সে দু'শো টাকা আমার জোগাড় করাই আছে।

যাদব : বেশ, তা হলেই হলো। কৈ, তোমার গুড়ুক কোথায় হে ?

পীতাম্বর : রোস না, মায়া সেজে আনছে, নেয়ে এসে কাপড় ছাড়ছিল কি না !—বলেই সে আবার একবার মেয়ের নাম ধরে ডাক দিল : অ মা মায়া—হোল রে ?

মায়া তখন হাত বাড়িয়ে এঁদের অলক্ষ্যে দেওয়ালে ঝোলানো হুঁকাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি জল ফেলে ভরতে লাগলো—সাজা কলকেটি ভিতরের দিকের দেওয়ালের গায়ে ছোট একটি কুলুঙ্গীতে রেখে। সেখান থেকেই সাড়া দিল : হয়েছে বাবা. নিয়ে যাচ্ছি।

যাদব : আমি বলছিলাম নিশ্চিন্তিপুরের সেই বায়নাটা নাও ; এখনো আমার হাতে আছে। বল ত কালই পাকা করে ফেলি ! এতে পাবে দু'শো টাকা. তোমার ওই দুবিঘে লাখরাজ আর বেচতে হয় না—

পীতাম্বর : না-না-না—টাকাটাই আমার রক্তমাংস নয় তোমার মতন ; টাকার জন্যে ওদের হুকুম মতন ঐ তোমার কি বলে—'ওরিয়েন' না 'ওরিয়েণ্টো'—আমি ওসব গড়তে পারবো না। ঠাকুরদেবতাকে নিয়ে 'এরার্কি ?" সে আমি করতে পারবো না। মাজা সরু হবে, ঘাড় দোলানো হবে, হাত গাছের ডাল-পালার মতন এলিয়ে থাকবে—না, না, ওসব আমার দ্বারায় হবেনা যাদব ! মায়ের মূর্ত্তি গড়ি বলে টাকার জন্যে ওসব নোংরামী করতে পারবো না আমি।

যাদ : কেন পারবে না শুনি? আর সকলেই ত এখনকার পছন্দ ম ই ঠাকুর গড়ছে।

পীত ্বর : ওরা গড়ে বলেই আমাকে গড়তে হবে? জানো, আমি ধ্যানে যা দেখি তাই গড়ি ; কারুর পছন্দ বা ফরমাসের কোন তোয়াক্কাই রাখি না -আমি আমার আদর্শ হারাই না। খবরদার বলছি—বার দিগর আমার সামনে আর ও-কথা বলো না!

যাদব : ও! আদর্শ! ধ্যান! ধেড়ে মেয়ে যার গলায়, তার মুখে ওসব কথা খাটে না। যাদের টাকা আছে—বড় বড় বুলি ঝাড়া তাদেরই সাজে। আহা ধ্যানের কি মূর্ত্তিই গড়েছেন—দশ টাকা দিয়েও কেউ নেবে না।....

পীতাম্বর : কি! আমার সাধনার অপমান! যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা! যাও তুমি—আমার মেয়ের বিয়ে তোমার ঘরে আমি দেব না—কথখনো না—যাও, যাও—যে মস্ত তশীল করতে কোমরবেঁধে যাচ্ছিলে সেইখানে যাও।

যাদব : হুঁ! বড় বড় কথা! বেশ, আমিও দেখে নেব—কি করে মেয়ের বিয়ে দাও। এই চল্লুম।

হুঁকার জল ফিরুতে ফিরুতে শেষের কথাগুলোও মায়া শুনেছিল, চট করে অমনি সে সাজা কল্‌কেটি হুঁকোর মাথায় বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে ভিতর দিকের দরজা দিয়ে বাইরে এলো, মুখখানা তুলে বেশ সহজ কণ্ঠেই সহাস্যে বললো : তামাক খেয়ে যান কাকাবাবু,—আমার সঙ্গে ত আপনার ঝগড়া হয়নি!

যাদব তখন চটে গেছে, গায়ে জ্বালা ধরেছে। পীতাম্বরের ওপর যে রাগ জমে উঠেছিল সেটা ঝাড়লো মায়ার ওপ্পর। মুখখানা বিকৃত করে বলে উঠলো : এঃ! কাকাবাবু! বেহায়া ধুম্‌সি মেয়ে কোথাকার'....

পীতাম্বর : আমার মেয়েকে অমন করে গাল দিওনা বলছি যাদব, ভাল হবে না...

যাদব : না !—দেবে না !....ফের যদি দেখি কোন দিন মৃগের সঙ্গে মিশছো ত দেখে নেব ! বাপের এত বড় মুখ, বলে কিনা —বেরিয়ে যাও !

ইতিমধ্যে বাড়ীর ভিতর থেকে একটা কলহের কলরব আসছিল বাইরে—পিতা কন্যা উভয়েই উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে ! মায়া ক্রুদ্ধ যাদব রায়ের পানে একবার চেয়েই হুঁকোটি পীতাম্বরের হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে গেল। যাদব এই সময় বললো : এই বেরিয়ে গেলাম— এর জন্যে একদিন পায়ে ধরতে হবে....

শুনেই পীতাম্বর তেতে উঠে ঝংকার দিয়ে বলে উঠলো : যাও, যাও, কে কার পায়ে ধরে তখন দেখা যাবে। তোমার নিজের ছেলেকে সামলাও গে।

"আচ্ছা !"....সরোষে এই কথাটি বলে যাদব হন্ হন্ করে চলে গেল। হুঁকা হাতে করে বসে যাদবের চলে যাওয়াটা উদাস দৃষ্টিতে দেখছে, এমন সময় মায়া ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললো : বাবা, শীগ্‌গির বাড়ীর ভেতরে চলো, বড়দা আর ছোড়দায় কুরুক্ষেত্র বেধেছে।

হুঁকায় আর টান দেওয়া হল না তার। ক্ষিপ্রহস্তে খুঁটির গায় হুঁকাটি নামিয়ে রেখে রুক্ষকণ্ঠে বলে উঠলো : তোরা সবাই মিলে আমায় পুড়িয়ে চিবিয়ে খা ! এদিকে ছেলের বাপের তম্বী, ওদিকে নিজের ঘরে দুই ভেয়ে ত্রিশ দিন ঝগড়া। উঃ, কি সুখেই আমাকে রেখেছ জগদম্বা ! দাঁড়া ত, আজ এর নিষ্পত্তি করে তবে নিশ্চিন্তি ! একটা দিক ভেঙ্গেছে, এবার এদিকটাও ভেঙ্গে দিয়ে—তোর মতই বেপরোয়া হয়ে বাঁধন খুলে

নাচতে থাকি !—কথাগুলো উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলতে বলতে পীতাম্বর ভিতরে চলে গেল।

মায়া কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে থাকে—দুদণ্ডের মধ্যে এসব হোল কি ! মহাকালীর নগ্ন মূর্ত্তির পানে চেয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো মায়া।

নদী-মেখলা বিস্তীর্ণ গণ্ডগ্রাম শ্রীনগর। এককালে না কি কোন প্রগতিশীল নগরীর পর্য্যায়ে উঠেছিল, কালচক্রে আর সব দিকে ভাঙন ধরলেও, নামের দিক্‌টা ঠিক বজায় আছে। এখনো দেখতে পাওয়া যায় অতীত গৌরবের কোন না কোন নিদর্শন—হর্ম্যদেউলাদির ভগ্নাংশ। গড়, পরিখা ও পোস্তাগুলি মধ্যযুগের স্থাপত্যশিল্পের সাক্ষীরূপে দর্শক-মনে স্বাজাত্য-গৌরবের সম্ভ্রম সৃষ্টি করে। শোনা যায়, একদা গোটা বাংলার প্রাণস্বরূপ বার-ভূইঞার মুকুট-মণি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পঞ্চ-ক্রোশী রাজধানীর দ্বারভূমি ছিল বিভিন্নমুখী নদীসংলগ্ন এই অঞ্চলটি। এখনো কোন কোন ঝিল বিল ও দীর্ঘিকার পংকোদ্ধারকালে ধরিত্রীর তলদেশ থেকে অর্ণবযানের কত কি প্রতীক—ক্ষয়িত পোতরক্ষ, জীর্ণ তরী, ভগ্ন ক্ষেপনি, অঙ্গারবর্ণ পাইলদণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খনকের খনিতযন্ত্রের সাহায্যে লোকচক্ষুর সম্মুখে এসে প্রত্নতাত্ত্বিকদের গভীর গবেষণার উপাদান হয়ে থাকে। বিভিন্ন শস্যক্ষেত্রগুলির গর্ভ থেকেও বিবিধ কংকাল ও আয়ুধ আত্মপ্রকাশ ক'রে কত বিচিত্র কাহিনীর উপকরণ যোগায়। কিন্তু আশ্চর্য্য এইখানে যে, অঞ্চলবাসীদের সক্রিয় বা অবচেতন মনে এগুলি কোনরূপ প্রভাব স্থাপনে সমর্থ হয় না।—অতীতের সংকেত চিহ্নগুলি অসংলগ্ন ভাবে চারদিকে বিকীর্ণ দেখেও

প্রতি বস্তুটির জীবন-উৎসের অনুসন্ধানে কারো আগ্রহ নেই। সমাজ এখানে মূক, জাতি অতীতের সুখ-সমৃদ্ধির গল্প শুনে আক্ষেপ করে—হায় রে সেকাল! আবার বর্তমানের বহু অসুবিধার সঙ্গে মুখোমুখী হয়ে অদৃষ্টকেই করে দায়ী। বাহিরের অনুসন্ধিৎসুরা বাংলার পঞ্চদশ শতকের স্বাধীনতা-যুদ্ধে সর্বাধিক স্মরণীয় ও বরণীয় সুন্দরবন-সংলগ্ন এই দুর্গম ভূভাগটি পরিদর্শন ক'রে বাসিন্দাদের পানে তাকিয়ে যখন মনে মনে প্রশস্তির ভঙ্গিতে ভাবেন—একদা যারা এই বীর-তীর্থে দাঁড়িয়ে অসীম শৌর্য্যের সঙ্গে বাদশাহী পলটনকে রুখেছিল, এরা তাদেরই বংশধর, এদের প্রত্যেকের ধমনীতে বইছে শৌর্য্যশালী 'সহিদ' পিতৃপুরুষের শোণিত,—তখন যাদের উদ্দেশে এই প্রশস্তি, তারা ভেবে পায় না, সুস্থ শরীরকে নানা কষ্ট ও দুর্ভোগে এভাবে বিব্রত করে এঁদের কি লাভ! দুর্ভাগ্য দেশের অতীত কীর্তি-চিহ্নিত প্রায় প্রত্যেক অঞ্চলের এই অবস্থা! সন্ধানী দৃষ্টির রশ্মিরেখায় বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে সেগুলি উদ্‌ঘাটিত করে মাতৃভূমিকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠা দিতে কোন আগ্রহই এদের দেখা যায় না। আবিষ্কারের প্রয়াস, সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা এবং সামনে এগিয়ে চলার প্রেরণা বা প্রয়োজন যেখানে স্তব্ধ, স্বার্থপরতার নেশায় চুর হয়ে সমাজ-প্রগতির গতিরোধের চেষ্টাই সেখানে প্রবল। কিন্তু সমাজ পিছিয়ে থাকলেও সময় যে চিরদিনই এগিয়ে যায়, তার চাকা ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকেই চলে—একটি ছেলে হঠাৎ এই অঞ্চলে এসে লোকের চোখে আঙুল দিয়েই যেন সেটা জানিয়ে দিলে।

এ অঞ্চলের বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম শ্রীনগরে ছেলেটি জন্মগ্রহণ করলেও অধিক দিন এর সংস্পর্শে থাকবার সুযোগ তার অদৃষ্টে ঘটেনি। মাতৃ-জঠর থেকে ভূমিষ্ঠ হবার মাস কয়েক পরেই দুর্ভাগ্য তাকে মাতৃহীন করে।

অসহায় শিশুটিকে মায়ের আদরে পালন করবার মত পরিবারভুক্ত কোন মহিলা সংসারে না থাকায় নিরুপায় পিতা তাকে একশ' মাইল তফাতে জেলার সদর সহরে মাতামহীর তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন। ছেলেটি সেইখানেই প্রতিপালিত হতে থাকে। এদিকে বিপত্নীক পিতা পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করে ভাঙ্গা গৃহাশ্রমকে নবীন উদ্যমে যোড়াতালি দিয়ে সাজিয়ে তোলেন। মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে ছেলের খবর অবশ্য নিতেন, তাছাড়া জমি-জমার ব্যাপারে মামলা-মকর্দ্দমার সম্পর্কে সদরে গেলে ছেলেকে দেখেও আসতেন; কিন্তু পাল-পার্বনে বা অন্য কোন বাবদে ছেলের উদ্দেশে কিছু পাঠিয়েছেন কোন দিন, এমন কথা পাড়া-প্রতিবাসীদের কারো জানা নেই। ও পক্ষও প্রত্যাশা করতেন না কিছু, বাপের কথা উঠলে প্রচলিত ছড়া কাটতেন,—"মা-মরা ছেলের বাপ আবার বিয়ে করলে সে বাপ হয় ছেলের তালুই!" বেঁচে থাকুক ওর মামারা, বাপের কাছে যেন হাত পাততে না হয়।

কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন বাপের কাছেই এসে ছেলেকে দাঁড়াতে হোল। তার বয়স তখন তেরো পেরিয়ে চোদ্দয় পড়েছে। গৃহ বিবাদে মামারা ছন্নছাড়া হয়ে গেছে, মাথা রাখবার জায়গা পর্য্যন্ত নেই। কেউ গিয়ে উঠেছে শশুরবাড়ীতে, কেউ বা হোয়েছে দেশান্তরী; যার ওপরে ছিল ছেলেটির অখণ্ড জোর, তিনিও দিয়েছেন পরপারে পাড়ি। ইতিমধ্যে কিন্তু ছেলেটির বিদ্যার খ্যাতি সদর থেকে শ্রীনগরেও রাষ্ট হয়েছিল। মাইনর পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে বৃত্তি পায় সে। শ্রীনগরের পুরাতন মাইনর স্কুলটিও এই সময় স্থানীয় ভূস্বামী এবং গ্রামের জনৈক কৃতবিদ্য শিক্ষাব্রতীর সহায়তায় ও প্রচেষ্টায় উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পরিণত হওয়ায় উদ্যোক্তারা প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত যাদব রায়কে

জানালেন যে, তাঁর এখন কর্তব্য হচ্ছে 'গুণী ছেলেটিকে মামার বাড়ী থেকে আনিয়ে কাছে রাখা, আর গ্রামের নূতন ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে তাকে জঁাকিয়ে তোলা। প্রস্তাবটি ছেলের অদৃষ্টে যেন 'শাপে বর' হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের ছেলে গ্রামে ফিরে এসে তার অপরূপ সুন্দর চেহারা, আর শিষ্ট-সুষ্ঠু ব্যবহারে গ্রামশুদ্ধ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে।'

সত্যই একটু স্বতন্ত্র ধরণের ছেলে এই মৃগেন। মনটি এখনো শিশুর মত সরল, ফুলের মত কোমল। কারো সঙ্গে চোখাচোখি হলেই আলাপের আগে মুখখানি তার হাসিতে ভরে ওঠে—এ হাসি জীবনের তিক্ততম দিনেও ম্লান হয় না, জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনেও উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে না। কিন্তু মৃগেনের সবচেয়ে আকর্ষণের বস্তু ওর দুটি চোখ—এ চোখ যার আছে, জীবনে তার কি নেই! আশ্চর্য্য গভীর চোখ, কালো কালো দুটি তারা যেন দীঘির অতল জল স্পর্শ করে। এ চোখ মানুষকে মাতাল করে তুলে, এ চোখ দ্রষ্টাকে সৃষ্টির অনন্ত রহস্যের পথে টেনে নিয়ে যায় যেন। এ চোখে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হয় যেমন, তেমনি প্রকৃতির পরিপূর্ণ মাধুর্য্যও ধরা দেয়। তাই এখানে এসেই জন্মভূমির বর্ত্তমানের রূপ দেখার সঙ্গে সঙ্গেই অতীতের তেজোময় রূপটিও ফুটে ওঠে তার এই চোখে—যখনি বিপুল ভাবের বেগ লাগে তার ভাষায়, মননশক্তি জাগ্রত হয় তার পরশে, রূপায়িত হতে থাকে অতীতের বিস্মৃত অতিমানুষগুলি—যাঁরা একদিন এই দেশের মাটির মর্য্যাদা রাখতে দিয়েছেন আত্মবলি।

প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের নির্দ্দেশে বিদ্যালয়ের সমর্থ ছাত্রগণ একটা রচনা প্রতিযোগিতায় যোগ দেয়। রচনাটির বিষয়বস্তু থাকে—জন্মভূমির অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থা বর্ণনা। অনেকগুলি ছেলে মামুলী ধারায়

দেশের কথা লেখে। কিন্তু নবাগত এবং অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর ছাত্র মৃগেনের প্রাঞ্জল রচনা প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অবাক্ করে দেয়। রচনার প্রতি ছত্রটি স্বদেশপ্রেমে অনুরঞ্জিত, ওজস্বিনী ভাষার ভিতর দিয়ে যেন ভাবের বন্যা ছুটেছে বেগবতী হয়ে; বালকের লেখায় মাতৃভূমি ও তার মুখোজ্জ্বলকারী বীরসন্তানদের প্রতি এত দরদ ও অনুভূতি কি করে সম্ভব হোল? প্রথমে ভেবেছিলেন, ছেলেটি বুঝি কোন অভিজ্ঞ লেখকের কণ্ঠস্থ করা কথাগুলি কালি-কলমে ও ভাবে ফুটিয়েছে—জেলার সদরে শিক্ষা পেয়েছে যখন, পড়ার বই ছাড়া বাইরের বই পড়ার সুযোগও সেখানে আছে। কিন্তু ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা ও নানারূপ জেরা করে বুঝলেন, তাঁর সন্দেহ মিথ্যা—ছেলেটির সাহিত্য-প্রতিভা সত্যই সহজাত। এর পর তিনি বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে এক বৃহৎ সভায় ছাত্রদের অভিভাবক এবং অঞ্চলবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করে আনিয়ে প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্র মৃগেনের দেশপ্রীতিমূলক প্রবন্ধটি শোনাবার ব্যবস্থা করেন। প্রবন্ধ পড়ে মৃগেন নিজে—প্রিয়দর্শন ছেলেটির আবৃত্তি সভায় সমবেত নর-নারী-নির্বিশেষে সকলকেই আকৃষ্ট করেছিল, উদাত্ত কণ্ঠের আবৃত্তি মুগ্ধ করল, প্রত্যেককে, সভায় শতমুখে ধন্য ধন্য ধ্বনি উঠলো। প্রবন্ধ পড়া শেষ হ'লে প্রধান শিক্ষকমহাশয় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তার প্রশস্তি কীর্তন করে আশ্বাস দিলেন, কালে এই বালক প্রতীচ্যের হেন্স এণ্ডারসনের মতন খ্যাতিলাভ করবে। সেই ছেলেটির বাল্য-জীবনেও এমনি করে সাহিত্য-প্রতিভায় আভাস পাওয়া গিয়েছিল।

ছেলের প্রশংসায় যাদব রায়ের বুক আনন্দে দুলে ওঠে। আর একটি লোক সভাস্থলেই দাঁড়িয়ে জোর-গলায় বাহোবা দেয় তাকে, সে লোক হচ্ছে গ্রামের মৃন্ময়-শিল্পী পীতাম্বর অধিকারী। ছেলেটিকে লক্ষ্য

করে সে বলে : প্রথম দিন ঐ ছেলেটির চোখ দুটো দেখে বলেছিলাম ওর বাবাকে—যাদব, তোমার ছেলের চোখ সাধারণ চোখ নয়, এই চোখেই সাধক তার সাধনার নিধিকে খুঁজে পান। আমার কথা মিছে হয়নি, জন্মভূমিতে এসেই ও দেখেছে দেশ-জননীর সত্যিকার রূপ, মায়ের রূপের আলো ওর কলমেই ফুটে উঠে—আঁধার কাটিয়ে দেবে দেখো!

পীতাম্বরের মেয়ে মায়াও এই বিদ্যালয়ের ছাত্রী—গ্রামে বালিকাদের শিক্ষার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না থাকায় প্রধান শিক্ষকমহাশয় এই বিদ্যালয়েই ছাত্রীদের জন্য শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করেছিলেন। প্রত্যেক শ্রেণীতে শিক্ষক মহাশয়ের দুই ধারে দুইখানি আলাদা বেঞ্চ থাকে ছাত্রীদের জন্য। অন্যান্য ছাত্রীদের সঙ্গে সেদিন মায়াও সভায় আসে। শিক্ষকমহাশয়ের নির্দেশ পেয়ে মৃগেন যতক্ষণ তার রচনাটি মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে পড়ে, মায়া ততক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার অপরূপ মুখখানির দিকে, অপূর্ব এক উল্লাসে তার সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হতে থাকে। ছেলেটির চমৎকার দুটি কালো কালো চোখের গভীর দৃষ্টি, তার মুখের তেজোদৃপ্ত প্রতি কথাটি যেন মনোমন্দিরে লুক্কায়িত একটা তারে অন্যের অলক্ষ্যে পরশ দিয়ে অভিনব এক ঝংকার তোলে। পড়া শেষ হোলে ছেলেটি বসতেই শতমুখে যখন তার প্রশংসা ওঠে, মায়ার ক্ষুদ্র বুকখানি তাতে আনন্দে দুলতে থাকে ; মনে হয় তার—ঐ সব সুখ্যাতির খানিকটা সে-ও বুঝি পেয়েছে! পরক্ষণে পীতাম্বরের মুখেও ছেলেটির প্রশংসা শুনে তার কি আহ্লাদ! ইচ্ছা হতে থাকে ছুটে গিয়ে বাবার গলাটি দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সে বলে—'বেশ বলেছ বাবা!'

ঠিক সেই সময় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের মুখে নিজের নামটিও শুনে চমকে ওঠে মায়া। রচনা-প্রতিযোগিতায় সেও যোগ দিয়েছিল, আর

আঁকা-বাঁকা অক্ষরে কতকগুলি আবোল-তাবোল কথাও লিখেছিল। কিন্তু এই ছেলেটির রচনা শুনে মনে হচ্ছিল তার—কি ছেলেমানুষীই করেছে সে! হয়ত শিক্ষকরা; কত নিন্দাই করবেন, সেইজন্যই বুঝি ডাক পড়েছে তার! ওমা, তা ত নয়; তাকে ত ডাকেননি লেখাটি পড়তে—নিজেই যে তিনি তাই নিয়ে আলোচনা করছেন! লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে তার সুগৌর মুখখানা, বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করতে থাকে। প্রধান শিক্ষকমহাশয় তখন বলছিলেন—'আর যারা রচনা লিখেছে, তাদের মধ্যে কুমারী মায়ার লেখাটি যদিও কাঁচা আর বিষয়বস্তুটির ঠিক অনুসরণ করতে পারেনি, তবুও জননী আর জন্মভূমির যে বাস্তব ব্যাখ্যা সে করেছে তার জন্যও আমরা তাকে প্রশংসা করছি, উৎসাহ দিচ্ছি। সে তার প্রবন্ধে লিখেছে: 'জননী আর জন্মভূমি স্বর্গ হতে বড়। কিন্তু আমার জননীকে আমি দেখি নাই। আমার জ্ঞান হইবার পূর্বেই তিনি আমাকে ফেলিয়া স্বর্গে গিয়াছেন। আমি এক্ষণে আমাদের ঘর-বাড়ী উঠান বাগান পুকুর এইগুলিকেই আমার জন্মভূমি মনে করিয়া থাকি। আমার জননী যে ছোট ঘরখানিতে আমাকে প্রসব করিয়াছিলেন, আমি তাহাকে পূজারঘর ভাবিয়া আনন্দ পাই। সেই ঘরে আমার জননী ও জন্মভূমি একসঙ্গে বিরাজ করিতেছেন জানিয়া ভক্তির সহিত গড় করি। আমি বড় হইলে আমার জন্মভূমি আরও বড় হইবেন!'....মায়ার কথাগুলিও খুব মনোজ্ঞ হয় সভায়, শুনিয়া অনেকে বেশ কৌতুক বোধ করে, অনেকের চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

সেই দিন সভাভঙ্গের পর পীতাম্বর অধিকারী সুপুত্র যাদব রায়কে তার বাড়ীতে নিয়ে যায়। বাড়ীর বাইরে যে চণ্ডী-মণ্ডপটি, তার শিল্প-সাধনার পীঠ, সেখানেই মাদুর পেতে বসিয়ে অভ্যর্থনা করে, বৈকালীন

জলযোগের সঙ্গে নানা আলোচনা হয়। যাদব রায়ের মুখে মায়ার প্রশংসা যেন ধরেনা। আর সেই সন্ধিক্ষণে মায়ার সঙ্গে মৃগেনের রীতিমত ভাব হয়ে যায়। এর পর মৃগেনও তার লেখার একজন সমঝদার শ্রোত্রী পেয়ে বর্ত্তে যায় যেন।

এমনি করে পর পর ক'টি বছর কেটে যায়। মৃগেনের সাহিত্য-সাধনা পূর্ণোদ্যমে চলতে থাকে, প্রধান শ্রোত্রী ও উৎসাহদাত্রী মায়া। অন্যান্য ছেলে-মেয়েরা যখন নানারূপ খেলা-ধূলায় পাড়া মাথায় করে বেড়ায়, এরা ছুটিতে তখন কোন নির্জন বাগানে, শষ্পাছন্ন প্রান্তরে কিংবা ইচ্ছামতীর তীরে বসিয়া কাব্য-রস উপভোগ করে। মৃগেন তার সযত্ন-রচিত রচনা সোৎসাহে পড়ে, মন প্রাণ নিবিষ্ট করে উৎকর্ণ হয়ে শোনে মায়া।

জমিদার বাবুদের বাড়ীতে বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ লেগেই থাকতো, প্রায় প্রতি পর্ব্বোৎসবেই সহরের পেশাদারী যাত্রাদল সাড়ম্বরে এসে আসর জমাতো। আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের মানুষ যেন ভেঙ্গে পড়ত শ্রীনগরে—কৌতূহলের এক অদম্য আকর্ষণে। প্রত্যেকেরই ভিতরকার রসজ্ঞ মানুষটিও যেন জেগে উঠত আনন্দময় হয়ে। প্রকৃত পক্ষে গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের মনে রসসৃষ্টি এবং আনন্দের ভিতর দিয়ে শিক্ষার সঙ্গে পরিচিতির বিশিষ্ট উপায় যাত্রা-সম্প্রদায়ের ভাবোদ্দীপক গীতাভিনয়। অধুনা সাধারণ পাঠাগারগুলি যেমন সার্ব্বজনীন শিক্ষা-বিস্তারের উপলক্ষ হয়েছে, দীর্ঘ শতাব্দী ধরে গ্রামাঞ্চলে গীতাভিনয়কে উপলক্ষ করে তেমনি এই প্রমোদ-প্রতিষ্ঠানগুলি শিক্ষালোক বিস্তার করে এসেছে। আধুনিক মঞ্চ ও সিনেমাগুলি আর্টের নামে যে দুর্নীতি ও কুরুচির প্রচার করে সমাজ-জীবন বিষাক্ত করে তুলেছে, যাত্রা-

সম্প্রদায়গুলির অভিনেয় পালায় তার ছায়াও পড়েনি কোন দিন। তারা দেশবাসীকে শুনিয়েছে পুরাণেতিহাসের অমৃতময় কাহিনী, প্রচার করেছে নিষ্ঠার সঙ্গে, আদর্শবাদ, জাতি-ধর্ম্ম-নির্বিশেষে সবাই পেয়েছে চরিত্র-গঠনের অবলম্বন। এখানেও যাত্রার অভিনয় তরুণ রস-শিল্পীর প্রাণে যোগায় প্রেরণা, বর্ষের পর বর্ষ ধরে এরই সাধনা চলে। আশায় উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে দুটি তরুণ চিত্ত।

কিন্তু এই মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় পাড়ার আর একটি ছেলে, নাম তার কানাই। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছেলে, দুঃসাহসী হলেও বওয়াটে বলে দুর্ণাম আছে। বিধবা জননী সারদা তার অভিভাবিকা—হাতে বেশ টাকা থাকায় চড়া সুদে তিনি বাড়ীতে বসেই মহাজনী করেন। স্বগ্রাম ছাড়া বাইরের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু দায়গ্রস্তকেই তাঁর দ্বারস্থ হতে হয়। কানাইয়ের উপনয়ন দেবার পর থেকেই তাঁর মনের মধ্যে বাসনা জেগেছে, ছেলের জন্যে টুকটুকে একটি বউ ঘরে আনেন। পীতাম্বর অধিকারীর মেয়ে মায়াকে তাঁর মনে ধরে; তলে তলে জানতে পারেন, ছেলের মনও মায়ার দিকে ঝুঁকেছে। এর ওপর এ-খবরও তাঁর অবিদিত নয় যে, যাদব রায়ের ও-পক্ষের ছেলে হঠাৎ উড়ে এসে যে রকম করে জুড়ে বসেছে অধিকারীর বাড়ীতে, তাতে মায়াকে হাত করতে অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তাই তিনিও তলে তলে অধিকারীর ছোট ছেলে অতুলকে আগে থাকতেই হাত করে ফেলেছেন, উদ্দেশ্য, অতুলের সাহায্যে মায়াকে আয়ত্বে আনবেন।

এ ব্যাপারে অতুলের প্রতিপত্তির হেতু এইটুকু যে, মায়া তারই সহোদরা বোন। পীতাম্বরের প্রথম স্ত্রীর একমাত্র ছেলে গোকুল দুবছর বয়সে সে মাতৃহীন হলে পীতাম্বরকে এক বয়স্থা কন্যার পাণিগ্রহণ করতে

হয়। সেই স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র অতুল এবং কন্যা মায়া। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী তিনটি সন্তানকেই এমন চুলচেরা ওজনে লালন-পালন করেন যে, গোকুল কোন দিন আপন মায়ের অভাব অনুভব করতে পারেনি। কিন্তু মায়ার জ্ঞানোদয়ের পূর্বেই পীতাম্বর দ্বিতীয়বার বিপত্নীক হন। পিতার স্নেহ আর মায়ের যত্ন মিলিয়ে শিশুকন্যাকে কোলে তুলে নেয় পীতাম্বর, বড় দাদা গোকুলও তাতে নিবিড়ভাবে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু অতুলের প্রকৃতি ছেলেবেলা থেকেই যেন আলাদা ধাতুতে গড়া, নিজের সুখ-সুবিধার দিকেই তার লক্ষ্য; বোনটিকে গলগ্রহ মনে করেই বিরূপ হয় সে। শিশুরাও অনুভব করতে পারে—সত্যিকারের স্নেহের পরশ পায় কার কাছে গেলে। ফলে, বাপ আর বড়দার অনুরক্তই হয়ে ওঠে মায়া শৈশব থেকে। এইভাবে ক্ষুদ্র সংসারটিকে রূপ আর হাসির ঝলকে আলোকিত করে বাড়তে থাকে মায়া। পীতাম্বরের বড় সাধ, মায়া উপযুক্ত শিক্ষা পায়, তাই নিজেই অগ্রণী হয়ে মায়াকে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করে দেয়; তারই আগ্রহে প্রধান শিক্ষক মহাশয় গ্রাম্য মেয়েদের জন্য শিক্ষার বিশিষ্ট ব্যবস্থায় অবহিত হন। গৃহস্থালীর কাজের মত পড়াশোনাতেও মায়ার মাথা বেশ খুলে যায়, তার বুদ্ধিদীপ্ত প্রকৃতি শিক্ষকগণকে চমৎকৃত করে। পরে রচনা-প্রতিযোগিতায় যদিও মৃগেনই একমাত্র প্রতিষ্ঠা পায়, কিন্তু সে-ব্যাপারে মায়ার ভাগ্যে যেটুকু খ্যাতি লাভ হয়েছিল, অন্যের পক্ষে তা পর্ব্বত। সেই থেকেই গ্রামের এই মেয়েটির ওপর কানাইয়ের নজর পড়ে, আর সেটা তার মা সারদার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতেও ধরা পড়ে যায়।

মায়া কিন্তু কানাইকে দেখলেই জ্বলে যেত। পয়সাওয়ালী মায়ের ছেলে হলে কি হবে, তার ধৃষ্টতা আর বেহায়াপনা মায়ার গায়ে যেন

কাঁটার মত বিঁধত। কানাই যে মায়ার মনোভাব বুঝতে পারত না তা নয়, তথাপি নানা ছলে সে মায়ার সংস্পর্শে আসবার চেষ্টা করত, তাকে খুসি করতে অসাধ্য-সাধনেও সে ভয় পেত না। মৃগেন কবিতা লেখে, যাত্রার পালার অনুকরণে পালা বেঁধে মায়াকে শুনিয়ে অনেকটা হাত করে ফেলেছে দেখে, কানাইও মাথা খেলিয়ে এক মতলব স্থির করে ফেলে। সে দেখলে, কবিতা বা পালা রচনা করে মৃগেনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সহজ নয়, কিন্তু মেয়েদের মন পাবার এর চেয়েও আর একটা সহজ উপায় আছে—সেটি হচ্ছে 'মনসার ভাসান' সুর করে গাওয়া, এতে মেয়েদের মন না ভিজে পারে না। তা ছাড়া, এতে এক ঢিলে দুটো পাখী ঘাল করা যাবে। মায়ার ছোড়দা অতুল মনসার ভাসানের ভারি ভক্ত; নিজের বাড়ীতেই সে একটা দল বসাবে বসাবে করছে, কিন্তু অর্থের অভাবে পেরে উঠছে না। এ সময় সে যদি এটা রপ্ত করে ফেলে, তা হলে আর তাকে পায় কে! মহোৎসাহে সে কপালীপাড়ায় গিয়ে মনসার ভাসানের কসরৎ করতে লেগে গেল।

এদিকে যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরুলে জানা গেল, মৃগেন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে, আর বাঙ্গলা সাহিত্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করায় বিশেষ প্রশংসাপত্র পেয়েছে। কানাইও পরীক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু গেজেটে তার নাম ছাপা হয়নি শুনে সারদা দেবী পাড়া মাথায় করে জানান যে, তাঁর ছেলের নাম ছাপতে ওরা ভুলে গেছে। টেষ্টেও কানাই ফেল হয়, কিন্তু তার মায়ের পীড়াপীড়ি ও হুমকীতে প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাকে না পাঠিয়ে পারেননি। কানাইয়ের মায়ের খরচে পরে ইউনিভারসিটি থেকে নম্বর আনিয়ে দেখা যায় যে, অংক ছাড়া আর কোন বিষয়েই সে কুড়ির বেশী 'মার্ক' পায়নি, শুধু অংকেই

তার মার্ক উঠেছে পঁয়তাল্লিশ। শুনে কানাইয়ের মা হুংকার দিয়ে জানান—'তাই কি চাও ভিখারি কথা না কি! আঁক কষে কষেই ত হিমসিম খেতে হয় বাছাকে। বেঁচে থাক ওর আঁক, ওর অভাব কিসের—নাই বা হলো পাস, কি দরকার তার? যে ট্যাকা ওর ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে আছে, তার হিসেব রাখতে পারলেই হলো।'

পরীক্ষার অনেক আগেই উভয় পক্ষের দুই অভিভাবকের মধ্যে যেমন বিয়ের কথাটি চুপি চুপি পাকা হয়ে যায়, অতুলের সঙ্গেও তেমনি সারদা এ সম্বন্ধে একটা গোপন 'প্যাক্ট' করে মনসার ভাসানের দল গড়বার জন্য তার হাতে নগদ ত্রিশটি টাকা তুলে দেয়। এ ছাড়াও কথা হয় যে, ভালয় ভালয় বিয়েটি হয়ে গেলে দলটাকে জাঁকিয়ে তোলবার জন্যে হাজার দু'হাজার ঢালতেও তিনি পেছপাও হবেন না। ফলে, অতুলের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে এবং একান্ত প্রিয়পাত্র ভেবেই কানাইকে বিশেষ প্রশ্রয় দিতে আরম্ভ করে। পক্ষান্তরে, মৃগেন হয় তার চক্ষুঃশূল, দেখলেই জ্বলে যায়, কথার খোঁচা দিয়ে তার আসার পথে বেড়া দিতে চায়। ভিতরের কথা কিন্তু মায়া কিছু কিছু জানতে পারে, সে মৃগেনকে জানায়, কাজ কি ছোড়দার সামনে পড়ে ঝগড়া বাধিয়ে—লুকোচুরি খেলাতে তুমিও ত ওস্তাদ, তাই চলুক না। এর পর যেদিন 'চিচিং ফাঁক' হয়ে যাবে, তখন দেখবে মজা। মায়া জানে, বড়দা মৃগেনের দিকে, আর তার বাবা—তিনি ত কথা পাকা করেই রেখেছেন। কেবল পণের টাকাটা যোগাড় হবার যা ওয়াস্তা।

কিন্তু পাকা কথা যে কেঁচে যায়, স্থায়ী ব্যবস্থা তুচ্ছ একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে পালটায়, সেটা বোধ হয় মায়া কোন দিন ভাবতে পারেনি। একদিন যে হঠাৎ সামান্য একটা কথার ঘায়ে পাকা কথা ভেঙ্গে গিয়ে

তার কণ্ঠা দিয়ে কান্না ঠেলে আসবে, কে তা জানত! আশার পথে সত্যিই বুঝি পড়ে কাঁটা! শেষ পর্য্যন্ত কি মা-সরস্বতী বিমুখ হলেন, আর মনসা ঠাকরুণই কানায়ের কলা খেলেন?

বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে নবনির্ম্মিত কালীপ্রতিমার সামনে সেদিন কুক্ষণে যে ঝড়ের সংকেত ওঠে, তারই রুদ্ররূপের তাণ্ডব সুরু হলো বাড়ীর ভিতরে সংসারের কয়টি প্রাণীকে উপলক্ষ করে।

বাড়ীর ভিতরে তিনটি বড় বড় শোবার ঘর—মাঝখানে ছোট একটা উঠান। ঘরগুলি তারই তিন দিকে। সবকটি ঘরের সঙ্গে একটি করে ছোট দাওয়া। একদিকে রান্না ও ভাঁড়ার-ঘর। ঘরগুলো মাটির। ছোট ছোট জানলাও রয়েছে চারদিকে। ঘরগুলির প্রত্যেকটি প্রায় একই রকমের। কোণের দিকে যে ছোট ঘরখানিতে আঁতুড় হোত, মায়া সেটাকে ঠাকুর-ঘর করেছে। এই নিয়ে দুই ভাজের সঙ্গে তাকে অনেক তকরার করতে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মায়ার জিদই বজায় থাকে। উঠানের দক্ষিণ দিকে সদরে যাবার দরজা। উত্তরদিকে খীড়কি, সেই দিকেই পুকুর, আর তার একদিকে পীতাম্বরের শোবার ঘরখানির গায়ে ছোট একখানি জমি বেড়া দিয়ে ঘেরা। আগে আগাছায় জায়গাটি ভর্তি ছিল, মায়াই শখ করে ফুল ও ফলমূলের গাছ লাগিয়ে বাগান করেছে। উঠানের একধারে ছোট একটি মরাই।

উঠানের মাঝখানে গোকুল ও অতুল দুই ভাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছিল। দু'জনেরই বয়স হয়েছে—গোকুল তিরিশের কোঠার

মাঝখানে এসেছে। আর অতুল সবে পা দিয়েছে। বয়সের দিক দিয়ে ভাই দুটিতে বেশী তফাৎ নয়—যতটা তফাৎ বোনটির সঙ্গে। বউ দুটিও সোমত্ত, আর বয়সে উভয়েই মায়ার চেয়ে অনেক বড়। গোকুল কতকটা রাসভারী গোছের মানুষ, মনটিও সাদাসিধা, বধূ করুণাকে সে নিজেদের সংসারটির সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। পক্ষান্তরে, ছোটবধূ প্রসাদী এ-বাড়ীতে এসে অবধি হাল্কা প্রকৃতির অমানুষ বরটির নাকে দড়ি দিয়ে এমন সন্তর্পণে চালাচ্ছে যে তার কোন হদিসও কেউ পায়নি, ভায়ে ভায়ে ঝগড়া বাধলেই করুণা ছুটে এসে দু'জনকে থামবার জন্যে যখন আকুলি-ব্যাকুলি করত, প্রসাদী তখন অপ্রসন্ন মুখখানা বিকৃত করে গোঁজ হয়ে দাওয়ায় এসে দাঁড়াতো, ভাসুরের সঙ্গে বচসা অচল—নইলে কোমর বেঁধে স্বামীর পক্ষ নিয়ে ও পক্ষের খোঁতা মুখ ভোঁতা করে দিত সে! তার শেখান কথাগুলোই যে স্বামী তড়বড় করে বলতে থাকে—সে ত তার অজানা নয়, তবে সব কথা যে স্বামী বেচারা গুছিয়ে বলতে পারে না—তার দুঃখ ত সেইখানেই!

এ-দিনের কলহের মূলেও কানাই। তাকে নিয়ে বাড়াবাড়িটা চরমে ওঠাতেই বাধ্য হয়ে প্রতিবাদ করতে হয় গোকুলকে; আর, এই বিশ্রী ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত হওয়াঁর প্রয়োজন জেনেই বড় বউ করুণা আজ ঝগড়া থামাতে ছুটে আসেনি। কানাইয়ের মতন নিঃসম্পর্কের একটা বওয়াটে ছেলেকে, নিয়ে বাড়ীর ভিতরে গানের আসর বসাতে তারও পিত্তি জ্বলে গিয়েছিল রাগে।

গোকুল প্রথমে ভাল কথায় ছোট ভাইকে বোঝাতে চেয়েছিল, কিন্তু অতুলের কিছুই বোঝবার [illegible] না—বউর শেখান যে কথাগুলি [illegible] করেছিল, [illegible] শুনিয়ে দিল।

গোকুল জোর গলায় জানাল: আমি বলছি কানাই এবাড়ী আসবে না, বাড়ীর অন্দরে তাকে নিয়ে আড্ডা দেওয়া হবে না।

অতুলও অনুরূপ স্বরে উত্তর করল: হাজার বার আসবে কানাই, এটা কি তোমার একলার বাড়ী?

এই সময় পীতাম্বর এসে ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন: কি, কি, ব্যাপার কি—আজ আবার হলো কি? বলি ত্রিশটা দিনের একটা দিনও কি তোদের কামাই নেই ঝগড়ার?

বাপের দিকে চেয়ে সুরটা নরম করে গোকুল বলল: আমি কি করব বল! তোমার ছোট ছেলে যে ঐ বওয়াটে কানাই ছোঁড়াকে এনে রাত-দিন বাড়ীতে মনসার পালা ভাঁজবে আমি তা হতে দোব না। বলি, বাড়ীতে যে একটা আইবুড়ো মেয়ে রয়েছে—সেদিকে খেয়াল নেই!

অতুলও সঙ্গে সঙ্গে পালটা জবাব দিল: আর তোমার পেয়ারের মিগেন যে হামেশাই বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘোরে—তাতে কোন দোষ নেই নয়? কানাই আসবে—একশো বার আসবে। তবে আজ বলি, মায়ার সঙ্গে আমি ওর বে দোব।

কণ্ঠস্বর সপ্তমে তুলে পীতাম্বর হুমকী দিলেন: মুখ সামলে কথা বলবি অতলো, আমি বাড়ীর মাথা, আমায় ডিঙ্গিয়ে তুই মায়ার বিয়ে দিবি কিরে হতভাগা—

গোকুল সোৎসাহে বলল: আহাম্মুক কি না, তাই ও-কথা মুখে আনতে লজ্জা পেল না; আর কি না মৃগেনের মতন হীরের টুকরো ছেলের কথা তুলে খোঁটা দেয় ও! তবে এও শোন বাবা, মৃগেনের সঙ্গে মায়ার বিয়ে আজই আমি পাকা করে ফেলতে চাই—তার ব্যবস্থাও...

অন্যদিন হলে কথাটা লুফে নিতেন পীতাম্বর। কিন্তু একটু আগেই

বাইরের চণ্ডীমণ্ডপে মৃগেনের বাবার সঙ্গে এই নিয়ে যে বচসা হয়, তাঁর স্নায়ুমণ্ডলে সেগুলো রীতিমত উত্তাপ ছড়াচ্ছিল, মুখ দিয়েও তার জ্বালা নিঃসৃত হোল: খবরদার গোকলো, ফের আমার মুখের ওপর কথা! আমি বাড়ীর কর্তা, আমায় গ্রাহ্যি নেই! আমি বলছি, ঐ চশমখোর যেদো রায়ের ঘরে আমি মায়াকে পাঠাবো না—কক্ষনো না।

বাপের কথায় হকচকিয়ে গেল গোকুল। বরাবরই সে জানে—মৃগেনের হাতে মায়াকে তুলে দেবার জন্যে কি আগ্রহই না তাঁর ছিল; লাখরাজ জমিটুকু বিক্রী করেই পণের টাকা সংগ্রহে ব্যস্ত হলে গোকুলই তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল—জমি বেচতে হবে না বাবা, পণের টাকা আমিই যেমন করে হোক জোগাড় করে দোব। সেই সম্ভাবিত বিষয়টি সম্বন্ধে আশ্বস্ত হয়েই এইমাত্র সে বিয়েটা পাকা করবার কথা তোলে; কিন্তু তার উত্তরে বাবার মুখে এ কি বিপরীত কথা!

বিস্ময়ের সুরে গোকুল জিজ্ঞাসা করল: তার মানে?

খপ্ করে অতুল বলে উঠল: মানে—মায়ার বে হবে ঐ কানাইয়ের সঙ্গে।

গর্জ্জন করে গোকুল বলল: চোপরাও! ফের যদি তোর মুখে ওর নাম শুনি আর ঐ হতচ্ছাড়া যদি এ বাড়ীতে ঢোকে—

অতুল অনুরূপ স্বরে উত্তর করল: আলবৎ ঢুকবে কানাই।

মারমুখী হয়ে গোকুল বল্‌ল: কী!

দুই ভায়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ হাতখানা তুলে শাসনের ভঙ্গিতে পীতাম্বর হাঁকলেন: গোকুল, আমি এখনো বেঁচে আছি। অতলো, তোর যে ভারী রোক দেখছি,—নির্বিষ সাপের কুলো পানা চক্কর! হুঁ! ওগো বড় মানুষের ঝিয়েরা, তোমরাও রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে

শোন—আজ থেকে সব আলাদা করে দিলুম। কেউ কারুর কোন তোয়াক্কা রাখবে না........কথা বন্ধ—মুখ-দেখাদেখি পর্য্যন্ত। যে যার ঘর আর তার ছিস্তের দাওয়াটুকু নিয়ে আলাদা সংসার পাতো—রাঁধো বাড়ো খাও—যা সাধ যায় প্রাণে তাই করো, কারুর কিছু বলবার কইবার থাকবে না—ব্যাস, এর পর ফের যদি ঝগড়া শুনি ত লাঠি-পেটা করে তাড়াব—তা সে যেই হোক্।

বাড়ীর কর্ত্তার মুখ দিয়ে যে হঠাৎ এমন নির্ঘাত কথা বেরুবে, কেউ তার কল্পনাও করেনি। শুনে সবাই যেন কাঠ হয়ে গেল, একটু পরে গোকুল অবস্থাটা উপলব্ধি করে আর্তস্বরে বলে উঠল : বাবা, করচ কি! এত দিনের সংসার........

গোকুলের স্ত্রী করুণা দাওয়া থেকে ছুটে এসে শ্বশুরের দুটি পা ধরে ধরা গলায় বলল : ছেলেদের ওপর রাগ করে এমন সর্ব্বনাশ করবেন না বাবা!

অতুল এই সময় মুখখানা বিকৃত করে বলল : আমি সব জানি, আমাকে জব্দ করবার জন্যেই এ একটা ফন্দী করা হচ্ছে। বেশ ত, দাওনা আলাদা করে, এক্ষুনি আমি কানাইকে নিয়ে মনসামঙ্গলের দল খুলবো আমার ঘরে। কানাই··কানাই····উত্তেজিত কণ্ঠে সে কানাইকে ডাকতে লাগলো, যেন সে কাছেই দাঁড়িয়ে প্রতীক্ষা করছে।

কানাইয়ের নামেই গোকুলের মাথা আবার গরম হয়ে উঠল। প্রতিবাদের ভঙ্গিতে তীক্ষ্নস্বরে বলল : আসুক না দেখি কানাই, বাড়ীতে সেঁধুলেই আমি তাকে খুন করব।

পীতাম্বর চোখ পাকিয়ে বললেন : আবার! গোকুল, তোর লজ্জা নেই। আমার ব্যবস্থার ওপর কথা! অতুলো তার ঘরে বসে যা সাধ

যায় তাই যদি করে—তোর বলবার তাতে কি আছে শুনি? ও যদি কানাইকে নিয়ে ন্যাংটো হয়ে সেখানে নাচে—তোর তাতে কি মাথা-ব্যথারে ছুঁচো?

মুখখানি নীচু করে নম্রকণ্ঠে গোকুল বলল: তুমি ঠিক কথাই বলেছ বাবা, আমিই ভুল করেছি। আমাদের পৃথক্ করে দেওয়াই যদি তোমার ইচ্ছে হয়....

গোকুলের কথায় বাধা দিয়ে পীতাম্বর দৃঢ়স্বরে বললেন: ও ইচ্ছে-টিচ্ছে নয়—একেবারে পৃথক্ করে দিলুম। কারুর সঙ্গে আর কারুর সম্বন্ধ নেই, আমি একা, তুই একা, ও একা—যে যেমন আনবে, খাবে, কোন কথা নেই আর।

'বেশ তাই হোক্ বাবা!'—বলেই গোকুল তার ঘরের দিকে চলে গেল। স্বামীকে করুণা ভাল করেই চিনতো, আঁচলে চোখ দু'টি মুছতে মুছতে সেও ধীরপদে স্বামীর পিছু নিল। অতুল মুখখানার একটা বিকৃত ভঙ্গি করে বলে উঠলো: আচ্ছা—আচ্ছা, ভালই ত, এ আমার পক্ষে শাপে বর হোল—বুঝলে?

পিছনের দাওয়ার উপরে শালের খুঁটিটি ধরে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল মায়া। সকলে চলে গেলে আস্তে আস্তে পীতাম্বরের কাছে এসে সে জিজ্ঞাসা করল: আর আমি বাবা? আমার কি হবে?

মায়াকে দেখেই পীতাম্বর ফোঁস করে উঠে রুক্ষস্বরে বললেন: তুই ত শতেকখোয়ারী ছুঁড়ি, তোর জন্যেই ত...

কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলেই মায়ার সজল পদ্মের মত দুটি চোখের আর্ত দৃষ্টিতে যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে স্বর ও সুর কোমল করে দীর্ঘ হাত দু'খানি বাড়িয়ে তাকে কাছে টেনে এনে বললেন: না রে না—

তোর দোষ কি মা, আর ভাবনাই বা কি ; ওরা পৃথক্ হলেও তুই থাকবি আমার কাছে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে থাকবো—বুঝলি? তুই রাঁধবি, আমি ঠাকুর গড়বো...কোন ঝঞ্ঝাট থাকবে না আর!

মুখখানা নীচু করে মায়া চেয়ে রইল মাটির দিকে। পীতাম্বর লক্ষ্য করল তার চোখ দিয়ে টপ্ টপ করে জল পড়ছে ঠিক মুক্তার মত। মনে পড়ল তাঁর—মাতৃহারা মেয়েটিকে কত যত্নে মানুষ করেছেন—এই মেয়েকেই কি না বিনাদোষে নিষ্ঠুরের মত....

সমস্ত অন্তরটা যেন মোচড় দিয়ে উঠল পীতাম্বরের, তাঁর শুষ্ক দুটি চোখও জলে ভরে এল। মেয়ের দিকে চেয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন তিনি। মায়াও এই সময় চোখ দু'টি মেলে চাইল পিতার পানে, অমনি বুকখানি দুলে উঠল তার গভীর একটা বেদনায়। গাঢ়স্বরে সে ডাকল : বাবা!

চমকে উঠে পূর্ণদৃষ্টিতে মেয়ের ম্লান মুখখানার পানে তাকালেন পীতাম্বর। ব্যগ্রকণ্ঠে বললেন : তোকে বকেছি না রে! কিন্তু কি করি বল ত মা, রাত-দিন কিচি কিচি, কাঁহাতক সহ্য করি! এই বেশ হয়েছে, ওরা জব্দ হোক্। তুই ভাবিস্‌নি মা, তোর বিয়ে আমি আরো ভালো ঘরে দোব, আমারে বলে কি না পুতুল তৈরী করি। এ যে আমার কত বড় সাধনার কাজ—তুই কি জানবি টাকার পিশাচ? হ্যাঁ, দ্যাখ্ মা, এখন থেকে শক্ত হবি, ইতরের ছেলেটা এবার এলে....

মুখখানা শক্ত করেই মায়া বলে উঠলো : শক্তই হব বাবা, এবার এলে ঐ চেলা কাঠ দিয়ে ঠ্যাং তার ভেঙ্গে দেব!...বলেই সে গভীর-দৃষ্টিতে পিতার মুখের পানে তাকালো। পীতাম্বরের মনের ভিতর তখন কি ভাবের তরঙ্গ বইছিল তিনিই জানেন।

কে ও

বাঁশের একটা গেঁটে লাঠি ঘরের মেঝের ওপর সজোরে ঠুকতে ঠুকতে যাদব রায় আস্ফালন করছিলেনঃ ঠ্যাং দুটো তোমার লাঠি দিয়ে ভেঙ্গে দেব—ফের যদি তুমি ঐ পুতুলগুলোর বাড়ীমুখো হয়েছ !

আওয়াজ শুনিয়া রান্নাঘর থেকে ছুটে এলেন সুলোচনা। স্বামীর কাণ্ড দেখে গণ্ডে হাত দিয়ে থমকে দাঁড়ালেন, তারপর মুখখানা ঘুরিয়ে শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করলেনঃ কাকে ঠ্যাংয়ানো হচ্ছে অমন করে ? ঘরের মেঝেটা যে বসে গেল !

স্ত্রীর কথায় কান না দিয়ে এবং তাঁর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করেই যাদব রায় ক্রুদ্ধকণ্ঠে নিজের কথাগুলিই বলে চললেনঃ যখন-তখন ঐ বেহায়া ছুঁড়িটার সঙ্গে কেন মিশিস রে হতভাগা—কেন, কেন ? লজ্জা করে না ! এস তুমি বাড়ীতে ফিরে—ওবাড়ীতে যাওয়া তোমার ঘোচাচ্ছি····

কথাটা শেষ করেই মেঝের ওপর জোরে উপর্যুপরি লাঠির গোটা কয়েক ঘা দিলেন।

সুলোচনা এগিয়ে গিয়ে হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিয়ে ঠোঁটের কোণে তীক্ষ্ণ একটু হাসি ফুটিয়ে বললেনঃ থাক—ঢের হয়েছে, মুখে আর গগন ফাটিয়ে কাজ নেই। তখনি ত করেছিনু গো—যত করবে পুতু পুতু, তত হবে ছোলার ছাতু ! এখন সামলাও !

এক ছত্রের ছড়াটির সঙ্গে স্ত্রীর আঁতের কথাটিও উপলব্ধি করতে যাদব রায়ের বিলম্ব হল না, মামার বাড়ী থেকে মৃগেনকে এ বাড়ীতে এনে তার ভার সুলোচনার ওপর দিয়েও তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেননি। নিজের ছেলে-পুলে ও সংসার নিয়েই সুলোচনা বিব্রত,—এর ওপর দীর্ঘকাল পরে

সতীন-পুত্রের আকস্মিক আবির্ভাব তাঁর পক্ষে যে প্রীতিকর হয়নি, যাদব রায় ভাল ভাবেই সেটা বুঝেছিলেন। সেইজন্যে মৃগেনের সুখ-সুবিধার দিকে তাঁকেই বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হয়েছে;—আর এ পর্য্যন্ত সেটি পরিপূর্ণভাবেই বজায় আছে। ছেলের সামান্য একটু অসুখ হলে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন, তাড়াহুড়ো করে ডাক্তার এনে তাঁর মুখে ভরসার কথা শুনে তবে হন নিশ্চিন্ত। কোনদিন ছেলের গায়ে হাত তোলা ত বড় কথা, কড়া কথা বলেছেন বা তার মুখের পানে চোখ রাঙিয়ে চেয়েছেন—এমন ঘটনা বাড়ীর বা পাড়ার কারুর জানা নেই! তাই, ছেলের প্রতি স্বামীর এই সব অতি আদর—মাঝে মাঝে যখন সুলোচনার চোখে একান্ত অসৈরণ বলিয়া মনে হোত, তিনি ঐ প্রচলিত প্রবচনটি সুর করে শুনিয়ে দিতেন। এ-দিনও তার ব্যতিক্রম হয়নি। বরং আজকের ছড়াটির সুরের সুতীক্ষ্ণ ও সুস্পষ্ট রেশটুকু যাদব রায়ের শ্রবণপুটে সূচের মত ফুটে জানিয়ে দিল—এত দিন পরে স্ত্রীর কথাটি সত্যিই সার্থক হয়েছে। যে-ছেলেকে জোরে একটি ধমকও কোন দিন তিনি দেননি, আজ তাকে লক্ষ্য করে তার উদ্দেশে মাটির ওপর জোরে লাঠির ঘা দিচ্ছেন! কিন্তু........

সেটা সুলোচনাই শ্লেষের সুরে বলে ফেললেন: মেগা যদি এখনি সামনে এসে দাঁড়ায়, পারবে এই লাঠির ঘা তার পিঠের ওপর বসাতে?

যাদব রায়ের মনেও এইমাত্র এই প্রশ্নই সূচিত হয়েছে। বিস্ময়ে তিনি স্ত্রীর তীক্ষ্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলেন নীরবে।

মুখখানা মচকে ঝংকার দিয়ে সুলোচনা বললেন: একেই বলে ইল্লীর ধুপধুপুনি বিল্লীর ঘাড়ে! মিছিমিছি মেঘেটাই দুরমুশ করলে। এ দিকে খেয়াল নেই যে আকাশে যে ধুলো ছুঁড়ছো আপন চোখেই

এসে পড়ছে। ঐ লাঠি তোমার নিজের পিঠে ঘা দিয়েছে তা জানো ?

যাদব রায়ের চোখ ও কোপ এক্ষণে দমে গেছে।, শুষ্ককণ্ঠে বললেন : তুমি কি বলছ ?

মুখঝাপটা দিয়ে সুলোচনা বললেন : যেন ন্যাকা, কিছু বোঝেন না! ছেলে গান বাঁধে, পালা লেখে, সে সুখ্যাতি ত মুখে ধরে না। তুমিই ত আস্কারা দিয়ে দিয়ে মাথা ওর খেয়েছ। অধিকারীর মেয়ের সঙ্গে তলে তলে বিয়ের সম্বন্ধ চলছে, তোমরা লুকুলেও এ-কথা কে না জানে ? মেগাও মনে মনে ঠিক দিয়ে রেখেছে—মায়া ওর হবু ক'নে, তুমি ঘটা করে ছেলের বিয়ে দিয়ে তারে বৌ করে আনবে।

যাদব রায়ের রোখ আবার চড়ে উঠলো, গলায় জোর দিয়ে বললো : না, না, ঐ ইতরটার মেয়ে আমি ঘরে আনবো না—কথখনো না। ওর চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে আছে—টাকাওলার মেয়ে।

নাকমুখ সিঁটকে সুলোচনা বললেন : টাকাওলা লোকের ত আর নজর নেই, বয়ে গেছে তাদের এ ঘরে মেয়ে দিতে। বুড়ো ঢেঁকি বসে বসে খালি খালি কাঁড়ি গিলছেন, এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই ; মাকে ত জন্মেই খেয়েছেন, এখন আমাকে খেলেই সুখের চার-পো হয়! কে তোমার টাকাওলা আমীর আছে শুনি যে ওর হাতে মেয়ে দেবে ?

স্ত্রীর মুখে ছেলের নিন্দা শুনে যাদব রায়ের পিত্তি জ্বলে উঠলো রাগে। মুখখানা বিকৃত করে চড়াসুরে বলে উঠলেন : ঢের ঢের আমীর আছে—যারা আমার মৃগের হাতে মেয়ে দিলে বর্তে যাবে মনে করে। তুমি ত ওর নিন্দে করবেই, কিন্তু আশ-পাশের দশখানা গাঁয়ে ওর সুখ্যাতিতে ভরে গেছে একথা কে না জানে ? রূপে-গুণে-বিদ্যেয় ওর

মতন একটা ছেলে আনো দেখি বার করে! ও গান বাঁধে, পালা রচে, একি চাড্ডিখানি কথা না কি....

যাদব রায়ের বক্তব্য আরো অনেক ছিল, কিন্তু এইখানে বাধা দিয়ে সুলোচনা বললেন: ছেলে যদি তোমার এত গুণের, তাহলে তাকে উদ্দেশ করে লাঠি হাঁকড়ানো হচ্ছিল কি জন্যে? ঘরে বসে এ রকম আদিখ্যেতা করবার কি দরকার হ'য়েছিল শুনি? আমি ত সৎমা, ওকে দেখতে নারি, নিন্দে না করে আর গালমন্দি না দিয়ে জল খাইনে, কিন্তু তোমার হয়েছিল কি?

যাদব রায়ের রোখ আবার নিস্তেজ হয়ে এল; কণ্ঠের স্বর নীচু ও নরম করে বললেন: হ্যাঁ, একথা তুমি বলতে পারো, কিন্তু এখন তোমাকে বলি—রাগটা আমার ঠিক ছেলের ওপর হয়নি—ঐ পুতুলওলা পীতাম্বরের ব্যাভারটাই আমাকে রাগিয়ে দিয়েছে, অপরাধের মধ্যে আমি তাকে বলেছিলুম—যে যে-রকম ঠাকুর চায়, তাই গড়লেই ত পার, তাহলে তোমার কষ্টও ঘোচে, খদ্দেরও বজায় থাকে। এতে সে কিনা চটে উঠে যা-তা শুনিয়ে দিলে আমাকে। আমিও ছাড়বার পাত্র না কি, তার ওপর ছেলের বাপ; বলে দিলুম স্পষ্ট করে—তোমার মতন ইতরের মেয়ে আমি ঘরে নিচ্ছিনে।

মুখখানা ঘুরিয়ে সুলোচনা বলল: আমিও ত তাহলে ঠিকই ধরেছিলুম—ইল্লীর ধুপধুপুনি এখন বিল্লীর ঘাড়ে। অধিকারীর ওপর রাগ করে ঘরের ছেলেকে সামলাতে চাও। কিন্তু পারবে? ছেলে তোমার কাব্যি করে, পালা রচে, রচা ছড়া অধিকারীর মেয়েকে না শুনিয়ে তার ঘুম আসে না চোখে—ভাত হজম হয় না, তা জান?

বিস্ময়ের সুরে যাদব রায় বললেন: তুমি এসব কি করে জানলে?

সুলোচনা বললেন : আমি যে মা, আমাকে সব জানতে হয়। তুমি মনে ক'র না যে, সৎমা বলে আমি মেগার শত্তুর, তার ভাল দেখি না। অবিশ্যি, তোমার মতন তার সুখ্যাতিতে গলে যাই না, কিন্তু মনে মনে আমি তার হিত কামনাই করি। তাই বলি, বাইরে যা হয়েছে—তাই নিয়ে বাড়ীতে আর অশান্তি বাড়িয়ো না, মেগাকে কোন কথা ব'ল না।

বলছ কি তুমি? ওদের সঙ্গে মিশতেও বারণ করব না?

না, যা বলবার আমিই বলব ; তুমি কিছু বলবে না।

আমি কিছু বলব না মানে?

তুমি কিছু বললেই অনর্থ হবে। তার বুক ভেঙ্গে যাবে, এর পরে আর কখনো ও-বাড়ীর সঙ্গে মিল হবে না।

তুমি কি মনে কর এর পরেও আবার মিল হবে?

হবে। অধিকারীকে আমি চিনি। রগ-চটা মানুষ, রাগলে জ্ঞান থাকে না, কিন্তু মনটি ওঁর গঙ্গাজলের মত সাদা। তিনি নিজেই এসে তোমাকে সাধবেন দেখো। আর, একথাও তোমাকে বলে রাখছি— মায়ার সঙ্গে যদি মেগার ছাড়াছাড়ি হয়, তোমার সঙ্গেও ছাড়াছাড়ি হবে। ছেলেকে তুমি শুধু ভাল বাসতেই শিখেছ, কিন্তু তার মনটিকে চিনতে পারনি, চেষ্টাও করনি।

বদ্ধ দৃষ্টিতে, কিছুক্ষণ স্ত্রীর বুদ্ধিদীপ্ত স্নিগ্ধ মুখখানির পানে চেয়ে থেকে যাদব রায় বললেন : সত্যি, আজ তুমি যেন নতুন কথা শোনালে, সেই সঙ্গে নতুন রূপটিও দেখালে। বেশ, এ ব্যাপারে আমি মুখ বন্ধই করলুম।

নতুন একটি পাল্লার পরিকল্পনা করে মায়াকে শোনাবার জন্যে ক'দিন ধরেই মৃগেন যেন ছটফট করে বেড়াচ্ছিল, কিন্তু কিছুতেই সে সুযোগ ঘটেনি। বে-পরোয়া হয়েই সে বাগান ডিঙিয়ে মায়ার ঘরের জানলার

নীচে ধর্না দিয়েছিল, কিন্তু সেখানেও বিঘ্ন দেখা দেয়। হতাশ হয়ে সন্তর্পণে নিজের পড়বার ঘরে সবার অজ্ঞাতেই সে আশ্রয় নিয়েছিল। বাবার আস্ফালন এবং বিমাতার সঙ্গে বিতর্ক সবই তার শ্রুতি স্পর্শ করে। স্তব্ধ বিস্ময়ে সে-ও বুঝি আজ রূঢ়ভাষিণী বিমাতার সত্যকার পরিচয় পেল ; সারা অন্তরটি মথিত করে একটি অপূর্ব্ব পুলকের প্রবাহ বয়ে গেল যেন ! প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে মেঝের উপরে হেঁট হয়ে এই মমতাময়ী দেবীর উদ্দেশে মাথা নত করল সে।

মায়া চলেছে ঘাটে হাতে উচ্ছিষ্ট বাসন। ঘাটের পথে পা বাড়িয়েছে—সামনে দৃষ্টি পড়িতেই মৃগেনের বিমর্ষ মুখখানা চোখে পড়ে—মনে মনে এই মুখখানাই যে ভাবছিল সে ! দূর থেকেই দু'জনের চোখোচোখি হোল....মৃগেন উন্মুখ হয়ে তাকাল, হঠাৎ যেন কাকে দেখে চোখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চলে গেল। মায়াও ঘাড় বেঁকিয়ে পিছনের দিকে চাইতেই দেখে, কানাই হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে এই পথে....মায়াকে দেখেই মুখখানা তার হাসিতে ভরে ওঠে,..মুখ ফিরিয়ে তাড়াতাড়ি মায়া ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল।

মায়াকে দেখতে দেখতে কানাই ক্রমশ ঘাটের কাছে এগিয়ে আসে, মায়া তখন নিজের মনে বাসন মাজতে বসেছে....কানাই সুর করে মনসা-মঙ্গল পালার একটা ছড়া ধরল :—

"আমায় বিয়ে কররে লখা আমায় বিয়ে কর্।
আমি যেমন যুব-কন্যা তেমন তুমি যুব বর ॥"

গাইতে গাইতে ঘাটের সামনে এসে দাঁড়ালো কানাই, চার দিকে

চেয়ে কেউ নেই দেখে বললো : মুখের একটা বাহোবাও দিলে না মায়া ?

বাসন মাজতে মাজতেই মায়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো : মুড়ো ঝাঁটাগাছটা যে সঙ্গে আনিনি....

কানাই বললো : বটে, মেগার বেলায় হেসে হেসে কথা, আর আমার বরাতে মুড়ো ঝাঁটা ! কিন্তু সে গুড়ে ত বালি, পথে পড়েছে কাঁটা, ভরসা এখন কানাই—তাই বলি....

মুখখানা শক্ত করে মায়া বলল : ভাল চাও ত দূর হও বলছি, নইলে এই ঝামা দিয়ে ঘসে পোড়ার মুখ বোচা করে দোব—

নির্লজ্জের মতন হেসে কানাই বলল : তা দেবে বৈ কি ! শহরে চলেছি, তোমাকে দেখেই মনে হোল—জেনে যাই যদি কিছু আনবার ফরমাস পাই ; তাই ছুটে এলুম জানতে, আর তুমি চাইছ ঝামা দিয়ে মুখখানা ঘষে দিতে ! বেশ, তাই দাও—এতেও আমার স্বর্গসুখ, তোমার হাতের পরশ ত পাব !—বলেই আবার মনসা-মঙ্গলের একটা ছড়া ধরে :—

> "বারো গাড়ী কাঠ গো কন্যে বারো ঘড়া জল।
> আনতে হবে আরো কিবা, তাই কন্যে বল্॥"

মায়া : যে চুলোয় যাচ্ছ যাও না, আমায় জ্বালাচ্ছ কেন ?

কানাই : জ্বালাব কেন, জিজ্ঞেস করছি—শহর থেকে তোমার জন্যে কি আনবো ?

মায়া : একগাছা দড়ি এনো।

কানাই : দড়ি ? সে কি ! দড়ি নিয়ে কি করবে ?

মায়া : তোমার গলায় দিয়ে ঐ তেঁতুল গাছের ডালে লটকে দোব, আমার হাড়মাস জুড়োবে।

কানাই : আচ্ছা গো আচ্ছা, তাই হবে। সত্যিই গলায় ঝুলিয়ে এমন একখানা চীজ আনবো, তোমার হাড়-মাসে লাগবে মিষ্টি হাওয়া, আর কাণ হবে ঝালাপালা....আচ্ছা চল্‌লুম...

কানাই চলে যেতেই বাসন কখানা নিয়ে মায়া উঠলো, তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলো নিকটে আর কেউ আছে কি না! কিন্তু বাঞ্ছিত মানুষটির কোন সন্ধানই পেল না। দেখল—কানাই চলেছে ইষ্টিসানের পথে মনসা-মঙ্গলের গান ধরে।

চাতালে উঠতেই ছোট বৌদি—অতুলের স্ত্রী প্রসাদীর সঙ্গে দেখা। হেসে জিজ্ঞাসা করল সে : কানাই যে শহরে চলেছে, তোকে খুঁজছিল ; দেখা হয়েছে ত—তোর জন্যে কি আনতে বললি ?

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে মায়া বৌদির পানে চেয়ে 'দড়ি আর কলসী' এই বলে ছুটে চলে গেল।

প্রসাদী মুখ মুচকে বলল : মেয়ের কথার ছিরি দেখ না!

পিছন থেকে বড়বৌ করুণা এসে জিজ্ঞাসা করল : কি হয়েছে রে ছোটকী? মায়া অমন করে চলে গেল যে!

প্রসাদী ঝংকার দিয়ে বলে উঠল : জানি নে বাপু, ঘাটে দাঁড়িয়ে কানাইয়ের সাথে ঠাট্টা-মস্করা হচ্ছিল, আমি এসে জিজ্ঞাসা করলুম—কানাই ত শহরে যাচ্ছে তা তোর জন্যে কি আনতে বললি! এতেই মেয়ে একেবারে রেগে টং! মুখে-ঝাপটা দিয়ে বলে কি না—দড়ি আর কলসী আনতে বলেছি।

করুণা মায়ার পক্ষ নিয়ে বলল : কত দুঃখে যে মায়া একথা বলেছে তা বোঝবার ক্ষ্যামতা তোর যদি থাকত ছোটবৌ, তাহলে এইখানেই মুখ বন্ধ করতিস্‌!

ছোটবৌ কথা তলিয়ে না বুঝে ঝাঁঝিয়ে বলে উঠল : ,ও ! তাহলে ওর সনে কথা কয়ে ঝকমারি করেছি বল ! বড়বৌ করুণা মুখখানা শক্ত করে শুনিয়ে দিল : বাড়াতে আইবুড়ো মেয়ে থাকলে বুঝে-সুঝে কথা বলতে হয়। কানাই পরের ছেলে—সে শহরে যাচ্ছে বলে মায়া তাকে ফরমাস করবে কেন্ না ? আর সে হতভাগাই বা মায়াকে জিজ্ঞেস করতে আসে কোন্ সাহসে—তোরাই ত তার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিস্।

ছোট বৌ এ কথার কোন জবাব দিল না—গো-ভরে চলে গেল।

বাইরের চালা-ঘরে নূতন প্রতিমার প্রাথমিক কাজ অর্থাৎ কাঠামোর ওপর খড়-দড়ি বাঁধতে বাঁধতে পীতাম্বর মায়ার সঙ্গে কত কথারই চর্চ্চা করছিল। আলাদা হয়ে খাওয়াদাওয়ার কথা উঠতেই বলে উঠল সে : বেশ হয়েছে···সব এখন চুপ....কিন্তু আমাদের ত মন্দ চলছে না, মা কালীর প্রতিমা দেখে খুসি হয়ে পালবাবুরা আরো পাঁচ টাকা বেশী দিল....আর এই জগদ্ধাত্রীর প্রতিমা গড়ে যা পাবো—দুটো মাস নিশ্চিন্তি। গোকলোর ত উপায় আছেই, কিন্তু অতলোর চলছে কি করে সেই ত ভাবনা··· ভেবেছিলুম, হতভাগা দুদিনে ঢিট হয়ে মাপ চাইবে—আমিও ক্ষমা-ঘেন্না করবো,—কিন্তু কই—হপ্তা কেটে গেল—নীচু ত হোল না....

মায়া বলল : কি করে হবে, পেহ্লাদে কানাই যে নাচাচ্ছে, ছোড়দার ত এক পয়সা রোজগারের মুরোদ নেই—পরের পয়সায় নবাবী চলছে আর ছোটি বৌদি তাতেই জাঁক করে জানাতে চায়—আলাদা হয়ে কি সুখই ভোগ করছেন—

পীতাম্বরের রক্ত গরম হয়ে উঠল, বলল : আমার যে 'উল্টো বুঝলি রাম' হোল রে মায়া !····ভাবলুম এক, হোল আর। আজ কি না ঐ হাড়হাবাতে বখা ছোঁড়া কানায়ে হয়েছে ওদের মুরুব্বী। আর এমনি অধঃপাতে গেছে ওরা—পরের দানে। পোড়া পেট ভরাচ্ছে—যাক্ চুলোয় যাক্, কি দরকার ওদের কথায় থেকে—আলাদা যখন করে দিয়েছি।····বলতে বলতে হঠাৎ মায়ার পানে চেয়ে বললেন : হ্যাঁ রে, মিগেন আর আসে না বুঝি ?

মায়ার মুখখানা লাল হয়ে উঠলো, অমনি সে মুখ শক্ত করে জবাব দিল : না বাবা, চালা কাঠখানা খালি খালি তোলাই আছে—একবার এলে হয় !

মেয়ের মুখের পানে চেয়ে মনের ভাবটুকু বুঝি উপলব্ধি করেই ফিক করে হেসে পীতাম্বর বললেন : পাগলী মেয়ে ! আমি কি সত্যি সত্যিই তাকে চালা কাঠ দিয়ে ঠ্যাং ভাঙতে বলেছিলুম রে ! ওর চশমখোর বাপই যে আমাকে তাতিয়ে দিয়ে গেল—বলে কিনা, আমি পুতুল গড়ি ! এই যে খড়-দড়ি-মাটি নিয়ে বসেছি—এ কি পুতুল তৈরীর খেলা ? তোর সঙ্গে কথা বলছি, হাত চলছে, আর এর মধ্যে চলছে সাধনা—মা আমার মূর্তি ধরে বিরাজ করছেন এখানে—এ যে ওঁরই কাজ—ওঁরই প্রতিমা ; আর ঐ বেকুব বলে কি না আমি গড়ি পুতুল ! তাইতেই ত ওর ওপর রাগ করে···নৈলে আমি কি মিগেনকে উদ্দেশ করে ও-কথা বলি·····আর ও-কি আমার প্রাণের কথা রে ? তোরা শুধু আমার বাইরেটাই দেখিস্—ভেতরটার পানে ভুলেও তাকাস্ না........

গাঢ়স্বরে মায়া ডাকলো : বাবা !

ততোধিক গাঢ়স্বরে পীতাম্বর বললেন : আমি যে ওকে কত ভালবাসি কেউ তা জানে না। ওরে আমি যে ওর ভেতরটা দেখেছি......কি দেখেছি শুনবি? আমারই মতন ও যে মায়ের দরদী শিল্পী—দুজনেই আমরা কারিকর। খড় দড়ি মাটি রং তুলি নিয়ে আমি গড়ি প্রতিমা,—আর কাগজে কলমে কালি দিয়ে ও রচে মন্তর—যাতে মৃন্ময়ী প্রতিমা হয় চিন্ময়ী মা!

বাপের কথায় মায়ার চোখদুটি অপূর্ব হয়ে ওঠে।

* *
*

এই সময়ে নিজের রচিত গান গাইতে গাইতে পীতাম্বরের বাড়ীর দিকে আসছিল মৃগেন—

মা! তোর এ কি মজার খেলা—

বাড়ীর খিড়কীর দিকে যে ঘরে পীতাম্বর ও মায়া থাকে—তার পিছনে ছোট একখানি বাগান। একদিকে বাড়ী, তিনদিকে বেড়া দেওয়া। বাগানের পাশ দিয়ে সরু রাস্তাটি এঁকে-বেঁকে গিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছে। বাড়ীর ও পাড়ার চেনা-শোনা লোকেরা এ বাড়ীতে আসতে-যেতে এই রাস্তাটি ব্যবহার করে। মৃগেন চুপি-চুপি এই রাস্তার বাঁকটির কাছে এসে দাঁড়ালো ঠিক যেন চোরের মতন। সে চারদিকে চাইতে লাগলো—হঠাৎ দেখতে পেল-একটা ছাগল মন্থর গতিতে রাস্তা ধরে আসছে। অমনি তার মাথায় একটা ফন্দি জাগল—ছুটে গিয়ে ছাগলটাকে ধরে বেড়ার গায়ে তৈরী বাঁশ-দিয়ে-ঝোলান-আগড়টার একদিক তুলে ছাগলটাকে বাগানের ভিতরে ঢুকিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মাথাটি গলিয়ে বাগানে ঢুকে পড়ল। তারপর ছাগলটাকে তাড়া দেবার

ভঙ্গিতে উৎসাহী হয়ে জিভ ও তালুর সংযোগে চেঁচিয়ে উঠলো : হেট্ হেট্ হেট্....

পরক্ষণেই পীতাম্বরের ঘরের পূর্ব-পরিচিত জানালাটির গরাদের উপর ভেসে উঠলো একখানি কৌতুকোজ্জ্বল হাসিমাখা মুখ! চাপা গলায় মায়া প্রশ্ন করল : ও কি হলো ?

মৃগেনের মুখখানা হাসিতে ঝলমল করে উঠলো, কিন্তু মুখের হাসি চাপবার চেষ্টা করে বলে সে উঠল : দেখছ না, হতভাগা ছাগলটা বাগানে ঢুকে গাছপালাগুলো খেয়ে সব সাবড়ে দিল! হেট্ হেট্ হেট্—

মায়া : ছাগলকে ঢোকালে কে ?

মৃগেন : তার মানে ?

মায়া : মশাই ত বাঁশ-কল তুলে ওকে সাঁধ করিয়ে দিলেন, এখন বলা হচ্ছে—হেট্ হেট্ হেট্—মতলবটা কি শুনি ?

মৃগেন : শোননি, সুন্দর বিন্তের সঙ্গে দেখা করতে সুড়ঙ্গ কেটেছিল, আমার ত সে ক্ষমতা নেই, তাই....ওই যা! শালার ছাগল বেগুন গাছটা সত্যি সত্যিই মুড়িয়ে দিলে যে...হেট্ হেট্ হেট্...

মায়া : এই, চুপ্ চুপ্—ছোড়দা আসছে—

মৃগেন : এই রে চোর এবার বামালশুদ্ধ ধরা পড়ে বুঝি কোটালের হাতে! এর পর মশানের পালা—বলতে বলতে ছুটে গিয়ে ছাগলের কান দুটো ধরে চেঁচিয়ে উঠলো—হেট্ হেট্ হেট্...

অতুল রাস্তা থেকে নেমে এই পথেই আসছিল। ব্যাপার দেখে থমকে দাঁড়ালো, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো পাকিয়ে মৃগেনের পানে চেয়ে বলে উঠলো : কে রে ? কি হচ্ছে ওখানে ? য়্যাঁ—মেগা ? তুই যে আমাদের খিড়কীর বাগানে আবার ঢুকেছিস্ ?

মৃগেন : কেন ঢুকেছি দেখতে পাচ্ছ না? এই হতভাগা ছাগলটা যে বেগুন-গাছগুলো সব সাবড়ে দিচ্ছিল, তাই কান পাকড়ে ধরেছি! কাদের ছাগল বলতে পার অতুলদা ?

অতুল : যাদের ছাগলই হোক না কেন, তোর তাতে মাথাব্যথা কিসের শুনি ?

মৃগেন : বা-রে! গাছগুলো সব মুড়িয়ে দিচ্ছিল....

অতুল : বেশ করছিল, তোর তাতে কি ? তুই আমাদের বাগানে ঢুকবি কেন ? ফের যদি এ পথ মাড়াতে দেখি আর কোন দিন, তাহলে ঠ্যাং দুখানা আস্ত রাখবো না....

মৃগেন : তুমি আমাকে খামকা অপমান করছ অতুল দা!—ভাল হবে না কিন্তু—

অতুল : থাক থাক আর মান কাড়াতে হবে না—একটা পাশ করেছেন বলে ভেবেছেন উনি সবার মাথায় পা দিয়ে চলবেন! যা-যা-যা—

হুঁ—যা-তা বলে পাগলে—যা পায় খায় ছাগলে—হেট্ হেট্ হেট্—আসল কথাটাই কিন্তু বলা হোল না—হেট্ হেট্ হেট্—

কথাগুলো সুর করে বলতে বলতে ছাগলের কান দুটো ধরে টানতে টানতে বাঁশকলের আগড়ের পাশ দিয়ে বেরিয়ে জানালার পানে নির্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নালিশটা যেন জানিয়ে মৃগেন চলে গেল।

পরক্ষণেই জানলায় ময়নাকে দেখা গেল, অতুলকে লক্ষ্য করে চড়া সুরে সে বলল : তার চেয়ে রাস্তাটায় বেড়া দিয়ে দাও না ছোড়দা, কেউ পথ মাড়াবে না।

অতুল চটেছিল, মুখ-ঝাপটা দিয়ে জানালো : আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন দেখা যাবে, তোকে আর ফোড়ন দিতে হবে না—

মায়া : ছাগল পড়েছিল বাগানে, তাড়িয়ে দিচ্ছিল, তাতে যা নয় তাই ওরে বললে, আর তোমার পেয়ারের কানাই এসে যখন ঐখানে দাঁড়িয়ে গজল ভাঁজে— তোমার চোখ দুটো কোথায় থাকে তখন শুনি ?

অতুল : যেখানেই থাক্ না তোর কি ? কানাই আসবে, হাজার বার আসবে—তারে কে ঠেকায় ! জানিস্, তারই দৌলতে মনসা-মঙ্গলের আখড়া বসিয়েছি আমার ঘরে। সে আসবে, গান গাইবে, শুনতে না পারিস্ কানে তুলো দিয়ে থাকিস্।

মায়া : আচ্ছা, আসুক বাবা ; আসুক বড়দা। তোমার কানায়ের ছেরাদ্দ যদি না পাকাই—বলেই মায়া জানালার কপাট দুখানা জোরে বন্ধ করে দিল—সেই শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বড় রাস্তার ওপরে ঢোলের বাজনার শব্দ মিশে গেল। অতুল চোখ দুটো কপালে তুলে দেখলো—একটা বড় ঢোল গলায় বেঁধে বাজাতে বাজাতে আসছে কানাই। দেখেই অতুলের মন খুসিতে ভরে গেল। সোল্লাসে সে কানায়ের প্রতীক্ষা করতে লাগল। একটু পরেই সরু রাস্তাটি ধরে বেড়ার ধারে এসে অতুলকে দেখতে পেয়েই সোল্লাসে সে বলে উঠল : শহর থেকে সরাসরি ফিরছি অতুলদা, ঢোল বিনে কি পালা জমে ? ইষ্টিসান থেকে তাই না একেবারে ধূলো-পায়ে এসে হাজির হয়েছি।

বলেই সে জোরে জোরে ঢোল বাজাতে লাগলো—সঙ্গে সঙ্গে নাচও চললো।

প্রসাদী ঘাট থেকে ফিরছিল গা ধুয়ে। সকৌতুকে সংগত শুনে বলে উঠলো : কি হচ্ছে এখানে সঙের মতন ?

অতুল বললো : সঙ নয়, চল না ঘরে। সংগত শুনে তাক লেগে যাবে। কানাই ঢোল কিনে এনেছে সহর থেকে।

কানাই তাড়াতাড়ি পকেট থেকে একখানা চিরুণি বার করে বললো : তোমার কাঁকই চিরুণী এনেছি বৌদি—এই নাও।

জানলার দিকে চেয়ে চোখ-মুখ ঘুরিয়ে ইসারা করে প্রসাদী বললো : এখানে কেন, চারদিকে শত্তুররা চেয়ে আছে—ঘরে এসো।

কানায়ের হাত থেকে চিরুণিখানা নিয়ে আঁচলে জড়িয়ে প্রসাদী এগুলো, অতুল ও কানাই পিছু পিছু চললো। যেতে যেতে কানাই জানলার পানে চেয়ে বললো : এই দড়িগাছটিও এনেছি কিনে, ঢোলের সঙ্গে দিব্যি মানিয়েছে, নয় কি অতুলদা ?

রান্নাঘরে মায়া রাঁধছিল। কাঠের উনান—ডাল চড়িয়েছে মাটির হাঁড়িতে। মায়া খুন্তি দিয়ে নাড়ছে, আর এক একবার জানালার দিকে চাইছে। এমন সময় তার বড় বৌদি ঘরে ঢুকলো। তার হাতে এক ফালি কপি। মায়ার দিকে চেয়ে করুণা জিজ্ঞাসা করল : কি চড়িয়েছিস মায়া, ডাল বুঝি ?

ধরা গলায় মায়া উত্তর দিল : হ্যাঁ, বৌদি।

করুণা বলল : বেশ বাস ছেড়েছে। হ্যাঁ, তোর বড়দা এই মাত্র এলেন। সহরে গিয়েছিলেন—নতুন বাঁধাকপি একটা এনেছেন, খানিকটা কেটে দিলেন। ডালের ওপর কপি চডচড়ি বেশ হবে।

মায়া : রাখ ওখানে বৌদি।

করুণা : ও কি, তোর গলাটা ধরা-ধরা কেন লা ?—বলেই কপিটি রেখে থপ করে মায়ার মুখখানা তুলে ধরে বলল : অ মা ! কাঁদছিলি বুঝি ?

মায়া: কাঁদবো কেন, দেখছ না ভিজে কাঠ দিয়ে কি রকম ধোঁয়া বেরুচ্ছে।

করুণা: কাঠের দোষ কেন খামকা দিচ্ছিস্ বোন, ও ত দিব্যি জলছে। তা কান্না ত আসবারই কথা ভাই, মৃগকে দেখলেই ছোট ঠাকুর জ্বলে ওঠেন। বেচারীকে কি অপমানটাই করলে, ভাল মানুষের ছেলে, আর পেটেও বিদ্যে আছে তাই গায়ে মাখলে না—হেসেই উড়িয়ে দিলে, আর ওর আহ্লাদে কানাই ঢোল গলায় বেঁধে যেই নাচতে নাচতে এলেন, ওর আর মুখে আহ্লাদ ধরে না—আমি সব বলেছি তোর দাদাকে।

মায়া: তুমি দাদাকে এরই মধ্যে সব বলেছ বৌদি?

করুণা: বলব না? আমার গা যে কর্‌কর্ করছিল রে! উনি ত শুনে একবারে গুম্ হয়ে গেলেন। বললেন—রায় মশায়কে চটিয়ে দিয়ে একে ত নিজের পায়ে কুড়ুল মেরেছেন, ওরা এই ফুরসুদে উঠে-পড়ে লেগেছে মিগেনের মনটাও যাতে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু উনি বলেছেন—তা হতে দেবেন না, বাপ ছেলে দু'জনকেই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মিল করে দেবেন।

কথাটা শুনে মায়ার মুখখানা যেন আনন্দে চক্‌চক্ করে উঠলো। করুণা বলল: কপির ফালিটা রেখে গেনু দিদি, কুটে-কাটে দিয়ে যাব যে, সে সময় এখন নেই—মনুষ্যি তেতে পুড়ে এসেছে কি না—

করুণা চলে গেল। মায়া আপন মনে বলল: একেই বলে আঁতের টান। ঝগড়া ঝাঁটির পরেও বড়দার দরদ ঠিক আছে, বড়দা দেবতা—

খুন্তি দিয়ে ডাল তুলে টিপে দেখে মায়া সরাটি চাপা দিল হাঁড়ির মুখে। তার পর খুরশি পিঁড়ের কাছে-রাখা টুকনি থেকে কাত করে জল ঢেলে

হাতটি ধুলো—সঙ্গে সঙ্গে গুন্-গুন্ করে মিংগেনের রচা গান একটি গাইতে লাগলো—

দুর্গে দুর্গমে রেখো দুর্গতি হারিণী।
পড়ে বিপদে ডাকিমা তোরে বিপদবারিণী॥

ওদিকে কলকে হাতে করে কানাই এসে যে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে গান শুনছিল—তা সে জানতে পারেনি। এই সময় সহসা ঘরে ঢুকে কানাই বলল: বা! খাসা গলা ত তোমার মায়া! ইচ্ছে করছিল —ছুটে গিয়ে ও-ঘর থেকে ঢোলটা এনে সঙ্গত চালাই—মাইরি, ভারি মিষ্টি—যেন মধু ছড়াচ্ছ!

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে কানাইয়ের পানে তাকিয়ে মায়া বলল: তুমি এখানে কি করতে মরতে এসেছো?

কানাই: মরতে আসব কেন, আগুন নিতে এসেছি, এই দেখ না কলকে। ছোড়দা তামুক খাবে, ওদের উনুন এখনো ধরেনি কি না....

মায়া: আগুন নেবার আর জায়গা পাওনি মুখপোড়া—বেরোও বলছি—

কানাই: মাইরি, রাগলে তোমায় কি সোন্দর মানায়। ও কি, অমন করে তাকাচ্ছ কেন মায়া, আমি তোমাকে এত ভালবাসি, আর—

মায়া এই সময় হাতখানা ঘুরিয়ে উনান থেকে জ্বলন্ত একখানা কাঠ তুলে আক্রমণের ভঙ্গিতে বলে উঠলো: তোমার ভালবাসার নিকুচি করেছে পোড়ারমুখো ড্যাগরা কোথাকার—

অস্ফুট স্বরে—'বাপ রে' বলেই কলকে হাতে করে চম্পট দিল কানাই। কাঠখানা উনানে আবার গুজে দিয়ে হাঁড়ির মুখের সরাখানি খুলে খুন্তিতে করে ডাল পরীক্ষা করছে মায়া, এমন সময় ঘরে ঢুকলেন

পীতাম্বর। সামনে কপির দিকে দৃষ্টি পড়তেই জিজ্ঞাসা করলেন: কপি কোত্থেকে এলে রে—এখন ত এর সময় নয়, কে আনলে?

মায়া বললে: বড়দা শহর থেকে এনেছিলেন, বড় বৌদি দিয়ে গেল।

চটে উঠে পীতাম্বর বললে: দিয়ে গেল, দিয়ে গেলেই হোল, তুই নিলি কেন?

মুখখানা শক্ত করে মায়া বলে উঠলো: তুমি যেন দিনকের দিন কি হোচ্ছ বাবা, ঘরে এসে বৌদি যত্ন করে দিয়ে গেল, আর আমি ফিরিয়ে দেব?

মায়ার কথায় পীতাম্বর শান্ত হোলেন—বড় ছেলের দরদে মন তাঁর ভিজে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ছোট্ট ছেলের জন্যে মনে জাগলো দরদ; বললেন: সে হতভাগা ত ঘরেই বসে আছে, কি করে চলছে কে জানে। মায়াকে বললেন: বঁটিতে এর আধখানা কেটে অতুলের ঘরে দিয়ে আয় মা!

অতুলের রান্নাঘরে গিয়ে মায়া দেখে প্রসাদী বঁটিতে কপি কুটছে। মায়া বুঝলো, কপিটা তিনভাগ করে বড়দা তিন ঘরের জন্যেই ব্যবস্থা করেছেন। মায়াকে দেখে মুখঝাপটা দিয়ে প্রসাদী বললো: এ সব আধিখ্যেতা, বড়মানষী জানানো, আমি তো ফিরিয়ে দিচ্ছিলাম, উনি হাঁ হাঁ করে উঠলেন তাই।

মায়ার গলার স্বর শুনে অতুল ছুটে এসে জিজ্ঞাসা করলো: হ্যাঁ রে, কানাইকে এক কলকে আগুন আনতে পাঠিয়েছিলুম, তুই না কি পোড়া কাঠ নিয়ে মারতে গিয়েছিলি তাকে?

মুখখানা উঁচু করে মায়া জবাব দিল: মুখপোড়া পালিয়ে এলো যে, নইলে জন্মের মত মুখখানা পুড়িয়ে দিতুম তার! আর কোন কথা শোনবার প্রত্যাশা না করেই মায়া ছুটে চলে এল ছোড়দার ঘর থেকে!

অগত্যা অতুল বৌকে শুনিয়ে পণ করল: এই কানায়ের, গলায় ওকে ঝুলিয়ে দিয়ে গুমর ওর—ভাঙবো ভাঙবো ভাঙবো।

যাদব রায়কে কানাই গ্রাম সুবাদে যেদো মামা বলে। যাদব রায়ের রাগও ক্রমশঃ পড়ে এসেছিল; পীতাম্বরও উসখুস করছিল—যাতে মিল হয়ে যায়। কিন্তু কানাই লাগিয়ে-ভাঙ্গিয়ে যাদব রায়কে এমনি তাতিয়ে দিলে যে, যাদব রায় কড়া নজর রাখলো মৃগেন যাতে পীতাম্বরের বাড়ীর ত্রিসীমাতেও না আসতে পারে। আর এই আসা-আসির দিকে অতুল, প্রসাদী ও কানাই তিনজনেই যেন আড়ি আগলে থাকে। অনেক বুদ্ধি খেলিয়ে মৃগাঙ্ক শেষে দুঃসাহসে ভর করে মায়ার সঙ্গে দেখা করবার এক ফন্দী এঁটে বসলো। পল্লীগ্রামে পুকুরে গভীর রাতে ভোঁদড় নেমে মাছ খেয়ে যায়। কিন্তু হঠাৎ এসেই যাতে ভয় পেয়ে পালায়—এই উদ্দেশ্যে বাঁকারির একটা তেকাটা তৈরী করে পুরাতন জামা তার ওপর চড়িয়ে মাথায় একটা চুন-মাখানো হাঁড়ি বসিয়ে পুকুরের এক কোণে পুতে রেখে দেওয়া হয়। হঠাৎ তার দিকে নজর পড়লেই মনে হয় যেন একটা কিম্ভূত-কিমাকার কিছু হাত দুটো মেলে দাঁড়িয়ে আছে। শহরবাসীদের কাছে জানোয়ার তাড়াবার এই কৌশলটি অভিনব হলেও, পল্লী-অঞ্চলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এটি পরিচিত ব্যাপার।

সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে ঘাটে বসে বাসনগুলি একে একে মেজে সিঁড়ির ওপর রেখে কাপড় কাচতে জলে নেমেছে মায়া, এমন সময় ওপারের আঘাটার একটা অংশে পোতা মানুষের নকল মূর্তিটার মুখের হাঁড়ির ভিতর দিয়ে অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে কে ডাকলো: মা-য়া!

অন্য মেয়ে হলে শুনেই হয় ত ভয়ে ভীর্মি যেত জলেই, না হয় আঁত্‌কে চীৎকার তুলে বাড়ীর ও পাড়ার লোক জড় করত। এই মেয়েটির প্রকৃতি কিন্তু একেবারে আলাদা ধাতুতে গড়া। তাই শব্দ শুনে প্রথমটা চমকে উঠলেও, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে চোখ দুটো বড় করে সন্ধ্যার ধূসর আবরণ যতটা ভেদ করে ও-পারে ফেলা যায় সেই চেষ্টাই করলো।

হাঁড়ির ভেতর থেকে এই সময় হুম্‌কীর মতো একটা গুরুগম্ভীর স্বর আবার নির্গত হোল: হুম্‌!

মায়া এবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো, তার পর আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে ঘাটের দিকে একটু এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে সিঁড়ি থেকে লোহার হাতখানা টেনে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো জলে! কয়েক মিনিটের মধ্যেই সাঁতার কেটে ওপারে বুক-জলে মাটিতে পায়ের তলা ঠেকতেই একটু থেমে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। তার পর হাতাটাকে হাতিয়ারের মত বাগিয়ে ধরে জলের মধ্যে পা টিপে টিপে মূর্তিটার মুখখানা লক্ষ্য করে এগিয়ে চললো।

শক্তের ভক্ত সবাই। শক্তি পরীক্ষার সম্ভাবনা দেখে মূর্তিই আগে মুখোস খুললো ভয়ে। চুণ-মাখানো হাঁড়ির ভেতর থেকে মুখখানা বা'র করে মৃগেন সভয়ে বলে উঠলো: আমি কানাই নই—মৃগ।

চাপা-গলায় মায়া বলল: সে আমি আগেই জেনেছিলুম। কানাই হলে ঢিল ছুড়ত, এমন করে ভোল বদলাবার মতলব তার মাথায় ঢুকত না। আজকের মতলবখানা কি শুনি?

মৃগেন: যেদিনই আসি দেখা করতে, অমনি একটা না একটা বাধা এসে পড়বেই। কথাটা বলবার আর ফুরসত পাই না।

মায়া : আমারো তা জানতে বাকি নেই। তোমার সে পালাটা শেষ হয়েছে ?

মৃগেন : কবে ! কিন্তু তোমাকে না শুনিয়ে শান্তি পাচ্ছি নে।

মায়া : আমার মন পড়ে আছে তোমার পালার দিকে। কিন্তু কোন উপায় ত দেখছি নে। সবাই যেন আড়ি আগলে আছে।

মৃগেন : একটা উপায় ঠিক করেই তোমাকে জানাতে এসেছি! ভ্যাগ্যিস্ এ পুকুরে ভোঁদড় পড়তো, নৈলে কেউ এটাকে এখানে রাখতো না, আর আমারও কথা বলবার এমন ফুরসত মিলত না।

মায়া : এই বক্তৃতাই তোমাকে খেয়েছে। বাজে কথা ছেড়ে কাজের কথাটাই বলে ফেল আগে, আবার কেউ এসে পঁড়বে!

মৃগেন : ভারি নিরিবিলি জায়গা একটা খুজে বা'র করেছি।

মায়া : সত্যি ? কিন্তু কানাইয়ের অগম্য জায়গা এ তল্লাটে কোথাও দেখিনা যে!

মৃগেন : আছে। তবে জায়গাটা ভাল নয়। জমিদারবাবুদের সেই ভূতুড়ে বন্দটা—বহুকাল থেকে পড়ে আছে। ভূতের ভয়ে কেউ ওর ত্রিসীমানায় যায় না। মস্ত একটা অশোক গাছ আছে সেখানে। তার তলাটা সান-বাঁধানো। খাসা জায়গা, ঐখানে আমাদের পালা শোনার বৈঠক বসবে। কি বল ?

মায়া : একেবারে মিলে গেছে।. আমিও ঐ পোড়ো বাগানটার কথা ভেবেছিলুম যে—কিন্তু বলা আর হয়নি। তাহলে একটা লগি নিয়ে আমি যাবো, যেন অশোক ফুল পাড়তে গেছি। সত্যি, তুমি শুনলে হয়ত হাসবে, রাত্তিরে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখি যেন তুমি পালা পড়ছো, আর আমি বসে বসে শুনছি।

মৃগেন :—তাহলে ঐ কথাই রইলো। কাল দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়া সেরে সবাই যখন ঘুমুবে—

মায়া : সেপাইডাঙ্গার চরে আমাদের বৈঠক বসবে। কিন্তু দুঃখু হচ্ছে কানাই বেচারীর কথা ভেবে—আড়ি পাতাই তার বৃথা হবে কাল।

নির্জন, দুর্গম ও সাধারণের অগম্য কুখ্যাত ভৌতিক বাগানে সংকেত অনুযায়ী দুটি উৎসাহী তরুণ-তরুণী মিলিত হয়ে মিলনের এক অপরূপ আদর্শ সৃষ্টি করে। বাইরে থেকে স্থানটিকে যত দুর্গম ও ভীষণ মনে হয়, কিনারার দিকে বেঁত ও নল-খাগড়ার বনের পাশ দিয়ে ভিতরে সেঁধুলে আর সে ধারণা থাকে না। মনে হয়, বনদেবী যেন বাহ্যিক বিশ্রী আবেষ্টনের মাঝখানে স্বহস্তে একটী মনোরম নিভৃত আস্তানা রচে রেখেছেন। যে সব নীরস গাছ সুন্দরবনের গাম্ভীর্য বজায় রাখে, তার প্রায় সবগুলিই এই জঙ্গলটির সামিল হয়ে আছে। শাল, শিশু, শিমুল, সুন্দরী, তিন্তিড়ি, সোঁদাল, গর্জন প্রভৃতি গাছের কাণ্ডগুলি স্তম্ভের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মাথার উপরে শাখা-প্রশাখাগুলোকে এমন নিবিড় ভাবে মিলিয়ে দিয়েছে দেখলে মনে হয় যেন প্রাকৃতিক একখানা চন্দ্রাতপ শোভা পাচ্ছে। কিনারার দিকে বেতান, হেঁতাল, নলখাগড়া, সোলাগাছ ও বলার ঝোপগুলি গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে প্রাচীরের মতন দাঁড়িয়ে আছে। সব চেয়ে মনোরম হচ্ছে—মাঝখানে একটি অতিকায় অশোক গাছের অপূর্ব বিকাশ। প্রকাণ্ড মূলটি পাথর দিয়ে ঘেরা। বছরের সকল ঋতুতেই গাছটি পুষ্প প্রসব করে, এইটিই এর বৈশিষ্ট্য। এই বেদিটি আশ্রয় করে আমাদের প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন-বৈঠক বসে।

মায়ার মনে হয়, মৃগেন তার রচনায় তাকে' উপলক্ষ করেই কথা সাজায়। নূতন পালাটিতে যে তেজস্বিনী সংকোচহীনা গ্রাম্য কিশোরীর চিত্রখানি সে এঁকেছে, পুঁথি শুনতে শুনতে মায়া তার প্রতি কথা—প্রত্যেক ভঙ্গিটি নিজের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে। এদের এই মিলনী ও নিবিড় বন্ধুত্বের মধ্যে বাহ্যিক ভাবে যদিও কোন কালিমা কোথাও ছিল না—নির্মল কাব্যরস উপভোগ করেই মনের আনন্দ তাদের কাণায় কাণায় ভরে ওঠে, কিন্তু তারই মধ্যে যে গোপন একটা রসধারা ফল্গুর মত তলে তলে, প্রচ্ছন্ন থাকতো সেদিকে দৃষ্টি দেবার ফুরসতও তারা পেত না।

লম্বা একটা বাঁশের লগি নিয়ে অশোক ফুল পাড়বার ছলে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসে মায়া, আর মৃগেন তার আগেই এসে বেদীটির উপর হাতে-লেখা খাতাখানি খুলে মায়ার প্রতীক্ষা করতে থাকে। মায়া এলেই তার মুখে ফোটে হাসি, বড় বড় অপূর্ব দুটি চোখ আরও অপূর্ব হয়ে ওঠে। পড়ার পর বিভিন্ন ভঙ্গিতে তার প্রসাধন চলে। নায়কের অংশ ভাবের আবেগে পড়ে মৃগেন, তখন নায়িকার কথাগুলি না পড়ে মায়ার আর উপায় থাকে না। গানগুলিতে সুর সংযোগ করে মৃগেন, তার পর দুজনে কণ্ঠ মিলিয়ে করে তার সদ্‌ব্যবহার। মৃগেন ভাবে তার রচনা হয়েছে সার্থক। মায়া ভাবে, কবির প্রসাদে তার জীবন হয়েছে ধন্য। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি ছাড়া ও কি কখন সম্ভব হয়! আনন্দে তার কিশোরী-চিত্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু এ সুখেও একদিন কানাই এসে বাদ সেধে বসলো। কানাই ছেলেটিও গোঁয়ার বড় কম নয়, ভয়-ডর বা লজ্জা-সরমের তোয়াক্কাও সে রাখে না। সেদিন গ্রামান্তর থেকে ফেরবার সময় অতুলদের বাড়ীতে যেতে পথটি সোজা হবে বলে এই পোড়ো বাগানের ভিতরেই ঢুকে,

পড়লো সে। হঠাৎ কানাইকে দেখে মৃগেন ও মায়া চমকে উঠলো। ভরা ভেবে পেল না—কি মতলবে কানাই সবার অগম্য এই ভূতুড়ে বাগানে এসে সেঁধুলো কিন্তু উপস্থিত-বুদ্ধিতে দুজনেই ওস্তাদ। তখনি একটা ফন্দি ঠিক করে নিল। মৃগেন সড় সড় করে সামনের জামরুল গাছের আগডালের ওপরে উঠে গেল, আর মায়া তাড়াতাড়ি আঁচলটি মাথায় ঘোমটার মতন করে টেনে দিয়ে অশোক গাছের গুঁড়িটির আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালো। বিষহরির গান গাইতে গাইতে কানাই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিল, কিন্তু মাটিতে লম্বা লগিটা পড়েছিল—পা লাগতে চমকে উঠলো সে। এ কি, লগিটা যে চেনা—অতুলদা'দের বাড়ীতে দেখেছে, এখানে এলো কি করে?—চার দিকে চঙমঙ করে চাইতেই অবগুণ্ঠনবতী মূর্তিটি তার চোখে পড়লো। তনখ ভয়ে বিষহরির গান ছেড়ে রাম নাম সুরু করে দিল। কিন্তু মায়ার হাতের কাঁকন আর পায়ের বুড়ো আঙুলের চুটকী দেখেই মনে তার সন্দেহ জাগলো, তার পর আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো: জয় রাম! তাহলে সাঁকচুন্নি নয়—আমারই হবু গিন্নী মায়ারাণী! সঙ্গে সঙ্গে দু হাতে ঘোমটাটি খুলে দিয়ে থুতিটি ধরতে যেতেই মায়া তাকে ঠেলে দিয়ে শাসিয়ে উঠল: খবরদার বলছি।

বটে! পেত্নী সেজে ভয় দেখানো হচ্ছিল, এখন আবার ধমকানো হচ্ছে?

কোন জবাব না দিয়ে আঁচলটি কোমরে জড়িয়ে লগাটি দুহাতে তুলে মায়া আপন মনে অশোকফুল পাড়তে মনোযোগ দিল। কানাই অমনি দন্তপাটি বিকাশ করে বলে উঠলো: কেন আমাকে হুকুম করলেই ত হোত!

মায়া: তোমাকে হুকুম করতে যাব কেন, আমার কি হাত নেই—

কানাই : তোমার আবার হাত নেই ; যে জোরে ঠেলা দিয়েছ তাতেই বুঝেছি হাত দুখানা কি ! কিন্তু এই ভর সন্ধ্যে বেলায় ভুতের বাগানে ঢুকতে ভয় করে না তোমার ?

মায়া : ভূতের চেয়ে মানুষকেই আমার ভয় বেশী। চুপি-চুপি দুটো ফুল পাড়তে এসেছি তাতেও বাদ সাধতে চাও। ভাল চাও ত চলে যাও, নইলে—

কানাই : তা কি কখন হয় ? আমি থাকতে তুমি পাড়বে ফুল ? কিন্তু লগি দিয়ে কি অশোক ফুল পাড়া যায় ?—দাঁড়াও, আমি গাছে উঠে পেড়ে দিচ্ছি, তুমি আঁচল পেতে কুড়োও—

মায়া : আমার ফুলে দরকার নেই—

কানাই : খুব আছে, নৈলে লগা নিয়ে এসেছ কেন ? আমি শুনছি, নে, লগা নামিয়ে আঁচল পেতে দাঁড়াও, ওপর থেকে আমি পুষ্পবৃষ্টি করি দেখ না—বলতে বলতে কানাই গাছে উঠে গেল। এইসময় জামরুল গাছ থেকে নেমে এসে কোঁচাটি খুলে মাথায় ঘোমটার মত করে দাঁড়ালো মৃগেন—তার ইঙ্গিতে সুকৌশলে সরে গেল মায়া। গাছ থেকে ফুল ফেলতে ফেলতে রসিকতা করতে লাগলো কানাই—অবগুণ্ঠনাবৃত মৃগেন ঘাড় নাড়ে- চাপা স্বরে জবাব দেয় : হুঁ।

এর পর নেমে এসে কানাই দেখে রাশি রাশি ফুলে মূর্তিটি আচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

'আবার ঘোমটা টেনেছ কেন'—বলেই কানাই যেমন এগিয়ে গিয়ে ঘোমটাটি খুলে দিয়েছে, মৃগেন অমনি হিঃ হিঃ করে অট্টকণ্ঠে হেসে উঠল।

বিস্ময়ের সুরে কানাই বলল : য়্যাঁ, এ কি ম্যাজিক না কি ? কোথায় গেল ?

অবাক হয়ে মৃগেন বললো : মায়া ? সে এখানে এসেছিল না কি ?

চোখ দুটো বড় করে কানাই মৃগেনকে যত দেখে, মৃগেন গলা চড়িয়ে ততই হাসে।

—পীতাম্বরের বাড়ীতে তিনটি সংসার পৃথক্ ভাবেই চলেছে।

মেয়ের বিয়ের জন্যে পনের টাকা জমানো দূরের কথা, প্রতিমা গড়ে ইদানীং যে উপার্জ্জন করেন পীতাম্বর, তাতে কোন রকমে পিতা-পুত্রীর জীবিকা-নির্বাহই হয়। পল্লী অঞ্চলে শীতকালটাই অল্প বা অনির্দিষ্ট উপায়ীদের অবস্থাকে অতিশয় জটিল ও বেদনাদায়ক করে তোলে। ছোট-বড় প্রায় প্রত্যেকেরই ভদ্রাসনের লাগোয়া ক্ষেত-খামার পুকুর থাকায় আহার্য্যের ব্যবস্থাটা কোন রকমে চলে গেলেও শীতের সংগে বোঝা-পড়াটাই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। শীত পড়তেই শীত-বস্ত্রের অভাব বিশেষ করে পীতাম্বরকে পীড়া দিয়েছে। গায়ের একটি মাত্র ফ্লানেলের জামাটি গত বছরও কোন রকমে গায়ে চড়িয়ে শীত কাটিয়েছিলেন, কিন্তু এ বছরে একেবারে ব্যবহারের বাহিরে গেছে, পাটে-পাটে সূতাগুলি এমনি এলিয়ে পড়েছিল যে, গায়ে চড়াতে না চড়াতেই ফেঁসে পড়ে। অবস্থা দেখে পীতাম্বর জোরে একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন : জামাটা এ্যাদ্দিনে দেহ রাখলে রে মায়া !

ধরা গলায় মায়া বলল : ওতে আর পদার্থ কি কিছু আছে বাবা, তুমি খুব সাবধানী—তাই গেল বছরটাও কোন রকমে গায়ে দিয়েছ ; এখন তোমার গরম জামা একটা না হলেই যে নয় বাবা !

মেয়ের মুখের পানে চেয়ে পীতাম্বর বললেন : তোর গায়ের দোলাই-

খানাও ত ছিঁড়ে ধুলধুলে হয়ে গেছে, আগে তোর গায়ের চাদরের ব্যবস্থা একটা করি, তার পরে—

বাধা দিয়ে মায়া জানাল : আমার আঁচোল আছে বাবা, এতেই এ-বছরের শীত কাটিয়ে দোব, কিন্তু তুমি বুড়ো হয়েছ—রক্তের জোর কমে গেছে, তোমার গায়ের জামা আগে দরকার যে !

মেয়ের মুখে দরদের কথা শুনে পীতাম্বরের আয়ত দু'টি চোখ জলে ভরে এলো ; অমনি উপযুক্ত দুই ছেলের কথা মনে পড়ে গেল—কৈ, এ দরদ ত তাদের প্রাণে আসে না—তারা ত কোন খবরই নেয় না বুড়ো বাপের কি হাল হোয়েছে !

মন্দার মরশুমে অন্য কিছু কাজের সন্ধানে বেরুবার জন্যেই জামা নিয়ে পড়েছিলেন পীতাম্বর। হতাশ হয়ে বললেন : নাঃ, বেরুনো আর হোল না দেখছি—এ হালে বাইরে ভদ্র-সমাজে কি করে যাই-বল্ ত মা ?

সাদা ফ্ল্যানেলের এই নরম জামাটি যে বাপের কত প্রিয়, মায়ার তা অজানা নয় ; ইতিমধ্যেই জামাটি নিয়ে সে নিপুণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল, রিপু-কর্ম্মের দ্বারা কোন রকমে ব্যবহারে আনা যায় কি না ! সোৎসাহে বলল : এ-বেলা না বেরুলেই কি নয় বাবা, রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে আমি স্চ নিয়ে বসবো, অন্ততঃ দু'চার দিন যাতে গায়ে দিতে পারা যায় সে ব্যবস্থা করে দোব।

পীতাম্বর প্রসন্ন মনে বললেন : পারবি মা, তাহলে তাই করিস্—এ-বেলা আর নাই বা গেলাম, বিকেলের দিকেই বেরুবো।

হঠাৎ বাইরে থেকে পরিচিত স্বর ঘরের দু'টি প্রাণীকে বুঝি চমৎকৃত করল : কোথায় গো অধিকারী, বাড়ী আছ না কি ?

বিস্ময়োল্লাসে মায়া বলে উঠল: কাকাবাবু এসেছেন বাবা—কি ভাগ্যি!

পীতাম্বরের মুখখানাও হর্ষোৎফুল্ল হয়ে উঠেছে, উচ্ছ্বসিত স্বর যত দূর সম্ভব চেপে বললেন: তোকে বলতে ভুলে গিয়েছিনু রে, কাল বিকেলে বাজারের পথে যাদব রায়ের সাথে দেখা, একেবারে মুখোমুখি যাকে বলে আর কি! তো'র মুখ চেয়ে সব অভিমান ভুলে গেলাম—জানিস্ মা, তার হাত ধরে বললুম—যা হবার হয়ে গেছে, ক্ষ্যামা-ঘেন্নাকরে ঝগড়াটা মিটিয়ে ফেল ভায়া—এ হচ্ছে তারই ফল, মা মহামায়া মুখ তুলে চেয়েছেন দেখছি!

পুনরায় স্বর শোনা গেল: কই গো অধিকারী, সাড়া পাচ্ছি না যে!

দ্বারের দিকে এগিয়ে গিয়ে জোর-গলায় পীতাম্বর সাড়া দিলেন: যাচ্ছি ভায়া যাচ্ছি,—বোস, বোস—শুনতে পেয়েছি, সত্যিই আমার পরম ভাগ্যি!

বলতে বলতে ব্যস্ত ভাবে ছুটলেন এবং এরই মধ্যে মুখখানা ফিরিয়ে কন্যাকে জানালেন: শীগ্গির তামাকটা সেজে, আর আমনি হুঁকোর জলটা বদলে নিয়ে আয় মা চণ্ডীমণ্ডপে।

ঘরের দেওয়ালে কালীর ছবিটির উদ্দেশ্যে হাত দু'টি যোড় করে মায়া অম্নি প্রণতি জানালে, সেই সঙ্গে কি প্রার্থনা করলে সে-ই জানে!

বাইরের চণ্ডীমণ্ডপের দাওয়ায় একখানি মাদুরে দুই প্রবীণ পাশাপাশি বসেছেন। অনেক দিন পরে আবার দু'জনের অন্তর-দ্বার উদ্ঘাটিত হয়েছে, সুখ-দুঃখের কত কথাই চলেছে!

যাদব রায় বলেন তাঁর সংসারের কথা—এক পাল পোষ্য, কি খরচটাই না করতে হয়: ওদিকে পাওনা-গণ্ডা আদায় হয় না—প্রত্যেকেই হয় অকাল, নয় ত অসুখ-বিসুখের ওজর দেখিয়ে যেন মাথা কিনতে চায়।

পীতাম্বর মন্তব্য করেন: সবই মহামায়ার ইচ্ছা ভায়া, কপালে যা লেখা আছে তার খণ্ডন নেই, নৈলে উপযুক্ত দু-দু'টো ছেলে থাকতে আজ আমাকে উপায়ের সন্ধানে ছুটোছুটি করতে হবেই বা কেন, আর এত বড় আইবুড়ো মেয়েকে দু'শো টাকা পণের জন্যে ফেলে রাখতে হবে কেন? তবে, এও সার বুঝি—যা কিছু করেন উনি সবই মঙ্গলের জন্যেই! তাই আর ভাবি নে।

এই সময় মায়া তামাক সেজে হুঁকার মাথায় বসিয়ে কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে বাইরের ঘরে এল। হুঁকাটি বাপের হাতে দিয়ে হেঁট হয়ে গড় করল যাদব রায়ের পায়ে; অনেক দিন পরে দেখা, শ্রদ্ধা-নিবেদন না করলে ভাল দেখায় না। তার পর বাপকেও গড় করে মুখখানা নীচু করে দাঁড়াল।

যাদব রায় সহাস্যে আশীর্ব্বাদ করলেন: চিরসুখী হও মা, কবে আমার সংসার আলো করবে সে আশায় আমি দিন গণছি যে!

মুখখানা আরক্ত করে চলে গেল মায়া। মনে পড়ল তার মাস দুই আগে এমনি এক সকালে এই শ্রদ্ধাভাজনটির মুখ দিয়েই কি নিষ্ঠুর কথা-গুলি বেরিয়েছিল তাকে লক্ষ্য করে।

যাদব রায় বললেন: জানো অধিকারী, আমাদের এই মনকষাকষির ব্যাপারে একটা নির্ঘাত সত্যি কিন্তু খোলসা হয়ে গেছে।

পীতাম্বর বললেন: কি শুনি?

যাদব রায়: আমার কি ধারণা ছিল জান, গিন্নী বুঝি মৃগকে মোটেই দেখতে পারেন না, আর এ বিয়েতে তার মোটেই মত নেই। কিন্তু সে ধারণা প্যালটে গিয়েছে।

পীতাম্বর: কিসে?

যাদব রায় : সেদিন চটাচটি হবার পর আমি ত একবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসি—তোমার ঘরে কাজ কিছুতেই করব না। কিন্তু গিন্নী শুনে কি বললেন জানো ভায়া ? বললেন—অধিকারীকে আমি চিনি, মানুষটি রগচটা হলে কি হয়, মনটি ও'র গঙ্গাজলের মত শুদ্ধ। তাঁর সঙ্গে কাজ করলে তোমার মনও শুদ্ধ হয়ে যাবে।

পীতাম্বর : তিনি বাড়িয়ে বলেছেন ভায়া, হ্যাঁ—তবে যে রাগের চোটে নিজের পায়েই আমি কুড়ুলের কোপ বসাতেও দৃক্‌পাত করি নে, সে কথা তিনি ঠিকই বলেছেন।

যাদব রায় : আরো কি বলেছেন শোন না বলি হে ! ঝাঁঝিয়ে বললেন আমাকে—ছেলেকে তুমি শুধু ভালবাসতেই শিখেছ, কিন্তু তার মনটিকে চিনতে পারোনি, চেষ্টাও করোনি। তাঁর এই কথা থেকেই বুঝছি ভায়া, সত্যিই তিনি মৃগকে ভালবাসেন আর সে ভালবাসা লোক-দেখানো নয়—অাঁতের ! এখন মনে ভরসাও পাওয়া গেছে—আমার বাড়ীতে গেলে তোমার মেয়ের অযতন হবে না।

পীতাম্বর : সে আমি ভাল করেই জানি ভায়া ! আর আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে নেই, 'আসছে মাঘেই যাতে দু' হাত ওদের এক হয়—সেই চেষ্টাতেই আছি।

তুমি যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকনি সে আমি জানি। আমারো ইচ্ছে আসছে মাঘেই কাজ হয়ে যায়।—এইভাবে ইচ্ছাটি ব্যক্ত করে যাদব রায় সে-দিনের মত বিদায় নিলেন। পীতাম্বর আপন মনে বললেন : মা ইচ্ছাময়ী তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে !

পীতাম্বরের বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাদব রায় বাজারের দিকে চললেন। উদ্দেশ্য, একটু বেলায় বাজারে গেলে জিনিষপত্রগুলো অপেক্ষাকৃত সুবিধায়

মেলে। তাছাড়া, এমন কয় জন খাতক আছে গা-ঢাকা দিয়ে বেড়ানো যাদের অভ্যাস—বাজারে কিন্তু তাদের ঠিক ধরা যায়।

বাজারের পথেই হঠাৎ গোকুলের সঙ্গে দেখা। তার গায়ে গরম জামা, ডান হাতে এক চ্যাংড়া খাবার, বাঁ হাতে মস্ত এক শোল মাছ। যাদব রায় গোকুলকে বললেন: বেশ আছ বাবাজী, তোমার বাপের হাল দেখে এলুম, তোমারও দেখছি। বেশ, বেশ।

মুখ ও চোখের এমন এক অদ্ভুত ভঙ্গি করে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথাগুলো তিনি বললেন যে গোকুল নির্ব্বাক্-দৃষ্টিতে শুধু চেয়েই রইল তাঁর পানে। ভেবে স্থির করতে পারল না সে হঠাৎ তার বৃদ্ধ বাপের প্রতি যাদব রায় এত দরদী হলেন কেন? বাড়ীতে এসে চালা-ঘরে উঁকি দিয়ে বাপকে দেখেই গোকুল যাদব রায়ের কথাটা বুঝলো। বাপের গায়ে ছেঁড়া একটা গেঞ্জি, মায়ার গায়ে জামাও নেই—আঁচল সম্বল। স্ত্রীকে ডেকে গোকুল বলল: মাছটা কেটে তিন ভাগ কর, তিন ঘরের। চ্যাংড়ায় মোয়া আছে ১২টা, ৪টে করে ভাগে পড়বে।

এ ঘরে মায়া বাপকে বলছিল: বড়দা মস্ত একটা শোল মাছ নিয়ে এল বাবা, এত বড় মাছ কখনো দেখিনি।

পীতাম্বর গম্ভীর হয়ে বললেন: গোকলো যে শোল মাছের ডান্‌লা বড্‌ডো ভাল্‌বাসে!

এমন সময় গোকুল এল বাপের ঘরে। গায়ের জামাটা খুলে ভাঁজ করে এনে বলল: এটা গায়ে দিয়ে দেখ ত ঠিক হয় কি না। ও-ঘরে যা ত মায়া, নতুন গুড়ের মোয়া এনেছি, বাবার জন্যে আর তোর জন্যে রাখা আছে নিয়ে আয়। তোর বৌদি মাছ কুটছে, হাত জোড়া।

পীতাম্বর তামাক খাচ্ছিলেন, গোকুল হাত থেকে হুঁকোটি নিয়ে রেখে

নিজেই জামাটি বাপের গায়ে পরিয়ে দিলে। জামা গায়ে দিয়ে বৃদ্ধ তৃপ্তির স্বরে বললেন : আঃ, চড়াতেই গাটা যেন গরম হল রে!

বাপের তৃপ্তিতে পরম তৃপ্তি পেয়ে গোকুল চলে গেল।

মোয়া নিয়ে মায়া এলো। পীতাম্বরকে দিতে গেলে তিনি বললেন : খাব'খন মা,—দেখ দেখিনি কেমন মানিয়েছে। ছেলে না হলে বাপের কষ্ট বোঝে এমন করে— কেমন হয়েছে রে?

মায়া বলল : একটু ঢিলে হয়েছে বাবা!

ঠিক বলেছিস্ রে—ঢিলেই একটু হয়েছে! দাঁড়া, ঠিক করে আনছি। বলেই পীতাম্বর জামাটি নিয়ে চলে গেলেন।

অতুলের ঘরে তখন মনসা-মঙ্গলের আখড়া বসেছে—পীতাম্বরকে ঘরে ঢুকতে দেখে সবাই অবাক। পীতাম্বর বললেন : এই তোদের গান, আগা গোড়াই বেসুরো। কথায় আছে না—'যত সব নাড়াবুনে সবাই হ'ল কীর্তনে, কাস্তে ভেঙে গড়ালে করতাল।' তোদেরও হয়েছে তাই। দিন-রাত বেসুরো গান আর বাজনা শুনে শুনে কান যেন ঝালাপালা! বেরো সব—

বেগতিক দেখে দলের সকলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল, যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

অতুল পীতম্বরের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে গায়ের রাগ গায়েই মেখে বলল : বড়দার গায়ের জামা দেখছি যে! তোমাকে দিয়েছে বুঝি, তাই আজ অত ঝাঁঝ? তবুও যদি গায়ে ঠিক হোত—

পীতাম্বর : একটু ঢিলে হয়েছে নয় রে? হ'ত না, ভাবনায়-চিন্তায় আধখানা হয়ে গেছি যে! তোর ত আর ভাবনা-চিন্তা নেই! দেখ্ ত, তোর গায়ে এটা ঠিক লাগে কি না—

মুখখানা ভার করে অতুল বলল : আমার দরকার নেই।

পীতাম্বর বললেন : দরকার আছে কি না সে আমি বুঝি রে, আমি যে বাপ। আমার ত একটা ছেঁড়া গেঞ্জি আছে, তোর যে তাও নেই। এই নে, গায়ে চড়া—দেখি তোর গায়ে ঠিক বসে কি না—

এক রকম জোর করেই অতুলের গায়ে কোটটা পরিয়ে দিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখে পীতাম্বর বললেন : বা, খাসা গায়ে বসেছে।

অতুল বলল : সত্যি, ঠিক যেন গায়ের মাপ নিয়ে তৈরী করেছে। যাক্‌, হোল তো ··

পীতাম্বর : ও কি, খুলছিস্ যে ?

অতুল : খুলব না ? তোমাকে দিয়েছে দাদা, তুমি ত গায়ে দেবে !

পীতাম্বর : না, না, তুই গায়ে দে—

অতুল : সে কি, তোমাকে দিলে—

পীতাম্বর : আমি আবার তোকে দিলুম। নিজে গায়ে দিয়ে যেটুকু আরাম পেয়েছিলুম, এখন তোর গায়ে দেখে তার চেয়ে কত বেশী আরাম যে পাচ্ছি, সে বলবার নয় রে—বলবার নয় ! আগে ছেলে হোক, তখন বুঝবি—

বলতে বলতে ঘর থেকে চলে গেলেন পীতাম্বর।

১৫

গায়ে একখানি আলোয়ান জড়িয়ে মায়া বাপের জন্যে মোয়া দু'টি একখানি রেকাবিতে রেখে, নিজের ভাগের দু'টি নিয়ে মনে মনে কি ভাবছে, এমন সময় জানালার গরাদের ওপর মুখ রেখে মৃগেন চাপা-গলায় 'টু' দিল।

মায়া বলল : ছেলের যে আজ ভারি ফুর্তি।

মৃগেন উত্তর দিল : বাবা যে শাসন তুলে নিয়েছে তা বুঝি জান না, এই-মাত্র পথে দেখা, ডেকে বললেন—ওদের সঙ্গে ঝগড়া মিটে গেছে, রাগের মাথায় অনেক কিছু বলেছিলুম, কিছু মনে করিস্‌নি বাবা! তা, গায়ে কার চাদর জড়িয়েছ আজ? তোমার ফুর্তিও কম নয়—

হাসিমুখে মায়া বলল : তা বুঝি জান না, বড়দা আজ যেন দাতাকর্ণ হয়েছেন! নতুন দামী জামাটা বাবাকে দিলেন, আর এই র‍্যাপারখানা আমার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন—তুই এটা গায়ে দিস্‌ বোন!

বাইরে থেকে পীতাম্বর ডাকলেন : মায়া, ওরে মায়া,—

মৃগেন অদৃশ্য হোল। পীতাম্বরকে দেখেই মায়া বলে উঠল : খালি গায়ে যে বাবা, জামা কি করলে?

পীতাম্বর : বল দিকিনি কি করলুম?

মায়া : বড়দাকে ফিরিয়ে দিয়ে এলে ত?

পীতাম্বর : এই ত নয়—

মায়া : দর্জির দোকানে দিয়ে এলে বুঝি?

পীতাম্বর : দূর পাগলী।

বাবা, বাবা!—অতুল এল ছুটে, তার হাতে ফ্লানেলের একটি কামিজ, ঘরে ঢুকেই সে বলল : দেখ দিকিন দাদার কি কাণ্ড! এই ফ্লানেলের জামাটা আমার জন্যে দিয়েছে! আমি দেখলুম, তোমার গায়েই এটা ঠিক হবে, যেমন হাল্কা তেমনি গরম। এসো পরিয়ে দিই—

অতুলের গায়ে বড়দার দেওয়া কোটটি দেখেই মায়া বলে উঠল : তাই বলো, জামাটা ছুটে ছোড়দাকে দিতে গিয়েছিলে?

পীতাম্বর : তাতেই ত শীত ভেঙে গেছে মা?

অতুল জামাটা পীতাম্বরের গায়ে পরিয়ে দিয়ে বলল : দেখ দিকি কেমন মানিয়েছে ?

সোল্লাসে মায়াও বলে উঠল : আর আমার দিকে চেয়ে দেখ ছোড়দা।

অতুল বলল : তাই ত রে, র‍্যাপারখানা গায়ে দিয়ে দিব্যি তোকে মানিয়েছে ত ! এখন তাহলে বলি—সেদিন কানাই বলছিল, আমার সাধ করে—মায়ার তরে একখানা গায়ের চাদর কিনে এনে দিই—

পীতাম্বরের রক্ত আবার গরম হয়ে উঠল কথাটা শুনেই। ধমক দিয়ে বললেন : কি, কি, আর তুই তাই শুনলি হারামজাদা ?

অতুল : কেন, দোষটা কি হোল ?

পীতাম্বর : কেন, দোষটা কি হোল ? হ্যাকা ! বুঝতে পারনি ! পরের ছেলে সে—আমার ঘরের মেয়েকে গায়ের কাপড় দেবে সে কোন্ হিসেবে ? সে হারামজাদা অতি পাজি, অতি ইতর, অতি নচ্ছার—'

অতুল : খবরদার বলছি বাবা ! কানাইকে কিছু বললে আমি সইতে পারব না—সে ছিল বলেই বেঁচে আছি।

পীতাম্বর : ও বাঁচার চেয়ে মরাই তোর ভাল ছিল—বেরো তুই আমার ঘর থেকে, তোর আমি মুখদর্শনও করতে চাইনি—বেরো বলছি—বেরো এখুনি।

অতুল : বেশ এই চললুম—আমিও তোমার মুখ দেখতে চাইনে। বলেই সে সদর্পে পা ফেলে চলে গেল :

পীতাম্বর : হারামজাদা—পাজী—ইতর—বেহায়া—

মায়া : থাম না বাবা, কেন মিছামিছি মাথা গরম করছ—বস্ এখানে, ঠাণ্ডা হও। একটু কিছু হলেই তুমি যেন আগুন হয়ে ওঠো—

পীতাম্বর : ঠিক বলেছিস্ রে, এটা আমার ব্যাধি। ইজ্জতে ঘা কেউ

দিলে সইতে পারি নে। না:, এখন থেকে আর রাগবো না, মাথা গরম করবো না।

মায়া এই সময় রেকাবিতে রাখা মোয়া ক'টি পীতাম্বরের সামনে এগিয়ে দিতেই তিনি বললেন : ও কি রে ?

মায়া : বড়দা মোয়া দিয়েছে বললুম মা, দু'টো খাও না বাবা !

পীতাম্বর : তোর কই ?

মায়া যেন চঙ্‌মঙ্‌ করছিল। ইতিমধ্যেই জানালার গরাদে প্রতীক্ষমান মৃগেনের মুখখানা কয়েকবার তার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করেছে। সে দিকে মনটাও পড়েছিল তার। নিজের ভাগের মোয়া দু'টি পীতাম্বরকে দেখিয়ে সে বলল : এই যে বাবা ! রান্নাঘরে যাচ্ছি, সেখানে বসে খাবো, তুমি খেয়ে নাও—এই জল রইল।

১৬

প্রসাদী অতুলকে মুখ-ঝাপটা দিয়ে বলল : কেমন হোল ত, আহ্লাদে আটখানা হয়ে বাপের কাছে গিয়েছিলে, বাপ মুখের মতন জুতো দিলে ত—

অতুল বলল : আর ও-মুখো হচ্ছি নে, কারুর কথায় থাকছি নে।

এর পর কানাই আসে, মন্ত্রণা বসে। সেই দিনই কানাই নতুন জামা কিনে এনে অতুলকে দেয়। গোকুলের জামা ফিরিয়ে দিয়ে আসে প্রসাদী।

এর পর গোকুলের ঘর থেকে কোন কিছু দিতে গেলেই প্রসাদী ফিরিয়ে দেয়।

পীতাম্বর বলেন : এই কানাই আর ছোট বউ অতলোর মাথা খাচ্ছে—সর্ব্বনাশ না করে ছাড়বে না।

কে ও কী

পীতাম্বর ঠিক করলেন তাঁর যে দু' বিঘে লাখরাজ আছে তাই বন্ধক দিয়ে মায়ার বিয়ে দেবেন মৃগেনের সঙ্গে। কথাটা প্রসাদী আড়াল থেকে শোনে। অতুলের ঘরে আবার পরামর্শ বসে।

কানাই বিধবা মায়ের আদুরে ছেলে। মায়ের নাম সারদা। স্বভাবটি যেন মিছরির ছুরি—মুখে মধু পেটে বিষ।

কানাই আবদার ধরেছে মায়াকে না পেলে বিবাগী হবে। সারদাও পণ করে বসেছে—মায়াকে বউ করবেই, তা সে যেমন করেই হোক। শেষে সারদার দূর-সম্পর্কের এক ভাইয়ের হাত দিয়ে তাকে মহাজন সাজিয়ে দু' বিঘে জমি মায় ভদ্রাসন বন্ধক দেওয়ালে তলে তলে সারদা। টাকা সারদাই দিলে, কিন্তু অতুল, প্রসাদী ও কানাই ছাড়া মূল ব্যাপারটি আর কেউ জানলে না।

এদিকে সারদা প্রসাদীকে টিপে দিলে। রাতারাতি পীতাম্বরের ঘর থেকে সে টাকা চুরি হয়ে গেল। বাড়ীতে হুলস্থূল পড়ে গেল। গোকুল এ সময় মনিবের কাজে বাইরে গিয়েছিলো দিন কতকের জন্যে, সেই ফাঁকেই বন্ধকী ব্যাপারটা হয়ে যায়। বাড়ীতে হট্টগোল পড়েছে, পীতাম্বর মাথা চাপড়াচ্ছেন, সেই সময়—ক'দিন পরে বাড়ী ফিরল গোকুল। বাপের মুখে সব শুনে মুখখানা চূন করে সে বলল: আমাকে ছাপিয়ে এ কাজ কেন করলে বাবা! মায়ার বিয়ে কি আমার দায় নয়, আমি কি চুপ করে আছি? যাক্, টাকার শোক কোর না, জমি আমি ছাড়িয়ে দেব, বিয়েও আটকাবে না।

কিন্তু সেই দিনই গোকুল অসুখে পড়লো। যে অঞ্চলে গিয়েছিলো সেখান থেকেই সাংঘাতিক ম্যালেরিয়ার বিষ ভরে এনেছিল দেহে। একটি মাস ধরে যেন যমে-মানুষে টানাটানি চললো। করুণার গায়ের

গয়না গুলি বাঁধা পড়লো, পুঁজি-পাটা সব শেষ হয়ে গেল।...এমন বিপদে অতুল একেবারে নির্বিকার, উঁকি দিয়েও খবর নেয় না। বরং গোকুলের ব্যামোকে এদের সংকল্পসিদ্ধির সুলক্ষণ ভেবে খুসি হয়ে ওঠে। এই সময় মৃগেন যথাসাধ্য করে....ফলটা-আসটা আনে, ওষুধ-পত্রের ব্যবস্থা করে। যাদব রায়ের পয়সা থাকলে কি হবে, মৌখিক সহানুভূতি ছাড়া একটি পয়সাও উপুড়-হস্ত করে না। বাপকে লুকিয়ে মৃগেন যা কিছু করবার করে। মৃগেনের সেবাতেই সেরে ওঠে গোকুল।

পীতাম্বরও এখন বেকার। হাতে কোন কাজ নেই—সরস্বতী পূজোর মরশুম এখনো পড়েনি। এ সময় গোকুলের জন্যে কিছু না করতে পেরে তাঁর কষ্টের অন্ত নেই। বিপদের সময় এদের দু'টি সংসার এক হয়ে গিয়েছিল।

ঠিক্ এই সময় পীতাম্বরের কর্ম জীবনে আর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হোল। এক দালাল এসে পীতাম্বরের সঙ্গে প্রতিমা গড়ার এক চুক্তি করল। বিদেশে গিয়ে সরস্বতী প্রতিমা গড়তে হবে এখন থেকে। দালালটি শতাধিক প্রতিমার অর্ডার পেয়েছে। প্রতিমা গড়া এখন থেকে সুরু করলে সময়মত সব হয়ে যাবে। খরচ-খরচা বাদ যে লাভ হবে—দু'জনে ভাগ করে নেবে। পীতাম্বর হিসেব করে দেখলেন, তাঁর দেনা শোধ করে মায়ার বিয়ে হয়ে যাবে এ টাকায়। দালাল পীতাম্বরকে কিছু টাকা আগামও দিলে। গোকুলের ইচ্ছা নয় এ-বয়সে বাবা বাইরে যান। কিন্তু নিজের অবস্থা বুঝে বাধা দিতেও পারে না। বিশেষতঃ দালালটির দেওয়া আগাম ক'টি টাকা অভাবের সংসারে যেন সুধাবিন্দুর মতই পড়েছে। পীতাম্বর বিদায় নিয়ে—সকলকে সাবধানে থাকতে বলে বেরিয়ে পড়লেন একদিন দালালের সঙ্গে।

গোকুল সেরে উঠে পথ্য পেলে, উঠে বেড়াতেও সমর্থ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, জমিদার-সরকারে যে কাজ করতো, অসুখের পর সেটি গেল। চুপ করে বসে না থেকে কাজের সন্ধানে সে বেরুতে থাকে; দুর্ব্বল শরীর ভেঙ্গে পড়ে যেন।....

অতুলদের ঘরে মনসামঙ্গলের দল এখন খুব জেঁকে উঠেছে। প্রায়ই খাই-দাই চলে। কিন্তু এদিকে কারুর লক্ষ্য নেই। অতুলের মন এক একবার টন-টন করে ওঠে, কিন্তু প্রসাদীর ভয়ে কিছু করতে পারে না। সে এখন প্রসাদী ও সারদার হাতের যেন পুতুল।

হঠাৎ একদিন সারদা এ-ঘরে এসে উপস্থিত। গোকুলের অবস্থা ও সংসারের অভাবে একেবারে যেন ভেঙ্গে পড়লো। সমবেদনা জানিয়ে বললো, আমার দু'-দু'টো গাই বিইয়েছে, আধ সের করে দুধ দেব গোকুল ছেলের জন্যে। বাছাকে সারিয়ে তোলা দরকার, যে চেহারা হয়েছে!

সারদা খবর রেখেছিল—টাকা না পেয়ে গয়লা দুধের যোগান বন্ধ করেছে। অথচ ডাক্তারে বলেছে দুধ খাওয়া চাই-ই! করুণা দ্বিধায় পড়েছে বুঝে সারদা আর্ত্তি জানিয়ে বললো: বেশ ত, দেওয়া ত পালাচ্ছে না, সময় হলে না হয় দাম বলে যা ইচ্ছা হয় দিও, এখন ত ছেলে বাঁচুক।

এ অবস্থায় করুণা আর না বলতে পারে না। ফলে, রোজ সকালে সারদার বাড়ী থেকে দুধ আসে। কানাই নিজেই দুধ বয়ে আনে। এই সূত্রে ঘনিষ্ঠতাও একটু ঘন হয়ে ওঠে। দুধের সঙ্গে অভাবের সংসারে আরো অনেক কিছু আসে—মাছটা, ফলটা, ঘরের তৈরী ক্ষীরের ছাঁচ, নারকেল নাড়ু।

কানাই এগুলো এনে এমন দরদের সঙ্গে এক-একটা কাহিনী শুনিয়ে দেয় যে, করুণাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিতে হয়।...আমাদের খীড়কির পুকুরের কালবোস মাছ ভারি মিষ্টি, মা পাঠিয়ে দিয়েছেন গোকুলদার জন্য,...গাছপাকা পেঁপে এটা, মা কাক-পক্ষীর মুখ থেকে কত করে যে বাঁচিয়ে একে পাকিয়েছেন কি বলবো! আজ এটা সার্থক হোল।

এমনি এক একটা ইতিহাস শুনিয়ে জিনিসটি যখন উপহার দেয় কানাই মায়ের নাম করে—নিতে মন না সরলেও ভবিষ্যৎ ভেবে মুখ-বুজিয়েই ঘরে তুলতে হয় করুণাকে, আর গোকুলের কাছে ব্যাপারটা চেপেই রাখে। দুধটা রোজের, ফল-পাকুড়ও ওর সামিল....এমন করে ঠাড়ে-ঠোড়ে জানিয়ে দু'দিক বাঁচায় বুদ্ধি খেলিয়ে কথার প্যাঁচে। ফলে দিন পনেরর ভিতরেই কানাই ছোকরা এ-বাড়ীতেও তার একটা স্থান করে নিল

মৃগেন বেচারী ক্রমে ক্রমে যেন তফাতে সরে যেতে থাকে, আর কানাই যেন সবতাতেই ওপর-পড়া হয়ে চালাকী, চালবাজী আর মুখের তোড়ে মৃগেনের মতন ভালমানুষ লাজুক আর মুখচোরা ছেলেকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে। জানালার কাছেও এখন সব দিন মায়াকে দেখা যায় না—কানাইয়ের চোখ দুটো সর্বদা সে দিকে পড়ে থাকে! যখনই এ-বাড়ীতে আসে মৃগেন—দেখতে পায় করুণার ঘরে কানাই এসে জুটেছে, দিব্যি গল্প জমিয়েছে। পাশের ঘরে মায়ার সন্ধানে গিয়েও মায়ার সাথে নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বলবার ফুরসদ পায় না—একটা না একটা বাধা এসে পড়েই। অমনি যেন একটা ইসারা হয়ে যায়, প্রসাদী হোক, অতুল হোক, কানাই হোক, কেউ না কেউ কোন না কোন ছুতো ধরে পায়ে পায়ে আসে—যতক্ষণ মৃগেন থাকবে নড়বার

নাম-গন্ধও করে না। এইভাবে এদের দু'টির সংযোগে অন্তরায় ঘটে।

মৃগেন একদিন মায়াকে একা পেয়ে মৃদু হেসে বলল: কানাই যে দেখছি দানসাগর সুরু করেছে?

মুচকি হেসে মায়া উত্তর করল: যে রকম বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছে কানাইদা, শেষে আমাকে চীলের মতন ছোঁ মেরেই না নিয়ে যায়!

সেদিন একটা পাকা তাল পায় মৃগেন—অসময়ের ফল। পেয়েই সেটি করুণাকে দিয়ে বলে গেল—গোকুলদার অরুচির মুখে লাগবে ভালো।

কানাই চলে যাবার পরেই মৃগেনকে আসতে দেখে করুণা তাকে ডেকে বলল: কাল বিকেলে তালের বড়া করবো মৃগেন, এসো ভাই, লক্ষ্মীটি।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ের আগেই কানাই এসে হাজির, হাতে এক বাটি ক্ষীর আর এক ছড়া পাকা কলা। বললো: অসময়ে তালের বড়া হচ্ছে শুনলুম,....তাই বাড়ীর তৈরী ক্ষীরটুকু এনেছি বড় বৌদি, গোকুলদাকে দিও—বড়া ডুবিয়ে খাবে।

এ ক্ষেত্রে কানাইকে বড়া না খাইয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না। কাজেই মায়াকে ডেকে করুণা বললো: পীড়িখানা পেতে দে মায়া, কানাই গোটাকতক বড়া খেয়ে যাক্।

অপ্রসন্ন মনে মায়াকে আসন পেতে দিয়ে কানাইকে বড়া পরিবেশন করতে হোল বটে, কিন্তু মনটা তার উসখুস করছিল মৃগেনের জন্যে। আগে মৃগেনের জন্যে এক বাটি বড়া তুলে রেখে—কানাইয়ের সামনে বড়ার রেকাবীখানি রাখলো মায়া।

মৃগেন এদিন কি ভেবে একেবারে বাড়ীর ভিতরে না এসে জানালার দিকে এসে দাঁড়িয়েছিল মায়ার সঙ্গে চেখোচোখি হবার আশায়

মৃগেনের আসাটা কানাই লক্ষ্য করছিল। তাই, যেমন সে অভ্যাস মত জানালার গরাদের ওপর মুখখানা তুলেছে—কানাই অমনি খপ করে দু'টো গরম বড়া তুলে নিয়ে তার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারলে আর মুখ ভেংচে বললে: আমার চলেছে রাজভোগ, আর তোর বরাতে নবডঙ্কা—এই দু'টো নিয়েই পালা!

করুণার কথায় মায়া তখন আরও কতকগুলো বড়া নিয়ে আসছিল রান্নাঘর থেকে—দরজার কাছে আসতেই এই বিশ্রী দৃশ্যটা তার চোখে পড়লো, করুণাও লক্ষ্য করেছিল—সে তাড়াতাড়ি বলে উঠল: ঠাট্টা করছে ভাই তোমাকে, ভেতরে এসো।

অপমানাহত মৃগেন লক্ষ্য করল যে মায়াই বড়া পরিবেশন করতে আসছে কানাইকে—চোখোচোখি হতেই মুখখানা লাল করে জানালা থেকে নেমে তীরের বেগে ছুটে বেরিয়ে গেল সে। মায়াও তখনি হাতের বড়াশুদ্ধ পাত্রটি মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে ঘর থেকে ছুটে বেরুল খীড়কির পথ ধরে।

কানাই হকচকিয়ে বললো: হোল কি?....

করুণা মুখখানা শক্ত করে উত্তর দিল: আর কি হবে, তোমারি মনস্কামনা সিদ্ধ হোল! কিন্তু কাজটা কি ভালো করলে ভাই?

খীড়কির রাস্তায় এসে মায়া দেখলো, মৃগেন ছুটে বড় রাস্তায় পড়েছে। মায়া হাত নেড়ে ডাকলো—চেঁচাতে লাগলো: মৃগদা ফিরে এসো, মৃগদা চলে যেও না, ফেরো—কিন্তু মৃগেন আর ফিরলো না।

সেদিন অপরাহ্নে তাগাদা সেরে অত্যন্ত অপ্রসন্ন মনেই যাদব রায় বাড়ী ফিরছিলেন। অনেক দিন ছুটোছুটির পর তাঁর বাকিদার খাতক সত্য বাগ্‌দীকে যদিও তিনি আজ ধরতে পেরেছিলেন, কিন্তু তার ফলে

কে ও কী

যে বিরক্তিকর ব্যাপারটি ঘটে যায়, তাতে তার সঙ্গে দেখা না হওয়াই ভালো ছিল। সত্য তো হস্ত উপুড় করে নাই, উপরন্তু নেশার ঝোঁকে এমন কতকগুলি অশিষ্ট কথা শুনিয়ে দিয়েছে, যাদব রায়ের মত মানী লোকের পক্ষে সেটা নিতান্ত বেদনাদায়ক। কেমন করে এই দুর্বিনীত খাতকটিকে রীতিমত শিক্ষা দিবেন সেই চিন্তা করতে করতে যখন তিনি স্বগ্রামের পথে এসে পড়েছেন, সেই সময় কানাই কোথা থেকে ছুটে এসে একেবারে তাঁর সামনের পথটা আটকে উপুড় হয়ে পড়লো, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চটিজুতোর তলায় ডান হাতখানা চালিয়ে দিয়ে পরক্ষণে সেটা মাথায় ঘষে সোচ্ছ্বাসে বললো: আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম মেসো মামা, মান-মর্য্যাদা তো আর থাকে না!

হঠাৎ পথের মাঝে পায়ের উপর পড়ে কানাইয়ের এই ভাবোচ্ছ্বাসে যাদব রায়ের মত ঝানু লোকও বুঝি ভড়কে গেলেন। দু' পা পিছিয়ে চোখ দুটো কপালের দিকে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন: ব্যাপার কি বাবাজী, কি হয়েছে?

গলার স্বর দিব্য গাঢ় করে কানাই বললো: হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু—মুখে বলতেও যেন মাথা কাটা যাচ্ছে! আপনার ছেলে পাশ করলে কি হবে, ভারি বোকা আর হেবলা, তার উপর ঠাট্টা বোঝে না।

ছেলের কথা এভাবে তুলতে যাদব রায় একটু চটে গেলেন, চোখ দু'টো পাকিয়ে কানাইয়ের পানে চেয়ে বললেন: হয়েছে কি তাই বলনা বাপু, অত ভণিতার কি দরকার!

কানাই একটু গম্ভীর হয়ে বললো: গোকুলদার বাড়ীতে আজ বিকেলে বড়া ভাজা হচ্ছিল, গন্ধে গন্ধে মেগা তাদের রান্নাঘরের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই তাকে দেখতে পেয়ে গোকুল বাবুর বোন বড়া

হাতে করে—আয় তু তু করে ডাকে। তাতেই আপনার ছেলে চটে চলে আসে ; তাও বলি, বড়া যদি খাবার ইচ্ছেই তোর হয়েছিল, বাড়ীতে বললেই তো পারতিস্ এরকম করে মান খোয়ানো কি ভাল ?

মেয়ের বিয়ের কোনো ব্যবস্থা না করে পীতাম্বর বিদেশে যাওয়ায় যাদব রায় তাঁর উপর প্রসন্ন ছিলেন না, এখন ছেলের উপযাচকের মত ও বাড়ীতে যাওয়া, আর ও-পক্ষের এই নীচ ব্যবহার তাঁর অপ্রসন্ন চিত্তে রীতিমত জ্বালা ধরিয়ে দিলে। কানাইয়ের সামনেই ছেলের উদ্দেশে হুঙ্কার তুলে বলে উঠলেন : বটে, ডুবে ডুবে জল খাওয়া ? দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা—তোমার বড়া খেতে যাওয়া বা'র করছি—ছেলের নিকুচি করেছে।

মার-মুখী হয়ে যাদব রায় বাড়ীর দিকে ছুটলেন। কানাই সেখানে দাঁড়িয়ে হাসি চেপে সে দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগলো।

এ দিনের ব্যাপারে মৃগেন চরম আঘাত পেয়ে বাড়ী ফিরেছিল। ক'দিন থেকেই মন তার ভার হয়ে উঠেছিল—সে জেনেছে, দুনিয়ায় পয়সার মান সবার আগে। পয়সা আছে বলে অপদার্থ হয়েও কানাই ও-বাড়ীর সবার আদর পেয়েছে, মায়াও তাকে মেনে নিয়েছে। আর পয়সার অভাবেই তার এই লাঞ্ছনা—মায়ার সামনে, সবার সামনে কানাই তার অপমান করে।

নিজের ঘরে যখন সে আকাশ-পাতাল ভাবছে, সেই সময় যাদব রায় এসে দিলেন মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা! দুই চোখ পাকিয়ে মুখখানা বিকৃত করে বললেন : ভেবেছিস্ কি, মান ইজ্জত সব খুইয়ে বসেছিস্—

কুকুরের মত ঐ পুতুলওলার বাড়ীতে বড়া খেতে গিয়েছিলি হতভাগা। কেমন অপমান করেছে—বেরো আমার বাড়ী থেকে, এমন ছেলের মুখ দেখতে চাইনে আমি—

মৃগেনের দুর্ভাগ্য, এ-দিন বাড়ীতে তার বিমাতা ছিলেন না, বাপের বাড়ী গিয়েছেন তাঁর পীড়িতা মাকে দেখতে! পত্নীর সতর্কবাণী ভুলে যাদব রায় প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে এই প্রথম নিষ্ঠুর ভাবে তাড়না করলেন।

নীরবে সব শুনলো মৃগেন—একটি কথারও প্রতিবাদ করলো না, কিন্তু মনে মনে তার কর্তব্য স্থির করে নিল। রাতে কিছু খেলে না, খিল দিয়ে শুয়ে পড়লো ঘরে। ক্রুদ্ধ পিতার পক্ষ থেকেও কোন অনুরোধ এলো না!

গভীর রাতে বিশ্রী স্বপ্ন দেখলো সে·.....যেন ছুটে চলেছে সে, একা শুধু একা—আর পিছন থেকে ডাকছে তাকে একটী মেয়ে—যাকে কোনদিন দেখেনি সে।....ঘুম ভেঙ্গে যেতেই ধড়মড় করে উঠে বসল সে—দু'হাতে চোখ রগড়ে ভাবতে লাগলো স্বপ্নের কথা....স্বপ্নে দেখা মেয়েটির কথা....ভেবে সে ঠিক করতে পারলো না, মায়ার চেহারা অমন পালটে গেল কেন! সঙ্গে সঙ্গে মনে হোল এটা সুলক্ষণ, তাকে সব ছাড়তে হবে—সব ভুলতে হবে—মায়াকেও।

শোবার আগেই নিজের খাতাপত্র আর স্বল্প কাপড়-চোপড় গুছিয়ে রেখেছিল সে। জমিদার বাড়ীর পেটা ঘড়ি থেকে সেই সময় পর-পর চারটে বাজলো! বিছানা ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে পুঁটলিটি বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো সে বৈরাগ্যের পথে।

ঠিক সেই সময় বিশ্রী একটা স্বপ্ন দেখে মায়াও বিছানায় উঠে বসেছে। উঃ! কি খারাপ স্বপ্ন—যেন তার বিয়ে হচ্ছে; কিন্তু যতই তাকে ক'নে-

চন্দন পরাচ্ছে, চোখের অজস্র জলে মুছে যাচ্ছে সব ; বাইরে চালাঘরে বসে আছে কানাই, আর মৃগাঙ্ক ছুটে চলেছে রাস্তা ধরে—তাকে দেখতে পেয়ে মায়াও ছুটেছে তার পিছু-পিছু তাকে ধরবার জন্যে, কিন্তু পা মোটেই এগুচ্ছে না—কে যেন ধরে রেখেছে !

ছোট একটি শহর—নিমগাঁ ছোট হলেও জলপথে অনেকগুলি অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় বড়ো একটা ব্যাপারের জায়গা সেটা। সেইখানে পরেশ পাল এক প্রতিমা প্রতিষ্ঠান খুলে নূতন ধরণের ব্যবসার পত্তন করেছে। ছোট, মাঝারি, বড়—একানে, পরীওয়ালা নানারকমের প্রতিমা গড়ার কাজ চলেছে। আমাদের পীতাম্বর এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিল্পী, তারই নির্দেশ মত প্রতিমার কাজ চলেছে। দিবারাত্র খেটে চলেছে পীতাম্বর—প্রতিমার পর প্রতিমা গড়া হচ্ছে। পরেশ তুখোড় লোক, দিনের বেলায় নিজে আর হাত ধরা নিষ্কর্মা দু'-চার জনকে নিয়ে কাঠামোগুলি বাঁধে, মাটি লাগায়—কিন্তু সবতাতেই পীতাম্বরকে নির্দেশ দিতে হয়। কেননা দেবী-প্রতিমার কোনরকম কারসাজী বা ফাঁকি তার কাছে হবার জো নাই। পরেশ বেগার ধরেই কাজ সারতে চায়, চা'টা, তামাকটা, গাঁজাটা-আসটা খাইয়েই তাদের খাটিয়ে নেয়।

সন্ধ্যার পর কর্মশালায় থাকে শুধু পীতাম্বর আর পরেশ। সে তখন গাঁজা টিপতে বসে, পীতাম্বরকে প্রায়ই বলে : চলবে নাকি অধিকারী, যার মূর্তি গড়ছো, ওঁর বাপের বড় সখের জিনিষ এই বড় তামাক, খেলে মাথা আরও খুলবে ঠাকুর !

পীতাম্বর তার হুঁকা-কলকে দেখিয়ে বলে : বেঁচে থাক আমার গুড়ুক, এতেই আমার মাথা খুব খোলে পালের পো!

তারপর অনেক কথাও হয়। পরেশ ক্রমাগত উৎসাহ দেয়—পীতাম্বর তুলি চালাতে চালাতে ভাবে, কাজ উদ্ধার করে যেদিন বাড়ী যাবে সে—মজুরী বা দক্ষিণা মায়ের কৃপায় যা পাবে, তাতে সব আশাই তার মিটবে। আঃ, সে দিন কি সুখেরই হবে! আগেই জমিটা উদ্ধার করবে—না না ধুলো পায়ে গিয়ে ঐ চশমখোর যাদবের হাতে পণের টাকাটা তুলে দিয়েই বলবে—দেখলে ত মায়ের দয়া!....এমনি কত স্বপ্নই দেখে।

আবার পরেশ গাঁজায় টিপ দিতে দিতে ভাবে, কোন্ প্রতিমা কোন্ খদ্দেরকে ঝাড়বে আর ঐ বুড়ো অধিকারীকে রম্ভা দেখাবে কেমন করে! পরেশ পালকে ত চেনেননি ঠাকুর আগাম যে ক'টা টাকা দিয়েছি তাতেই বুক টন্ টন্ করছে·· আবার? আরে এ মেহনতের আবার দাম কি—ওঁকে দোব আধা আধা বখরা? ভাবলেও হাসি আসে। এমনি মনে মনে কত প্যাঁচই কষতে থাকে।

বৈরাগ্যের পথে বেরিয়ে মৃগেন ঘটনাচক্রে এমন এক গণ্ডগ্রামে এসে পড়লো—যেখানকার বাসিন্দারা কৃষিজীবী আর কারবারী। কারো গৃহে অভাব নেই, গ্রামখানি যেন আনন্দ আর শান্তির আশ্রম। গ্রামের যারা বনেদী মাতব্বর অধিবাসী, তাদের বিদ্যার দৌড় পাঠশালার গণ্ডীতেই আবদ্ধ। বর্তমানে গ্রামে এক পাঠশালা আছে, কিন্তু শিক্ষক নেই। মৃগেন একটা পাশ করেছে শুনে তারা ত তাকে দেবতার পর্য্যায়ে ফেললো, তার ওপরে সে যখন বর্ণগুরু ব্রাহ্মণ! ফলে, মৃগেনের আর বৈরাগ্য

হোল না, গ্রাম্য মাতব্বরদের পীড়াপীড়িতে গ্রামেই তাকে থাকতে হোল পাঠশালার ভার নিয়ে।

একটা চণ্ডীমণ্ডপে দিনের বেলায় পাঠশালা বসে, রাতে সেখানে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি পড়া হয়। একজন পড়ে, শুনতে পাড়াশুদ্ধ সবাই জড় হয় সেখানে। ক্রমে পড়ার ভার পড়লো মৃগেনের উপর। এখানে এসে মৃগেন খুব উৎসাহে তার লেখা পালাটির সংস্কার শুরু করে। মাষ্টার মশাই পালা বাঁধতে পারে—কথাটা ক্রমে জানাজানি হতে সবাই ধরে বসলো, আমরা যাত্রার আসরে বসে পালার গাওনাই শুনি, পালা পড়া ত শুনিনি কোন দিন, শোনাতে হবে মাষ্টার মশাই! মৃগেনও উৎসাহের সঙ্গে পালা পড়ে শোনায়—কিন্তু সেই সঙ্গে পালার খাতায় যেন ফুটে ওঠে তার আদি শ্রোত্রী মায়ার কৌতূহলোজ্জ্বল মুখখানি।

মৃগেনের আকস্মিক নিরুদ্দেশে গ্রামে হুলুস্থূল পড়ে গেছে। যাদব রায় একেবারে দমে গেছেন—মৃগেনের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে তাঁর পরলোকগতা স্ত্রী লক্ষ্মীর শোক যেন নূতন করে জেগে উঠেছে। নিজেই এ-বাড়ীতে এসে মায়াকে ডেকে বল্লেন: তোমার মৃগকে আমিই বনে পাঠিয়েছি মা—কানাইয়ের মুখে সে দিনের কথা শুনে রাগ সামলাতে পারিনি।

মায়া ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে—স্বপ্নের ছবি ফুটে ওঠে তার মনে।

করুণা এসে আসল কথাটা তখন শুনিয়ে দেয়। যাদব তখন কপালে করাঘাত করে চেঁচিয়ে বলেন: আমার মাথায় তোমরা একখানা থান ইঁট এনে মারো, আমি নিষ্কৃতি পাই।...

এই সময় কানাই এসে বলে: তার আগেই মেগা তোমার মাথায় থান ইট মেরে গেছে মামা, শুধু তোমার মাথায় নয়—গেরাম শুদ্ধ সবার মাথায়। আমার বড়মামা এইমাত্র এলেন কিনা, তাঁর মুখে শুনে এলুম—ইষ্টিশানে একটা খেমটাউলি ছুঁড়ির সঙ্গে মেগাকে তিনি দেখে এসেছেন।

মারমুখী হয়ে যাদব বলে ওঠেন: যত নষ্টের গোড়া ত তুই, যা নয় তাই বলে আমার কান ভাঙিয়েছিলি, এখন তার নামে এই কলঙ্ক দিচ্ছিস হারামজাদা, আমার মেগা যে গঙ্গাজলের মতন শুদ্ধ, একথা গ্রামশুদ্ধ সবাই জানে।

এই সময় আসরে এলেন কানাইয়ের মা সারদা। তিনি ছেলের পক্ষ নিয়ে ছ্যার ছ্যার করে যাদব রায়কে সহস্র কথা শুনিয়ে দিলেন: নিমুক্ষ চামার কোথাকার—কচি খোকা আর কি! কান-ভাঙানিতে ভোলেন —সংসারের যা সুখ সে ত জানতে বাকি নেই, আর ছেলে লোকের সামনে গোবেচারী, ওদিকে যে ডুবে ডুবে জল খেত সে খবর তো কেউ রাখেনি! আমার ভাই মিথ্যে বলবার লোক কি না—দশটা যাদব রায়কে কিনতে পারে সে!

এর পর গোকুল আসতে ঝগড়া থামলো; কিন্তু যাদবকে স্তব্ধ করে দিয়ে সারদা যেভাবে ওকালতি করলো, শুনে গোকুলকেও স্তম্ভিত হতে হলো।

মৃগেনের গৃহত্যাগের কিছু দিন পরে ডাকে মায়া একখানি চিঠি পায় সেই চিঠিখানি এখন তার চিন্তার খোরাক যোগায়। সবার অলক্ষ্যে সে চিঠিখানি পড়ে, তারপর এক টা-টিনের কৌটায় ভরে কুলুঙ্গির মধ্যে লুকিয়ে রাখে। চিঠিখানি খুব সংক্ষিপ্ত, বয়ান এই:—

"মায়া, দেখলুম সংসারে পয়সাই সবচেয়ে বড়ো, পয়সার জোরে কানাই তোমার ঘরে বসে বড়া খায়, আর—পয়সা নেই ব'লে আমাকে ঘরের কানাচ থেকে কুকুরের মতন ফিরে আসতে হয়! পয়সার জন্যেই কানাইয়ের মুখের মনসামঙ্গল গান কান পেতে সবাই শোনে, পয়সা নেই বলে আমার লেখার কোন কদরই নেই! তাই চলেছি একা একা এমন এক পথে—পয়সার বালাই যেখানে নেই।"

পড়তে পড়তে অশ্রুতে মায়ার চোখ ভরে ওঠে। আপন মনেই বলে: তবুও লোকে তোমার নামে অপবাদ দেয়, কলঙ্ক রটায়। এক একবার তার মনে হয়, চিঠিখানা দেখিয়ে সবার মুখ বন্ধ করে দেয়,—কিন্তু সে ইচ্ছা জোর করেই দমন করে আপন মনেই বলে: লোকের যা ইচ্ছা তাই বলুক, আমি ত জানি তুমি আমার খাঁটি সোনা।....

কিন্তু কানাই একদিন এই গোপন তথ্যটিও আবিষ্কার করে ফেললো; তারপর সুযোগ পেয়ে চুপি চুপি এসে কুলুঙ্গির কৌটাটি থেকে মৃগেনের চিঠিখানি বার করে নিয়ে তার ভিতরে নিজের একখানি চিঠি ভরে রাখলো। মায়ার উদ্দেশে অশুদ্ধ ভাষায় প্রেম-নিবেদন করেছিল সে ওই চিঠিতে।

সেদিন কৌটা খুলে পুরাতন খামের ভিতর থেকে নূতন পত্রখানি দেখেই শিউরে ওঠে মায়া, তারপর পত্রখানি পড়েই ব্যাপারটি বুঝতে পেরে, কোন গোল না করে চেপে গেল—কৌটাটি নিজের তোরঙ্গের ভিতরে লুকিয়ে রাখলো।

*

মৃগেন যে-গ্রামে জেঁকে বসেছে মাষ্টার এবং পাঠক হয়ে, বার্ষিক বারোয়ারীর ধুম পড়ে গেছে সেখানে। স্থির হয়েছে শহরের সেরা যাত্রা—বৌরাণীর দল তিন রাত্রি তিনটি পালা গাইবে। এই যাত্রা উপলক্ষে মৃগেনের অদৃষ্ট আর এক পথে গতি নিল।

বিখ্যাত দলের গাওনা ভাল হলেও পালার সুখ্যাতি কেউ করল না—আসরেই লোকে বলাবলি করলে: এর চেয়ে আমাদের ম্যাষ্টারের পালা অনেক ভালো।

দলের অধ্যক্ষ এই সূত্রে এরই মধ্যে অবসর করে নিয়ে মৃগেনের পালার কিছুটা শুনেই চমকে গেলেন। তারপর ভবিষ্যতের আশা দেখিয়ে মৃগেনকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইলেন মহকুমার সদরে যেখানে দলের মালিকের গদী। মৃগেনকে তিনি বললেন: মালিক নিজে শুনে পালা পছন্দ করেন। পালার জন্যেই তাঁদের দল মার খাচ্ছে। পালা যদি মনে ধরে, পছন্দ হয়—বরাত আপনার খুলে যাবে মৃগেনবাবু! তিনি মস্ত ধনী। যাত্রার দল তাঁর দশটা ব্যবসার একটা।

মৃগেন রাজি হয়ে সঙ্গে গেল।

* *

*

পীতাম্বরের কাজ অনেকটা এগিয়েছে। আটচালা জুড়ে সারি সারি প্রতিমাগুলির গায়ে সাদা রং-এর এক এক কোট পড়ায় চমৎকার বাহার খুলেছে। মুখগুলি এরি মধ্যে যেন হাসছে। এখনো রঙ পড়বে, মুখ-চোখের ওপর সূক্ষ্ম কারুকাজ হবে। তুলি চালাতে চালাতে পীতাম্বর বললো: য্যাদ্দিন পরে আজ বাড়ীতে চিঠি লিখে দিয়েছি পালের পো!

পরেশ বললো: বটে, তা কি লিখলে?

পীতাম্বর বললেন : লিখলুম, গোটা পঞ্চাশ টাকা আপাতত পাঠাচ্ছি, আর শ্রীপঞ্চমীর আগেই যাতে পাও তার ব্যবস্থা করছি। মায়ের পূজার পরেই হিসেব-পত্তর আদায় করে যত শীগ্‌গির পারি বাড়ী পৌঁছাচ্ছি। জমিও ছাড়াবো, মায়ার বিয়েও দোব। যাদব রায়কে বলবো যে, কথা আমি ভুলিনি, মরদকা বাত হাতীকা দাঁত—তুমি তাহলে গোটা ৫০ টাকা যোগাড় করে রেখো পালের পো—আসছে শনিবার মণিঅর্ডার করে দেব, তাহলেই শ্রীপঞ্চমীর আগে পৌঁছবে বাড়ীতে।

পরেশ পালের মুখখানা অমনি শক্ত হয়ে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে সে ভাব সামলে বললো : তা বেশ ত, আজই আমি তাগাদা দিচ্ছি। তোমার টাকা ত তোলাই আছে অধিকারী।

যাত্রাদলের অধ্যক্ষ বসন্ত রায় সব দিক্ দিয়েই বিচক্ষণ ও চৌখস লোক। মানুষ চরিয়ে মাথার চুল পাকিয়েছেন তিনি ; লোকে বলে মানুষ-চিনতে তাঁর মতন ওস্তাদ আর দু'টি নেই। বিভিন্ন প্রকৃতি ও বিভিন্ন বয়সের মানুষ নিয়ে যে কারবার চালাতে হয়, লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতার সংগে লোকের মতি-মর্জিকে মনের মতন করে ঘোরাবার-ফেরাবার ক্ষমতা না থাকলে এ কারবার চালানো কঠিন। মানুষ যেখানে পণ্যের সামিল—মানুষের মেধা ও মেজাজ ভাঙ্গিয়ে তহবিল ভরতি করতে হয়, সেখানে চেহারা দেখে আর মুখের কথা শুনে মানুষের ভেতরটা জানবার ক্ষমতা থাকলে তবেই এখানে ম্যানেজারী করা চলে। বিভিন্ন দল চালিয়ে বসন্ত রায় এ ব্যাপারে এমনি ঘুণ হয়েছেন যে, লোক চিনতে তাঁকে এতটুকু বেগ পেতে হয় না ; দলের প্রত্যেকের ধারণা, তিনি জ্যোতিষ জানেন।

এ ক্ষেত্রে অল্পবয়সী এক নূতন পালা-লিখিয়েকে পালাশুদ্ধ সদরের গদীতে আদর করে নিয়ে আসায় দলের মধ্যে একটা কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠলো।

অল্পবয়সী হোলে কি হয়, মৃগেন ছেলেটির পালা বাঁধবার কায়দা আর দৃশ্যগুলি সাজাবার কৌশল দেখে বসন্ত রায় চমকে গিয়েছিলেন। ছেলেটিকে দু-চারিটি কথা জিজ্ঞাসা করে যে জবাব পান তাতে খুসিতে মনটি তাঁর ভরে ওঠে, সেই সঙ্গে তার সুন্দর মুখখানার ভঙ্গি আর বড়ো বড়ো টানা-টানা দুটো চোখের দৃষ্টিতে মুগ্ধ হয়ে স্নিগ্ধ স্বরে বলেন: ছেলেবেলা থেকে লেখার কসরৎ করে আসছেন, আর মন দিয়ে বড়ো বড়ো দলের পালা শুনেছেন বলেই এরকম লিখতে পেরেছেন। আমি বলছি, আপনাকে আর মাষ্টারী করতে হবে না, বরাত আপনার খুলে গেছে।

মনের আনন্দ সবলে চেপে মৃগেন জিজ্ঞাসা করে: আচ্ছা, আমার পালা যদি পছন্দ হয়, আমি দক্ষিণা কি রকম পাব?

মুখখানির একটি বিশিষ্ট ভঙ্গি করে বসন্ত রায় উত্তর দেন: আরে মশাই, পালা যদি মালিকের মনে লাগে, আপনার ত পাথরে পাঁচ কীল, আপনাকে তখন পায় কে?

কৌতূহল দমন করা মৃগেনের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে, একটু হেসে মুখখানা তুলে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করে: তবু জানতে ইচ্ছা করে—পালা প্রতি ওঁরা কি দেন?

বসন্ত রায় সহজ কণ্ঠে বলেন: নগদা-নগদি পালা কেনবার রেওয়াজ ত আমাদের দলে নেই, তাই এখনই দাম বলা যায় না; আমাদের দল খোলা ইস্তক পালা যিনি দলের জন্য লিখতেন, বছর শালিয়ানা থোক-থাক

একটা মোটা টাকা তাঁর জন্যে বরাদ্দ ছিল। তিনি আমাদের দলের বাঁধা 'অথার' ছিলেন কি না!

—তা বছর শালিয়ানা কি তিনি পেতেন?

—শুধু আমাদের দলে পালা দেবেন এই সর্তে যেদিন তিনি বাঁধা 'অথার' হলেন, সেই দিনই ত মালিক তাঁকে হাজার টাকা আগাম দিলেন, তার পর বছর শালিয়ানা দেড় হাজার টাকা বরাদ্দ ত তাঁর ছিলই, উপরন্তু কত রকমে কত টাকাই কামাতেন। তা ছাড়া, গাওনার দিন আসরে এলে 'মান' বলে আমাদের মালিক যা দিতেন—

—'মান'? সে আবার কি?

—জানেন না বুঝি? যাঁর লেখা পালা খোলা হবে, তিনি যদি গাওনার দিন আসরে এসে বসেন, তাঁর খাতির রাখবার জন্যে একটা নজরাণা দেবার রেওয়াজ আছে, একেই আমরা 'মান' বলি। এই মানের দরুণ যে কতো নগদ টাকা, তার ওপর শাল-দোশালা, বেনারসী জোড়, ঘড়ি,—এমনি কতো কি পেয়েছেন, তার কথা আর কি বলবো! এসব ব্যাপারে আমাদের মালিকের নজরও তেমনি উঁচু। আগে যিনি পালা লিখতেন, এঁর দৌলতে ত দেশে তিনি জমিদারী করে গেছেন। আপনার পালা যদি তাঁর মনে ধরে, আর তাঁর নজরে পড়ে যান, বরাত আপনার ফিরে যাবে বলে রাখলুম।

—পালা কি তাহলে তিনি নিজেই শুনে পছন্দ করেন?

—হ্যাঁ। তাঁর সামনেই পালা পড়া হয়, লেখকই পড়েন; আর দলের যাঁরা মাথাওয়ালা—তাঁরা সেখানে হাজির থাকেন। ভালো পালার অভাবে দল মার খাচ্ছে বলে আমাদের মালিকের চোখে ঘুম নেই বললেই চলে। নৈলে এত আদর করে আপনাকে নিয়ে চলেছি মশাই! এখন আপনার বরাত, আর আমার হাত-যশ!

পালা-প্রসঙ্গে পালা-রচয়িতার শুভাদৃষ্টের আভাস পেয়ে মৃগেন্দ্রর চোখ দুটো চক-চক করে ওঠে; মনে মনে ভাবতে থাকে—মালিকের পছন্দ হলে আমার অদৃষ্টও ত তাহলে—কিন্তু কি যেনো কি একটা ধাক্কা খেয়ে সে চিন্তা তখনি ভেঙ্গে যায়; সংগে সংগে চমকে উঠে সে বলে: আচ্ছা, একটা কথা তাহলে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদের দল ত বউরাণীর নামেই চলেছে, তিনিই সত্যিকার মালিক, না নামটা....পরের কথাগুলি মৃগেনের মুখে যেন আটকে যায়।

মৃদু হেসে রায় মশাই বলেন: আপনার কথা বুঝেছি, বউরাণীর নামটা নিয়ে অনেকেই এমনি একটা সন্দেহ করে থাকেন; তাদের ধারণা—বউরাণী নামটা ভুয়ো—ও নামের কেউ নেই। কিন্তু আপনি নিজের চোখেই তাঁকে দেখতে পাবেন, আর তাঁর ব্যবহারে সত্যিই মুগ্ধ হবেন।

মৃগেনের কৌতূহল আরো জাগ্রত হয়ে ওঠে, বউরাণীর বৃত্তান্ত জানবার জন্যে মনটা উসখুস্ করে। অনেক দিন থেকেই নামটি শুনে আসছে, বাঙালীর মেয়ে একটা যাত্রার দল চালাচ্ছেন—একথা শুনেই যেন মনে চমক লাগে, তাই তাঁর সম্বন্ধে লোকে নানারকম কথা রটিয়ে থাকে, কেউ বলে, তিনি খুব বড়লোকের বউ, স্বামীর সংগে ঝগড়া করে যাত্রার দল করেছেন। কারুর মতে যাত্রাদলের কোন কলাবিদের প্ররোচনায় পড়ে কুলত্যাগ করে তিনি এই দল খুলেচেন। আবার অনেকের অনুমান, নামটা ভুয়ো—এই চটকদার নামটা দিয়ে কোন তুখড় লোক এই দল চালাচ্ছে। সুতরাং মৃগেনের মনে এই মেয়েটির সঠিক বৃত্তান্ত জানবার আগ্রহ স্বাভাবিক। সে তখন সবিনয়ে বলে ফেলল: দেখুন, ওঁর সম্বন্ধে অনেক রকম কথাই আমরা শুনিছি, তাই জানতে ইচ্ছা

হয়—বাঙালী-ঘরের বউ হয়ে যাত্রার দল খোলবার সখ ওঁর কেন হয়েছিল ?

রায় মশায় একটু থেমে মনে মনে কি যেন ভেবে নিয়ে তখন বলতে থাকেন : কথা কি জানেন, বাঙালীর মেয়ে পুরুষালী কোন কার-কারবার করলেই লোক চমকে যায়, তাঁর সম্বন্ধে নানা রকম কথা রটিয়ে আমোদ পায়, কিন্তু আমাদের বউরাণীমা নিজে সখ করে এ কারবার করেন নি—তাঁর স্বামীর কথাতেই এ কারবারে তাঁকে মাথা দিতে হয়েছে। নৈলে যাত্রার-দল খুলে পয়সা উপার্জন করবার কোন প্রয়োজনই তাঁর ছিল না, পয়সার তাঁর অভাব নেই।

মৃগেনের মুখে ও চোখে বিস্ময়ের ভাব ফুটে ওঠে, নির্বাক দৃষ্টিতে রায় মশায়ের চোখের পানে চেয়ে থাকে সে, রায় মশাই বলে যান : বউরাণীর স্বামী ছিলেন মস্ত বড়লোক, লোকে তাঁকে রাজাবাবু বলেই জানতো। জেলায় জেলায় তাঁর জমিদারী, পাঁচ-সাতটা কোলিয়ারী, দেশ-জোড়া রাজাবাবুর নাম। নানা অঞ্চলের বড় বড় মিল, ব্যাংক, সদাগরী আফিসের শেয়ার তিনি অনেক কিনেছিলেন ; স্বনামে বেনামে অনেক কারবারও ফেঁদেছিলেন, তার মধ্যে এই যাত্রার দলটিও তাঁর এক কীর্তি। স্ত্রী বউরাণীর নামেই দলটি তিনি খুলেছিলেন যান, আর মৃত্যুকালে বউরাণীকে বলে যান—জমিদারী, কোলিয়ারী, কার-কারবারের সংগেই এটিকেও চালানো চাই। আগেরগুলো হচ্ছে অর্থ উপার্জন করার কল, আর এটি হচ্ছে অর্থকে সার্থক করবার একটা আলাদা ব্যাপার। গুণী কলাবিদের গুণের আদর, আর সেই সংগে তাদের জীবিকা উপায়ের জন্যেই এটা করেছেন। কর্ত্রী বউরাণী স্বামীর প্রত্যেক কথাই অক্ষরে অক্ষরে মেনে আসছেন। জমিদারী থেকে এই দলটি পর্য্যন্ত যত কিছু

ব্যাপার—কোনটিকে খেলো বা খাটো হতে দেননি, বরং বউরাণীর হাতে পড়ে প্রত্যেক ব্যাপারটির বাড়-বাড়ন্তই হয়েছে। তারপর, তাঁর মেজাজ এতো ভালো যে, তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না—দলের এই পালার কথা থেকেই বুঝতে পারবেন। দাম বাড়িয়ে দিয়ে 'নাম-কর যে-কোন অথারের পালা নেওয়া যেতে পারে, এতো জানা কথা। কিন্তু নাম-করা পালা-লিখিয়ে যে-কজন আছেন, কোন না কোন বড়ো দলের সংগে তাঁরা চুক্তি-বদ্ধ; অবিশ্যি, টাকার জোরে ঐ চুক্তির বাঁধন ছিঁড়ে ফেলা শক্ত নয়। কিন্তু বউরাণী মোটেই তা পছন্দ করেন না। উনি বলেন; এক জনের সাজানো বাগান থেকে গাছ তুলে এনে নিজের বাগানকে জাঁকিয়ে তোলাটা বাহাদুরী নয়—ইতরামি। পরের কারবারের মানুষ ভাঙ্গিয়ে নিজের কারবারকে জাঁকিয়ে তোলা মানে, নিজের পায়ে কুড়ুল মারা—এর চেয়ে অন্যায় আর নেই। তাই উনি বলেন, চেষ্টা করুন, লোক খুঁজুন—ঠিক মিলে যাবে। এই দেখুন না কেন—খুঁজে তো আপনাকে পেয়েছি!

সদরের পথে যেতে যেতেই গাড়ীতে বসে এই সব কথা হয়েছিল। আর এই কথা-প্রসঙ্গে মৃগেনের মত উন্নতি-প্রয়াসী আশাবাদীর তরুণ চিত্তটি অতি উল্লাসে নেচে ওঠাই খুব স্বাভাবিক। তার লেখা পালাটি যদি পছন্দ হয়—বেড়ালের অদৃষ্টে শিকে যদি ছিঁড়ে যায়, তাহলে কি কাণ্ডই না সে করে! অর্থ-ভাগ্যের দরজা যদি একটি বার খুলে যায়—তখন কোন বাধাই পথ আটকাতে পারে না, এ সত্য সে জেনেছে।

* * *

বাঙলা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার সদরে বউরাণীর এষ্টেটের এক-একটা কুঠি তাঁর বৃহৎ ও ব্যাপক প্রতিষ্ঠানটির সমৃদ্ধির পরিচয়

দেয়। কুঠির বিভিন্ন বিভাগে যেমন তহশীলদারের কাছারী ও কার-কারবারের কাজ-কর্ম্ম চলে, তেমনি যাত্রাদলের ব্যাপারে একটা করে গদীও সাজানো থাকে। এখান থেকে দলের প্রচার চালানো এবং বায়না-পত্র সংগ্রহ করা হয়। মরশুমের সময় গাওনার ব্যাপারে দল এসে পড়লে এখানে থাকে ও এখান থেকেই পালার মহলাদি চলে।

নদীয়া জেলার সদর—কৃষ্ণনগরেও এমনি একটি বড় রকমের কুঠি এখানকার এষ্টেটের বিভাগগুলিকে বহন করে। কতকগুলি বৈষয়িক প্রয়োজনের তাগিদে সম্প্রতি কর্ত্রী বউরাণীও এখানে এসেছেন। কুঠি-সংলগ্ন একখানি মনোরম দ্বিতল অট্টালিকায় তাঁর বাসের ব্যবস্থা হয়েছে। ম্যানেজার বসন্ত বাবু সদরে এসেই খবর পাঠিয়ে বউরাণীর সংগে দেখা করে মৃগেনের কথা বিস্তারিত ভাবেই জানালেন।

কথাগুলি নিবিষ্টমনে শুনে বউরাণী বললেন: সীতাও মস্ত এক পণ্ডিত লিখিয়ে যোগাড় করেছে। তিনি নাকি ওদের কলেজের মাষ্টারণীর ভাই—খাসা নাটক লিখেছেন। বড়দিনের ছুটি পরশু থেকেই শুরু হচ্ছে, তাই কাল দুপুরের ট্রেণে সীতা তাঁকে নিয়ে রওনা হবে লিখেছে।

বসন্ত বাবু বললেন: কিন্তু আমি যে এঁকে নিয়ে এলুম……

সস্মিত মুখে বউরাণী জানালেন: তাতে কি হয়েছে, আমাদের ত এখন দু-তিন-খানা বই চাই; ইনিও থাকুন, তিনিও আসুন; তারপর দু'জনেরই বই আমরা শুনবো, সীতার সামনেই শোনা হবে। পছন্দ হোলে দু'খানা বই এক সংগেই মহলায় ফেলবো। আপনি তাঁর থাকার আর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা নিজে করুন—ভদ্রলোকের ছেলের কোনো দিক দিয়ে কোনো অসুবিধা না হয়।

কে ও কী

মৃগেনের রচনা-শক্তি সম্বন্ধে নিজের প্রচুর আস্থা থাকায় এবং পালার ব্যাপারে তাঁর ওপর কর্ত্রী যথেষ্ট আস্থা রাখেন জেনেই ম্যানেজার বাবু এসেই সর্বাগ্রে পালার প্রসংগ নিয়ে বউরাণীর মহলে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল, সব কাজ ফেলে সেই দিনই বউরাণী মৃগেনের পালা শোনার ব্যবস্থা করে ফেলবেন। কিন্তু আই-এ পাশ, তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী—বিদুষী কন্যার চিঠি সে আগ্রহে বাধার সৃষ্টি করেছে জেনে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই ফিরে এলেন।

তাঁর মুখে খবরটি শুনে মৃগেনকেও দমে যেতে হলো বৈ কি। বউরাণীর যে এমন একটি কলেজে-পড়া বিদুষী মেয়ে আছে, মৃগেন সে কথা আগে শোনেনি। এখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মেয়েটির কথা জিজ্ঞাসা করে জানল যে, তার নাম সীতা। মেয়েটি সব দিক দিয়েই একেবারে যেনো ঝানু। তার রূপ আর স্বাস্থ্য যেমন দেখবার মত—আচার-ব্যবহারও তেমনি চমকপ্রদ। লোক-দেখানো লজ্জা-সংকোচ বা চাল-চলনে গতানুগতিক মামুলী ধারার ধার দিয়ে চলতে মোটেই সে অভ্যস্ত নয়। একবার নাকি কি একটা ছুটিতে এখানে এসে সাইকেল চেপে সারা সহরটা ঘুরে বেড়িয়ে কৃষ্ণনগরের বাসীন্দাদের অবাক্ করে দিয়েছিল। যখনই সদরে আসে, সব সেরেস্তাতেই দ্বার তার অবারিত—ম্যানেজার থেকে মুহুরী পর্য্যন্ত প্রত্যেকের সংগে আলাপ জমিয়ে খুঁটি-নাটি সব জানতে চায়—এই তরুণ বয়সের কোন মেয়ের পক্ষে সেটা বাস্তবিকই বিস্ময়াবহ। বিশেষতঃ, যাত্রাদলটির ওপরই তার ঝোঁক সব চেয়ে বেশী; যে ক'দিন থাকে—মহলায় এসে বসবে, মন দিয়ে শুনবে, গানে বা য়্যাকটিংএ বেসুরা কিছু হলে তখনি সেটা ধরবে, আর তাই নিয়ে তুমুল তর্ক বাধিয়ে সকলকে অতিষ্ঠ করে তুলবে—যতক্ষণে তার হেস্তনেস্ত না হয়। শেষ পর্য্যন্ত হয়ত বউরাণীকেই মীমাংসা করে দিতে

হয়। কেন না, লেখাপড়া খুব বেশী না জানলেও যাত্রার বই—শুনে চলবে কি না, সেটা বোঝবার বা কোন শিল্পীর গান বা অভিনয় সম্পর্কে ভালোমন্দ বিচার করবার ক্ষমতা তাঁর অসাধারণ। কিন্তু সময় সময় মায়ের সংগেও মেয়ের তর্ক বেধে যায় এবং নানা যুক্তি দেখিয়ে মেয়ে নিজের মতটাকেই গ্রাহ্য করবার জন্যে এমন জেদ ধরবে যে, শেষ পর্য্যন্ত বউরাণীকে ভোটের ব্যবস্থা করতে হয়।

বাঙালী-মেয়ের এরকম জেদ ও সাহসের কথা শুনে মৃগেনের সর্বাংগ রোমাঞ্চ হয়ে ওঠে, তার মনে পড়ে মায়ার কথা। ছেলেবেলা থেকে তারও যে রকম সাহস আর অসংকোচ স্বভাব দেখেছে, তাতে উচ্চশিক্ষা পেলে আর এমনি সুযোগ-সুবিধা ঘটলে—পাড়াগেঁয়ে সেই মেয়েটিও এমনি দুঃসাহসিকা হতে পারতো। কিন্তু মৃগেনের উৎসাহ মুশড়ে পড়লো নিজের সুযোগ-সুবিধার পথে এই উচ্চশিক্ষিতা মেয়েটী আসছে জেনে। সে তার পালায় পল্লী-জীবনের উপভোগ্য গভীর ভাব ও করুণ রসটিকে বেশী করে প্রাধান্য দিয়েছে, কিন্তু কলেজে-পড়া এই মেয়েটি কি তা পছন্দ করবে? তার পর, তারই কলেজের মেয়ে-প্রফেসারের ভাই লিখেছেন পালা, তিনিও নিশ্চয়ই মস্ত বিদ্বান ব্যক্তি। তাঁর লেখার কাছে পাড়াগেঁয়ে ইস্কুল থেকে এণ্ট্রান্স পাশ করা লিখিয়ের লেখা কখনো দাঁড়াতে পারে? আরো পালার দরকারই যদি হয়, বিদ্বান লেখক যখন পাচ্ছেন—তাঁকে দিয়েই লিখিয়ে নেবেন হয় ত!

এ অবস্থায় ম্যানেজার বসন্ত রায়ের কথাগুলি তাকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দিল: আপনি ভাববেন না মৃগেনবাবু, দলের পর দল চালিয়ে চুল পাকিয়েছি, মানুষও যেমন চিনি, লেখাও তেমনি বুঝি—সুর কানে গেলেই জানতে পারি মানুষের মনের ওপর তার এক্তিয়ার কতখানি। আপনার

লেখায় সুরের আমেজ পেয়েছিলুম বলেই আদর করে নিয়ে এসেছি ; এটা বাজে মনে করবেন না। যে যাই বলুক, আমাদের মালিক অবুঝ নন, আর আমাদেরও ভোট আছে জানবেন।

পরদিন বিকেলের দিকে বউরাণীর কুমারী কন্যা সীতা প্রফেসর অশোক মল্লিককে নিয়ে কুঠির ফটকের সামনে গাড়ী থেকে নামল। ম্যানেজার বসন্ত রায় এষ্টেটের গাড়ী নিয়ে ষ্টেশনে গিয়েছিলেন প্রফেসর মল্লিককে অভ্যর্থনা করে আনবার জন্য। সীতা তাঁকে সংগে করে আনলেও যখন লেখকরূপেই আসছেন তিনি, তখন দলের অধ্যক্ষের উচিত তাঁকে ষ্টেশনেই অভিনন্দন জানানো। পালা-লেখকদের সম্বর্ধনা সম্বন্ধে সকল দলের কর্তৃপক্ষই এরূপ সচেতন থাকেন, তবে বউরাণীর সম্প্রদায়ের কর্তৃপক্ষগণকে এ সম্বন্ধে অতিরিক্ত উৎসাহী দেখা যায়।

দেউড়ী পার হয়ে প্রাঙ্গনের পথে আসতেই সহসা মৃগেনের সংগে সীতার চোখোচোখি হলো। মৃগেন তখন স্বরচিত একটা গান গুন্‌গুন্‌ করে গাইতে গাইতে প্রাঙ্গনের ফুলবাগানে পায়চারী করছিল।

লাল কাঁকরের রাস্তা। দু'ধারে দেশী বিদেশী মরশুমি ফুলের গাছ—গাঁদা, দোপাটি ও কুন্দের গাছগুলি ফুলময় হোয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সীতা কয়েক পা এগিয়ে এসেছে ; অশোক মল্লিক প্রাঙ্গনের পথে পা বাড়িয়েই তন্ময় হোয়ে ফুলের বাহার দেখছে। তাঁর পিছনেই ম্যানেজার বসন্ত রায়। আর দু'হাতে দু'টো চামড়ার সুটকেস নিয়ে তকমাধারী চাপরাশী দেউড়ীর ভিতরে ঢুকছে···ঠিক এই অবস্থায় গানের মিষ্টি সুর এবং গায়কের স্বাস্থ্য-সুন্দর মুর্তি যুগপৎ সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো।

সীতার সংগে চোখোচোখি হোতেই যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে চমকে উঠলো মৃগেন,—তার গলার সুর তো আপনি বন্ধ হোয়ে গেলোই, উপরন্তু

মনে হলো—এ মুখের ছাপ যেন অনেক আগেই তার স্মৃতির পাতায় অস্পষ্ট হোয়েই ছিল, চোখোচোখি হোতেই সেটি যেন গভীর হয়ে উঠলো।

এ অবস্থায় সীতাকেও থমকে দাঁড়াতে হলো। অপরিচিত গলার স্বর আর অপূর্ব দু'টি চোখের দৃষ্টি তার কৌতূহলী মনে একটু দোলা দিলো বোধ হয়। অন্য সময় হোলে সে হয় ত নিজেই বাগানে ছুটে গিয়ে দলের এই নবাগত ছেলেটির সংগে আলাপ জমিয়ে ফেলতো; কিন্তু এদিনের অবস্থা অন্যরূপ, সংগে শ্রদ্ধাভাজন অধ্যাপক। সুতরাং মনের কৌতূহল দমন করে ঘাড়টি বেঁকিয়ে পিছনের শ্রদ্ধেয় অতিথির দিকেই মনঃসংযোগ করতে হলো তাকে। অধ্যাপক অশোক মল্লিকও এই সময় তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে একেবারে সীতার কানের কাছে মুখখানা বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলো: ও ছোকরা কে সীতা?

একটু সরে গিয়ে সীতা ঘাড় নেড়ে তাচ্ছল্যের স্বরে বললো: কে জানে! হয় ত দলের কোন য়্যাক্টর হবে।

ইতিমধ্যে ম্যানেজারও এদের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কথাটা শুনেই তিনি প্রতিবাদের স্বরে বললেন: না না, উনি দলের কেউ নন; মিষ্টার মল্লিকের মতন উনিও একজন সম্মানী লেখক; ওঁকেও আনা হয়েছে।

কথাটা শুনেই অশোক মল্লিকের মুখের ভাব যেন পালটে গেল, চোখের দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরে সে সীতার মুখের পানে তাকালো। সীতাও খবরটা শুনে প্রসন্ন হতে পারেনি। অদূরবর্ত্তী সম্মানী লেখকটিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে পরক্ষণে সে দৃষ্টি ম্যানেজারের মুখে নিবদ্ধ করে জিজ্ঞাসা করলে: উনিও বুঝি বই লিখেছেন! শোনা হয়েছে ওঁর বই?

মৃদু হেসে ম্যানেজার জবাব দিলেন : 'শোনা-শুনি তোমার জন্যেই যে সব মুলতুবি আছে, মা !

প্রসন্নমুখে অশোক মল্লিকের দিকে গভীর দৃষ্টিতে চেয়ে সীতা বলল : আসুন, স্যার !

মৃগেন এতক্ষণ তার অচেতন মনের পুরোনো পাতাগুলোর প্রতি ছত্রটি তন্ন-তন্ন করে হাতড়াচ্ছিলো। যে-মেয়েকে জীবনে কোন দিন সে চোখের সামনে দেখেনি, আজ তার সংগে চোখোচোখি হতেই পরিচিত জেনে কেন চমকে উঠলো সে! এই ভাবনাটাই এমনি বিহ্বল করে তাকে তুলেছিল যে, অদূরে তারই প্রসংগে তিন ব্যক্তির সংলাপ বুঝি তার কর্ণ স্পর্শও করেনি। একটু পরে পুনরায় তারই পানে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে সেই মেয়েটি যখন চলে গেলো, তখন যেন সেই দৃষ্টির আর একটা ঝাঁকুনি তার আড়ষ্টতা ভেঙে স্মৃতির রহস্যময় রুদ্ধ দরোজাটিও এক ঝটকায় খুলে দিয়ে গেলো। মৃগেনের চোখের সামনে ফুটে উঠলো অমনি—গৃহত্যাগের রাত্রিতে স্বপ্নে-দেখা সেই অপরিচিতা রহস্যময়ী মেয়েটি—আজকের চোখে-দেখা এই মনস্বিনী মেয়েটির মুখের সংগে যার মুখের কোন পার্থক্যই নেই !

অশোক মল্লিকের লেখার প্রশংসা করে সীতা কলকাতা থেকেই মাকে চিঠি লিখেছিল। বউরাণী এহেন সম্মানিত পণ্ডিত ব্যক্তির আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করেননি। দোতলার একখানি ভালো ঘর তার জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এক জন বেয়ারা তার পরিচর্যার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। খাতির দেখে মল্লিকের মাথা গরম হয়ে গেলো, ভাবলে এখানে সকলকে দাবিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে

হবে না, সেই সংগে আরো একটা আশা তার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে লাগলো।

সীতা মাকে মল্লিকের সম্বন্ধে বললো : একে ত নাম-করা অধ্যাপক, তার উপর খুব বড় লেখক ইনি। কি সুন্দর কবিতা লেখেন! এঁরই লেখা ছোট একখানি গীতিনাট্য আমরা কলেজে অভিনয় করেছিলুম, তাতেই আলাপ হয়। এর পর যে নাটকখানি নতুন লিখেছেন, সেইখানি আমাদের দলে খোলবার ব্যবস্থা করেছি। নাটকের নামটিও বেশ—মদনের কারসাজি।

বউরাণী বললেন : বেশত, শুনলেই বুঝতে পারা যাবে। ভালো হলে নোব বৈ কি। কিন্তু ও নাম ত যাত্রায় চলবে না—পাল্‌টাতে হবে।

সীতা বললো : সে যা হয় হবে। কিন্তু আমি যখন এঁর কথা লিখেছি, আবার আর এক লিখিয়েকে ডেকে আনবার কি দরকার ছিল ?

বউরাণী মৃদু হেসে বললেন : তাতে কি হয়েছে। পালা এখন উপরি উপরি দু'-তিনখানা খুলতে হবে। পালার জন্যে দল মার খাচ্ছে। পুরোনো জিনিস ভাঙ্গিয়ে আর চলছে না। তা ছাড়া, ম্যানেজার বাবুই ওঁকে এনেছেন, তিনি ত জানতেন না যে তুমি কলকাতা থেকে নামী এক জন লিখিয়েকে ধরে আন্‌ছ পালা শুদ্ধ !

একটা দিন ঠিক করে প্রথমেই অশোক মল্লিকের 'মদনের কারসাজি' শোনবার ব্যবস্থা করা হলো বউরাণীর ঘরে! অন্যান্য শ্রোতাদের সংগে মৃগেনকেও বউরাণী ডাকালেন নতুন পালাটি শোনবার জন্যে। বললেন : আপনিও যখন পালা লিখেছেন, এ পালাও আপনার শোনা উচিত।

এক ঘর লোকের সামনে নতুন পালা পড়বার ব্যবস্থা হয়েছে—বরাবরই এমনি ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। দলের বাছা বাছা গুণী ব্যক্তিরা উপস্থিত

থাকেন। পালা পড়া শেষ হলে পালা সম্বন্ধে প্রত্যেকের অভিমত নেওয়া হয়। ম্যানেজার বসন্ত রায়ও উপস্থিত থাকেন, আর তিনিই হচ্ছেন বিশিষ্ট শ্রোতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পাঠ ভঙ্গির অনুকরণ করে অশোক মল্লিক তার নাটকখানি ঘণ্টা আড়াইএর মধ্যেই পড়ে শেষ করল। সীতার চোখ দু'টো চক-চক করে উঠলো; এরই মধ্যে মৃগেনের দিকে আড় চোখে একটি বার তাকিয়ে তার মুখভঙ্গিটাও সে দেখে নিতে ভোলেনি। মৃগেন নির্বিকার, মুখ দেখে তার মনোভাব বোঝবার উপায় নেই।

বউরাণী বললেন: এবার আলোচনা হোক। রায় মশাই, আপনিই আগে আপনার কি মত বলুন।

ম্যানেজার বসন্ত রায় বিনা ভূমিকাতে খুব সংক্ষেপে বললেন: পড়ার সুরটা কানে মন্দ লাগলো না, কিন্তু কিছুই বুঝলাম না।

জুড়ি গাইয়েদের যিনি মুখপাত্র, তিনি বললেন: যতটুকু বুঝিছি—আদি রসকে ঘোরালো করে পাক করা হয়েছে, ভক্তি বা করুণ রস কিছুই নেই। একটি বারও চোখ মুছতে হলো না।

অভিনেতারা প্রায় একবাক্যেই মত প্রকাশ করলেন: লেখা যত ভালোই হোক, পালা বাঁধবার কায়দা এঁর জানা নেই—এ বই চলবে না।

আলোচনার সময় মতবিরুদ্ধ মন্তব্য শুনে সীতা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করতে চায়, বউরাণী তাকে থামিয়ে চাপা গলায় বলেন: আলোচনার মাঝে কথা বলতে নেই, ওঁদের আগে বলতে দে; সকলের বলা হয়ে গেলে তখন তোর যা খুসি বলিস্।

আর সকলের বক্তব্য শেষ হলে বউরাণী মৃগেনের অভিমত জিজ্ঞাসা করতে, সে যা বললে—ঠিক যেন বইখানির একটা সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

মৃগেন বলল : লেখায় পাণ্ডিত্য আছে খুব, কিন্তু ভাব নেই। যাত্রার জন্যে যে বই লেখা হবে, তাতে ভাব না থাকলে লোকে নেয় না। ওঁরা যা বললেন, খুব সত্যি কথা ; পালা শুনে লোকের চোখ দিয়ে যদি জল না ঝরে, তা হলে তার সুযশ হয় না—তা সে যত ভালো লেখাই হোক।

সীতা এই সময় ঝংকার দিয়ে বললো : তা হলে যাত্রা শুনতে বসে ধানি লংকা সংগে করে আনতে হয় বলুন, চোখে গুঁজে দেবার জন্যে—খুব জল তখন ঝরবে !

মৃগেন মুখখানা নিচু করে বললো : আমি ত তা বলিনি, চোখ দিয়ে জল ঝরা বলতে—পালা শুনে লোকে কেঁদে ফেলবে আপনি আপনি, এই কথাই বলছি।

সীতা বললো : আচ্ছা, কাল ত আপনার পালা শোনা যাবে, দেখব তখন কি করে কাঁদান !

মৃগেনের কথার সমর্থন করে বউরাণী বললেন : ঠিক বলেছেন উনি। 'ওরা এমনি গেয়েছে যে সবাইকে কাঁদিয়ে দিয়ে গেছে'—এইটিই হচ্ছে দলের খ্যাতির জয়-পতাকা। তাই' যে পালায় কান্না নেই—যাত্রায় তা জমে না। তা ছাড়া, এই পালাটির ঘটনাগুলো কেমন যেন খাপছাড়া —যাত্রার যারা শ্রোতা, বুঝবে না।

মৃগেন এই সময় সহসা বলে ফেললো : বইখানি খাপছাড়া লাগছে এই জন্যে যে, উনি ভাষা ঠিক মেলাতে পারেননি।

অশোক মল্লিক এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে চুপ করেই ছিল, মৃগেনের এ কথা শুনেই ফোঁস করে উঠলো—চোখ দু'টো পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল : তার মানে ?

মৃগেন বললো : কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকখানি আমি

পড়েছি কি না, তাই এ কথা বলছি। সেখানি ঘুরিয়েই বইখানি লেখা হয়েছে।

ক্ষিপ্তের মতন অস্থির হয়ে অশোক মল্লিক বলে উঠলো: কি বললেন আপনি—আমি রবি ঠাকুরের লেখা চুরি করেছি?

মৃদু হেসে মৃগেন উত্তর করলো: আমি ত চুরি করার কথা বলিনি—ঘুরিয়ে লেখা হয়েছে এই কথা বলেছি। আচ্ছা, আপনার পালার মদনের পয়লা নম্বরের ছড়াটা পড়ুন ত দয়া করে—

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে অশোক চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল: পয়লা নম্বর মানে?

বউরাণী বললেন: ইনি দেখছি যাত্রার ধরণ-ধারণ জানেন। পয়লা নম্বর মানে হচ্ছে—মদন আসরে এসে প্রথমেই যে কথা বলবে—পার্টের সেইটে!

'ও!' বলে অশোক মল্লিক খাতাখানা খুলে পড়ল:

মদন আমার নাম—কে না মোরে জানে।
খেলা মম নিখিলের নর-নারী হৃদয়ের
সনে। চুপে চুপে চোরের মতন
টানিয়া আনিয়া ছুট হিয়া—দিই তাহে
প্রেমের বন্ধন।

পরক্ষণে মৃগেন বলল: আর কবি রবীন্দ্রনাথের মদন বলছেন—

আমি সেই মনসিজ,
নিখিলের নর-নারী হিয়া টেনে আনি
বেদনা বন্ধনে।

ইনি অনেকগুলি কথায় যা বলেছেন, আপনি সেই কথাগুলির ওপর

নিজের কথা বসিয়ে এত বড়ো করেছেন। আমার কথার মানে এখন বুঝলেন ?

অশোক মল্লিক সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। সীতা এই সময় তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো : আমি ভেবেছিলুম, আপনিই এমন চমৎকার করে মদনের কারসাজিতে চিত্রঙ্গদাকে ফেলেছেন !

অশোক মল্লিক রুক্ষ স্বরে জবাব দিল : তাঁর চিত্রাঙ্গদা আমি দেখিনি।

মৃগেন বলে উঠলো : আমারও দেখবার সৌভাগ্য হোত না—কিন্তু ঐ বইখানা আমি স্কুলে 'প্রাইজ' পেয়েছিলুম।

সীতা জিজ্ঞাসা করলো : তাহলে আপনার পালাতেও চিত্রাঙ্গদার পিণ্ডি চটকেছেন বলুন ?

নম্র কণ্ঠে মৃগেন উত্তর করলো : এ-রকম লেখা সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলেও আমার কলম দিয়ে বেরুবে না। আমি পাড়াগাঁয়ের স্কুলে পড়ে কোন রকমে 'এনট্রেন্স' পাস করেছি—যে সব ভাবুক কবির লেখা গ্রামের লোকে ভালোবাসে, সেগুলো মন দিয়ে পড়েছি। আমি যা লিখেছি নিজের মন, আর তার ভিতরের ভাব থেকে—বিন্তের সংগে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্লেষের সুরে সীতা বললো : তবু নাটক লিখতে হবে ! আপনি দেখছি খুব সাহসী পুরুষ !

ক্ষণেকের মত মৃগেনের মুখখানা যেন কালো হয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণে অসীম মনোবলে সে ভাব কাটিয়ে সপ্রভিত কণ্ঠে সে বলে উঠলো : আপনি ঠিকই বলেছেন, সাহসই নতুন লেখকদের মস্ত মূলধন; নৈলে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াই ! কিন্তু তাই বলে—পরের লেখা ভাঙ্গিয়ে নিজের বলে চালাবার দুঃসাহস আমার নেই।

এক নিশ্বেসে কথাগুলি বলেই সে উঠে গেলো। অশোক, মল্লিক কিন্তু তিড়বিড় করে উঠলো শেষের কথাগুলো শুনে; উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো ঃ হামবাগ কোথাকার—আমাকে 'মীন' করেই ও-কথা বলে গেলো। আমি ওর জীভ্ ছিঁড়ে ফেলবো—শুয়োর, রাস্কেল, সন্ অফ্ এ···

সীতা তাড়াতাড়ি তার মুখখানা হাত দিয়ে চেপে পরের কথাটাকে বন্ধ করে দিল ঃ সংগে সংগে অস্ফুট কণ্ঠে বললো ঃ কি করচেন!

বউরাণীও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন; তথাপি এই অশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে তিনি প্রবোধ দিলেন; দলের সকলে অতি কষ্টে মুখের হাসি চেপে একে একে উঠে গেলো।

* * *

ভারাক্রান্ত মনে মৃগেন চূর্ণীর তীর লক্ষ্য করে চলেছে। সহর-প্রান্তের এই ক্ষীণকায়া নদীর নির্জন তীরভূমি—এখানে তার একমাত্র প্রিয় স্থান। পরিচিত স্থানটি তাকে বুঝি আকর্ষণ করছিল। তাল গাছের গুঁড়ি কেটে এখানে সারিবন্দী পৈঠে করা হয়েছে; সাধারণতঃ চাষীরাই জল তুলতে আসে এই পৈঠে বেয়ে। একটু তফাতে বাসীন্দাদের ব্যবহারযোগ্য আলাদা একটি ঘাট আছে—সেখানে জন-সমাগম প্রচুর। নির্জন স্থানটিই মৃগেনের প্রীতিপদ— মনের চিন্তা এখানে নানারূপে বিকশিত হয়, অতীতের কতো স্মৃতি প্রেরণা জাগায়। ঘাটের পাশে বড়ো জামরুল গাছটিই এখানে মৃগেনের প্রধান আকর্ষণ; এর দিকে তাকালে তার মনে জেগে ওঠে—স্বগ্রামের ভূতের বাগানে গাছের ডালে বসে মায়ার সংগে জামরুল ভাগা-ভাগি করে খাওয়ার বেদনাময় স্মৃতি!

আজও মন তার ভারাক্রান্ত। যে পালাটি নিয়ে ভাগ্য-পরীক্ষায় এত দূরে তাকে আসতে হয়েছে, তাতে বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে কর্ত্রীর আদরিণী

কন্যা শ্রীমতী সীতা, আর তার কলকাতার অধ্যাপক-বন্ধু অশোক মল্লিক এ ক্ষেত্রে সুবিধা করা তার পক্ষে কি সম্ভব হবে ?

হঠাৎ দূরে একটা খস্‌-খস্‌ শব্দ শুনে পিছনে আঁকা-বাঁকা সংকীর্ণ রাস্তাটির পানে সে তাকালো। অমনি তার নজরে পড়লো—বাঁকের মুখে তার চিন্তার মানুষ দু'টি হাত-ধরাধরি করে নদীর দিকেই আসছে। একটু আগে যাদের সংগে কথা-কাটাকাটি ও মন-কষাকষি হয়ে গেছে, তাদের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তার মনে কেমন একটা সংকোচ এলো ; অমনি উপস্থিত বুদ্ধির আলোকে নিষ্কৃতির একটা রাস্তাও ফুটে উঠলো চোখের সামনে। তাড়াতাড়ি জলের পৈঠের পাশ কাটিয়ে জামরুল গাছটির গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল সে, তার পর অভ্যস্ত কৌশলে গাছের পত্রময় পল্লব-গুলির মধ্যে আত্মগোপন করলো। আর এক দিনের এমনি লুকোচুরির স্মৃতিও তার মনটিকে বুঝি বেদনায় ক্লিষ্ট করে তুললো—ঠিক এই ভাবে যে-দিন কানাইকে দেখে ভূতের বাগানে গাছের আগডালে উঠে আত্মগোপন করতে হয়েছিল তাকে।

সীতা ও অশোক আস্তে আস্তে এসে তালের পৈঠের উপরে পাশাপাশি বসলো। সামনে শীর্ণ নদীটি সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে ; ওপারে খানিকটা খোলা মাঠ, তার পরে দিগদিগন্তে কৃষক-পল্লীর দৃশ্যটি অস্তমিত সূর্যালোকে ঝিক-ঝিক করছে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে অশোক মল্লিক বললো : ডেকে এনে এ ভাবে আমাকে অপমান করাটা কি অন্যায় নয় ?

সান্ত্বনার সুরে সীতা জানালো : না-ই বা আপনার বই এরা নিলে, আপনি কলকাতার থিয়েটারে দেবেন, ঢের বেশী নাম হবে। আর, আপনার ক্ষতি যা হয়েছে, তা পুষিয়ে দেওয়া হবে এ আপনি ঠিক

জানবেন। এখানে বই না নিলেও, এই বই ছাপার খরচ আপনি পাবেন। মাঝ থেকে এই নতুন জায়গাটা দেখা হলো, আমাদের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশার সুযোগ ঘটলো, এগুলো লাভ নয় বলতে চান আপনি ?

অশোক মল্লিক গম্ভীর ভাবে বললো: আমার মনে বেশী আঘাত দিয়েছে ঐ গেঁয়ো ভূতটার কথা—এনট্রেন্স পর্যন্ত বিদ্যের যার দৌড়, সে আসে আমার লেখার খুঁত ধরতে! তোমরা রুখলে তাই, নৈলে দিতুম আজ আচ্ছা করে চাবকে।

সীতা বললো: ও-কথা ছেড়ে দিন অশোক বাবু! আপনার নাম যখন অশোক, তুচ্ছ কথা নিয়ে শোক করা কি ঠিক ?—কথার সংগে খিল-খিল করে হেসে উঠলো সে।

সীতার সে হাসি বুঝি অশোকের দুই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সীতার মুখের উপর চেয়ে সে বললো: শোক-ফোক কিছুই হোত না, আফশোষও থাকতো না—যদি তুমি অন্তত আমার প্রতি সদয় হতে!

অশোকের মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সীতা জিজ্ঞাসা করলো: তার মানে ?

অশোক বললো: সেই ভাগ্যবান কবির কথা তোমাদের পাঠ্য গ্রন্থে পড়নি ? রাজসভায় সবাই কবির লেখা উপেক্ষা করলো দেখে কবি যখন মৃত্যুবরণে উদ্যত, সেই সময় তার বাঞ্ছিতা প্রিয়া রাজকন্যা কুটীরে এসে নিজের গলার হার কবির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিল—আমার বিচারে তুমিই জয়ী, এই তোমার জয়মাল্য কবি! তুমিও সীতা দেবী, যদি সেই রাজকন্যার মত—

আরক্ত মুখখানা বিকৃত করে সীতা ঝংকার দিল: যান্—আপনি ভারি—

পরক্ষণেই অশোক এক কাণ্ড করে বসলো। সহসা নিজের দেহটাকে পার্শ্ববর্তিনী সংগিনীর দেহের সংগে মিশিয়ে অসতর্ক সীতাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে তার ওষ্ঠের দিকে মুখখানা নামিয়ে বলে উঠলো : ভারি···কি বল ত? সাহসী এবং প্রেমিক?

সীতা বুঝি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অশোকের বাহুপাশ থেকে সবলে নিজেকে মুক্ত করে সবেগে সোজা হয়ে উঠে কম্পিত কণ্ঠে বললো : এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায় অশোক বাবু! আপনি একেবারে···ছি!

অশোক মল্লিকও সংগে সংগে উঠে হাসতে হাসতে বললো : গোল্লায় যাক্ আমার লেখা, তুমিই আজ আমার মনের পাতায় সাফল্যের রেখা ফুটিয়ে দিলে সীতা! লক্ষীটি, রাগ ক'র না ; আর যদি অন্যায় ভেবে রাগই করে থাক, তাহলে বল, আমি এখান থেকেই ষ্টেশনের পথে পাড়ি দিই।

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে সীতা বললো : আমি কি বলছি যে আপনি চলে যান! কিন্তু পথে-ঘাটে এ রকম করে যা-তা করা—

গলার স্বরে জোর দিয়ে অশোক বলে উঠলো : কিছুমাত্র অন্যায় নয় ; কারণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির কথাই এর নজীর—নথিং ইজ আন্‌ফেয়ার ইন্ ল্যভ্ য়্যাণ্ড ওয়ার!

কথার পরেই পুনরায় সে সীতার হাতখানা সজোরে ধরে তাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করলো।

ঠিক এই সময় নদীর বুকে ছোট একখানি পানসী থেকে এক জেলের কণ্ঠসংগীত শোনা গেল :

"কিসের লাইগ্যা কইন্য তোমার মনডা মুই গো পাইন্যা?
বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা ঢাইল্যা দিচি পায়

তোমার লগে কেম্‌তে পারুম হৈয়া উঠ্‌চে দায়
কৈয়্যা দ্যাও আমায় কইন্যা—মনড়া কেনে পাইন্যা ?

"কি হোচ্ছে—দেখতে পাচ্ছেন না।" বলেই এক ঝটকায় হাতখানা মুক্ত ক'রে সীতা রাস্তার দিকে ছুটলো।

অশোক মল্লিকও বুঝতে পারলো, সত্যিই সে সীমার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ম্লান মুখে সে-ও সীতার পিছু নিল।

আর মৃগেন বেচারী গাছের পত্রপল্লবের অন্তরালে বসে শহরের এই শিক্ষিত পণ্ডিতটির প্রবৃত্তির পরিণতি দেখে শিউরে উঠছিল।

*** *** *** ***

ঠিক এই সময় পীতাম্বরের বাড়ীতে মায়া আরম্ভকানাইকে নিয়ে হুলস্থূল কাণ্ড উপস্থিত।...

মায়া রাঁধতে বসেছিল। রাঁধতে রাঁধতে কান্নায় তার সারা বুকখানা উথলে উঠেছিল—উনানের হাঁড়িতে চাপানো ফুটন্ত ডালের মতনই। বাষ্প যেন অশ্রু হয়ে মুখখানা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। কানায়ের চিঠির কথাগুলো তার মনে তখন সূচের মতন ফুটছিল।

এমন সময় পা টিপে-টিপে কানাই এসে রান্নাঘরের দরজাটির সামনে দাড়িয়ে বল্‌ল: চিঠিখানার জবাব কিন্তু এখুনি চাই মায়ারাণী, লিখে পাঠাবে না মুখে জানাবে ?

'এই যে হাতে-হাতেই দিচ্ছি' বলে হাঁড়ি থেকে এক হাতা ফুটন্ত ডাল তুলে তার প্রসারিত হাতে চকিতের মধ্যে ঢেলে দিল মায়া।

"বাবা রে পুড়িয়ে,মারলে রে" ! বলতে বলতে বাড়ী মাথায় করে উঠানে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল কানাই।

একটু আগে সারদা ও-ঘরে দুধটুকু ঢেলে দিয়ে করুণার কাছে বিয়ের

কথাটি পেড়েছিল, আর করুণা তার উত্তরে বলছিল : যার মেয়ে তিনি আগে ফিরে আসুন, তখন কথা হবে।

কথাটা মনে না লাগায় সারদা জানায় : কি দরকার তাতে, ছেলেরা যখন রয়েছে? কই, বড় ছেলে কই···

করুণা বলে : শুয়ে আছেন—মাথা ঘুরছে, শরীর ভাল নেই।

এমনি সময় ছেলের চীৎকার গেল কানে : বাবা রে পুড়িয়ে মারলে রে!

সবাই উঠানে ছুটে এসে জানতে চাইল—হোল কি? কানাই সরোদনে জানালো : মা গোকুলদার জন্যে দুধ এনেছে, তাড়াতাড়ি জ্বাল দেবার কথা বলতে যেতেই গোকুলদার ঐ ধিঙ্গি বোন গরম ডাল দিয়েছে হাতে ঢেলে··· বাবা রে···

সারদা চেঁচিয়ে উঠলো : ওরে আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে রে! কি খাণ্ডাত মেয়ে রে বাবা—

মায়াও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে—চিঠির কথা তুলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিল তখনি। চিঠিখানি দেখিয়ে বলল : কোন্ মেয়ে এত বড় অপমান সহ্য করতে পারে শুনি? হাতে লিখেছে বলে হাত পুড়িয়ে দিয়েছি, এর পর মুখখানাও পুড়িয়ে দোব—ফের যদি আমার সঙ্গে কথা বলে!

গোকুলও বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিল। তারও মাথায় খুন চেপে গেল, চীৎকার করে বলল : নিকালো আমার বাড়ী থেকে পাজী ছুঁচো নচ্ছার—

সঙ্গে সঙ্গে সারদাও অমনি মুখোসখানা যেন জোর করে খুলে আসল রূপটি তার দেখিয়ে দিলে। রণচণ্ডীর মত নাচতে নাচতে—এ পর্যন্ত যা যা দিয়েছে, যা কিছু করেছে—সব ব্যক্ত করে কড়ায় গণ্ডায় দেনা মিটিয়ে দিতে

বলল। অতুল ও প্রসাদী কানায়ের মাকেই সমর্থন করল। এখন জানা গেল—নিত্য দু'বেলা রুগ্ন গোকুলকে আধ সের করে যে দুধ সারদা বরাবর যুগিয়ে আসছে সেটা মাগ্‌না নয়, পাঁচ সেরের দরে হাত-নাগাদ তার দাম চাই!

গোকুল এ সব জানতো না—সে বুঝি আকাশ থেকে পড়লো; সঙ্গে সঙ্গে ভীর্মি যাবার মতন হলো তার অবস্থা। মায়া তখন ছুটে গিয়ে কানায়ের মায়ের পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে বললঃ আমাকে ক্ষমা কর মা, সব দোষ আমার, যা তোমরা হুকুম করবে তাই আমি করবো, আমার দাদাকে বাঁচতে দাও!

ইতিমধ্যে করুণা ছুটে এসে কানায়ের পোড়া হাতে খানিকটা মধু মাখিয়ে দিয়েছিল। এখন দাহ-যাতনা যেন জল হয়ে গেলো মায়ার কথা শুনে। সে তখন মাকে বোঝালোঃ ভুল ওর ভেঙ্গে গেছে মা, হাজার হোক ছেলেমানুষ ত, মাপ কর মা ওকে,—বড় বৌদি হাতে সর-মধু মেখে দিতে জ্বালা আমার কমে গেছে—

প্রসাদীও অমনি এগিয়ে এসে বললঃ তাই ত, ঘরের লক্ষ্মী করবে বলে ঠিক করে রেখেছ যাকে, তার ওপর কি রাগ করতে আছে?

আঁচোলে মুখখানা গুঁজে দিল মায়া, কোন প্রতিবাদ করল না।

* * *

অশোক মল্লিকের বই শোনার দু'দিন পরে বউরাণীর ঘরে সেদিনের মতই সমঝদার শ্রোতাদের সামনে মৃগেনের বই শোনবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ দিন শ্রোতৃদল আরো ভারি—সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতা—সাধারণত, স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয়ে যাদের বিশেষ খ্যাতি আছে—কৌতুহলী হয়ে এ দিন বড়োদের পিছনে স্থান গ্রহণ করেছে।

বউরাণীই প্রথমে প্রশ্ন করলেন : আপনার পালার কি নাম ?

যাত্রা-সম্প্রদায়ে, বই বা নাটক 'পালা' নামে পরিচিত। অশোক মল্লিকের পক্ষে এই শব্দটি অভিনব হলেও আবাল্য যাত্রার পালা শোনায় অভ্যস্ত মৃগেনের কাছে এটা নতুন নয়। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করল : ছিন্নমস্তা।

নামটা শুনেই চমকে উঠল ঘরশুদ্ধ সকলেই। অশোক মল্লিকের ঠোঁটের দু'টো কোণে বিদ্যুতের রেখার মত বিদ্রূপের ক্ষীণ আভা ফুটে উঠল ; আর সীতার চোখ দু'টিও বড়ো হয়ে কপালের সীমারেখা স্পর্শ করল। বউরাণী জিজ্ঞাসা করলেন : আপনি তাহলে পুরাণের দশমহাবিদ্যার ছিন্নমস্তা দেবীর কথা নিয়ে পালা লিখেছেন বলুন ?

সহজ কণ্ঠে মৃগেন বলল : না। পুরাণের ছিন্নমস্তার বৃত্তান্ত আমার পালার বিষয়বস্তু নয়। আমার দেশভূমির এক মানবী ছিন্নমস্তার বাস্তব রূপই আমি এ পালায় এঁকেছি। অবিশ্যি, এ নাম বদলাতেও পারা যায়, আমিও আগে এই পালাটির আর এক নাম রেখেছিলুম। উপস্থিত এই নামটাই ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি। পালাটি শেষ পর্য্যন্ত শুনলেই আপনারাও বলবেন যে নামটি অসঙ্গত হয়নি।

বউরাণী মৃদু হেসে বললেন : বেশ, আপনি পড়ুন।

মৃগেন তখন সর্বসমক্ষে অসংকোচে ভাবার্দ্র কণ্ঠে বাগ্‌দেবীর বন্দনা করে তার পালার পাঠ শুরু করল। পড়ার আগে এই গ্রাম্য লেখকের দেবী-বন্দনা অশোক মল্লিক এবং সীতা দেবীর চোখে-মুখে কৌতুকের রেখা ফুটিয়ে তুলল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরেই এ দিন পালা শোনার ব্যবস্থা হয়েছিল। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পড়ে মৃগেন যখন খাতাখানি মুড়ে পুনরায় বাগ্‌দেবীর

উদ্দেশে প্রণতি জানাল, তখন সন্ধ্যা অতীত হয়েছে; ভৃত্য এসে ঘরের আলোগুলি জ্বেলে দিয়ে গেছে—সমস্ত ঘরখানা যেন থম-থম করছে। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দু'টি জোর করে বিস্ফারিত করে মৃগেন চেয়ে দেখল—একই ভাবে শ্রোতারা বসে আছে, প্রত্যেকেই যেন অভিভূত। মনে পড়ে গেলো অমনি—ভূতের বাগানে তার পালা শুনে একমাত্র শ্রোত্রী মায়ার মুখখানির অশ্রুময় অবস্থা! মায়াকে আনন্দ দেবার জন্য মৃগেন সেখানে যেমন করে অভিনেতাদের মত ভাবোচ্ছ্বাসিত ভঙ্গিতে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের সংলাপগুলি পড়ত, সংশ্লিষ্ট গানগুলিও নিজের সুরে গেয়ে যেতো, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর সেই জন্যেই তার পড়াটা এমন উপভোগ্য ও অনবদ্য হয়েছে। উপসংহারে দেশবৎসলা যে মহারাজ্ঞীর চিত্র সে এঁকেছে, তাঁর অবদান যেমন অভূতপূর্ব, তেমনি হৃদয়স্পর্শী! দেশ-প্রিয় দেশপতি স্বামী দেশের বিশ্বাসঘাতক বিভীষণদের সহায়তাপুষ্ট দুর্ধর্ষ মোগল-শক্তির প্রচণ্ড চাপ থেকে শস্যপূর্ণ অঞ্চল ও কৃষককুলকে রক্ষা করবার সর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। যুদ্ধ-বন্দিরূপে তাঁকে দণ্ডিত করা হোক, দ্বিধা তাতে নেই—কিন্তু দেশভূমিকে বিদলিত ও দেশবাসীর কেশাগ্রও স্পর্শিত হবে না—এই তাঁর সর্ত!···সাশ্রুলোচনে রাজ্ঞী বিদায় দিয়েছেন প্রিয়তম স্বামীকে, হতাবশিষ্ট বীরবৃন্দ ও গুণমুগ্ধ প্রজাগণ তাদের প্রাণসম রাজার সে মহাপ্রস্থান দেখে আর্তক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করেছে!—কিন্তু হায়, সুবিধাবাদী শত্রু সে সর্ত রক্ষা করে নাই; রাজাকে কারারুদ্ধ করেই অবরুদ্ধ রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দিকে দিকে চলেছে হিংস্র শত্রুবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ; ক্ষেত্রভূমি বিধ্বস্ত—লুণ্ঠিত হচ্ছে পণ্য, সম্পদ, নারীর মর্যাদা। দেশের এই মহা দুর্যোগে সর্তভঙ্গকারী শত্রুর বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই রাণীকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। অগ্নিময়ী

বাণীতে তিনি এক অপূর্ব 'প্রেরণা জাগিয়েছেন প্রত্যেক সমর্থ পুরুষ ও নারীর প্রাণেঃ মৃত্যুর মাদল বেজেছে—চলেছে প্রাণের খেলা ; প্রাণের পরিপূর্ণ প্রকাশ করে পুরুষ হোক প্রাণত্যাগী, ছিন্নমস্তা হোক নারী। অসুর-বিপ্লবে দেবশক্তি নিঃশেষ হলে মহাদেবী হন ছিন্নমস্তা, ছিন্ন করো আগে আততায়ীর শির, পান করো তার রুধির—বাড়ুক রক্ত-তৃষা, শেষ পর্য্যন্ত নিজ করে নিজের সকুন্তল মাথা কেটে দাও রণচণ্ডীর চরণে উপহার—সংহার, সংহার !

রাণীর এই মর্মবাণী বহ্নি বিকীর্ণ করেছে দেশে। শপথ করেছে প্রত্যেক পুরুষ—পঞ্চ ইন্দ্রিয়ভরা প্রাণ মৃত্যুর করাল মুখে ডালি দেবার আগে পঞ্চ আততায়ীর ছিন্নমুণ্ডে করা চাই তাঁর অর্চনা···বাণী দিয়েই মহারাণী ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বয়ং হয়েছেন আদর্শ। প্রাণোপম এক এক পুত্রকে রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তার কর্ণে দেন প্রাণত্যাগের এই মহামন্ত্র। একে একে তিন পুত্রের অভিযান ও প্রাণত্যাগের অবদান বীরভূমি যশোরের গৌরবকে করল উদ্দীপিত, শত্রু হল চমকিত—ত্রস্ত। সর্ব শেষে সর্বহারা রাজ্ঞীর ছিন্নমস্তারূপে মহামৃত্যুর মুখে পূর্ণাহুতি ! সমগ্র দেশে লাগল তার মরণদোলা, স্থাবর জঙ্গম হল স্তব্ধ, কেঁপে উঠল সম্রাটের সিংহাসন, আর্ত মুখ দিয়ে নির্গত হল শান্তির বাণী, বইল দেশে নতুন বাতাস, এল নতুন জীবন !

পালার বিষয়-বস্তু এবং রচনার ভঙ্গি ও সুর নূতনতম হলেও প্রত্যেকেরই অন্তর স্পর্শ করল ; এমন কি, বিরোধী দলের অশোক মল্লিক এবং সীতা-দেবী পর্যন্ত যে অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি, চোখের সঙ্গে হাতের রুমালের অবিরাম সংযোগ দেখেই জানা গেল। বউরাণীর আনন্দই সব চেয়ে বেশী। পুরাণ ছেড়েও যে এ যুগের ঘটনা নিয়ে এমন রসমধুর পালা লেখা যায়, তিনি

বুঝি এই প্রথম তার পরিচয় পেলেন। তাই শ্রোতাদের পানে তাকিয়ে আগেই বললেন: খাসা পালা হয়েছে, আমার মনে হয়, এ নিয়ে বেশী কিছু আলোচনার এখন দরকার হবে না। তবু যদি কেউ কিছু বলতে চান ত বলুন।

দলের মাতব্বররা একবাক্যেই জানালেন, এ পালার মার নেই—এর কাছে সব পালাকে হার মানতে হবে। আর পার্টগুলোর প্রত্যেকটি যেন আমাদের দলের ছাঁচে ফেলে ইনি লিখেছেন। একটু-আধটু খুঁত যা আছে, মহলার সময় ঠিক হয়ে যাবে।

অশোক মল্লিক কিন্তু এত সহজে প্রশংসাপত্র ছাড়তে নারাজ, তিনি নাম-করা বড় বড় বিদেশী নাটকের নজীর দেখিয়ে খুঁত বার করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর সে যুক্তি টিকল না। বউরাণী বললেন: যাত্রাগান আপনাদের মত পণ্ডিতদের জন্য ত নয়—লেখাপড়ার ধার দিয়েও যারা যায় না, কোন খবরই রাখে না, অথচ তারা আনন্দ চায়। সেই আনন্দ দেওয়াই হচ্ছে যাত্রার কাজ। কাজেই, তাদের বোঝাবার মতন করেই যাত্রার পালা লেখা চাই। এই যাত্রা দেশের অনেক বড় কাজ করছে; জানেন ত, এ দেশের পৌনে ষোল আনা লোক অশিক্ষিত, কিন্তু তবুও এরা যে পুরাণ ইতিহাসের কথা জানে, পাপ-পুণ্য আর ন্যায়-ধর্ম্ম বোঝে, দেহতত্বের মর্ম্মও জানে, সে সব কেবল এই যাত্রার জন্যে। ইতর-ভদ্র, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি একই আসরে বসে যাত্রা-গান শোনে। পুরাণের অনেক খবর হয়ত আপনারা রাখেন না, কিন্তু সে সব কথা পুরাণ না পড়েও দেশের সাধারণ লোকে বলতে পারে। এর কারণ হচ্ছে—যাত্রা শোনা। শুনে আপনি অবাক্ হবেন—বাঙলা দেশের মুসলমান চাষা-ভূষোরা পর্য্যন্ত হিন্দুর পুরাণের মানুষগুলিকে চিনে রেখেছে; এমন কি, আপনার করে নিয়েছে।

অভিমন্যুর মৃত্যুতে আমাদের মত এরাও কাঁদে, যুধিষ্ঠিরের দুঃখ দেখে ব্যথা পায়। যাত্রা শুনে শুনেই এ দরদ ওদের মনে এসেছে। মৃগেন বাবুর এই পালায় আবার হিন্দু আছে, মুসলমান আছে—তারা বাঙালী, বাঙলার জন্যে বিদেশী মোগলের সঙ্গে লড়ছে। আজকাল আমাদের দেশেও ভেদের সুর শোনা যাচ্ছে, এ সময় এই পালা সত্যই মিলনের সুর তুলবে। আমরা খুব খরচ করেই এ বই খুলব।

আশ্চর্য, কর্ত্রীর সিদ্ধান্তের পরেও অশোক নিরস্ত হতে অনিচ্ছুক। সে সীতার কানের কাছে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলল: বিদ্যের দৌড় যার এন্ট্রেন্স পর্য্যন্ত, তার বই কেউ শুনবে?

সীতা কিন্তু একেবারে বদলে গেছে—পল্লীগ্রামে শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্দ্ধ-শিক্ষিত এই লেখকের অসাধারণ রচনাশক্তি তার মনের মধ্যে এখন এই আলোড়ন তুলছে যে, এরই প্রতি নিজের আগেকার অশিষ্ট আচরণের জন্যে কি ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে লজ্জার হাত থেকে সে নিষ্কৃতি পাবে! কাজেই, অশোকের অভদ্র মন্তব্যটি তার কানে যেন সূচের মতো বিঁধল, প্রতিবাদের সুরে চাপা গলায় সে জবাব দিল: আর কেউ না শুনুক আমরা সকলেই ত অবাক হয়ে ওঁর বই শুনিছি?

অশোক তথাপি প্রত্যুত্তরে বলল: আমরা না হয় বাধ্য হয়েই শুনিছি, কিন্তু উচ্চশিক্ষার—ইউনিভার্সিটির ডিপ্লোমার ত একটা আলাদা মর্যাদা আছে, তাই বলছি...।

তার কথায় বাধা দিয়ে সীতা একটু রূঢ় স্বরেই উত্তর করল: একটা কথা আপনি মনে রাখবেন অশোক বাবু, এই মৃগেন বাবু চেষ্টা করলে একদিন হয়ত পি. আর. এস. হতে পারেন, কিন্তু একজন পি আর. এস.

সারা জীবন চেষ্টা করলেও এমন করে যাত্রার দলের পালা লিখতে পারবেন না। এ বিদ্যে আলাদা।

মেয়ের কথা শুনে মায়ের মুখখানাও প্রসন্ন হয়ে উঠল, কিন্তু অশোকের মুখখানা যেন কালো হয়ে গেল। আর মৃগেন স্তব্ধ হয়ে ভাবতে লাগল: এ হল কি?

বউরাণী অতঃপর মৃগেনকে অনুরোধ করলেন: পালাটি খোলা না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে থাকতে হবে। কেন না, মহলার সময় 'অথার' উপস্থিত থাকলে অনেক সুবিধা হয়। কালই আমরা আপনার সঙ্গে টাকা-পয়সার সম্বন্ধে কথা পাকা করব।

সীতাও মায়ের কথার সায় দিয়ে বলল: আমারো ভারি ইচ্ছে হয়েছে মৃগেন বাবু, আমি এখানে থাকতে থাকতেই যাতে পালাটি খোলা হয়—আমি এর 'ওপনিং নাইট' দেখে তবে কলকাতায় ফিরে যাব।—ভয় নেই, আপনার লেখার 'ক্রিটিসাইজ' আর করছি নে—তবে যদি দয়া করে আমার দু'-একটা 'সাজেস্‌সন' নেন, আর আমাকেও আলোচনার সুযোগ দেন তাহলেই ধন্য হব।

মৃগেন অবাক-বিস্ময়ে সহরের এই শিক্ষিতা এবং সেদিনের স্পর্ধিতা মেয়েটীর পানে একটিবার চেয়েই মুখখানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়—বলবার মত কোন কথাই সে যেনো খুঁজে পায় না।

* * *

সেদিন হাঙ্গামার পর গোকুল রীতিমত শক্ত হয়েই করুণাকে সতর্ক করে দিয়েছিল—এর পর যেন সারদাদের সঙ্গে কোনো রকম সম্বন্ধই আর না রাখে— দুধের দরুণ ওঁদের পাওনা টাকাটা হপ্তাখানেকের মধ্যেই চুকিয়ে দিয়ে আসবে। করুণাও স্বামীর কথায় সায় দিয়ে জানায়—আবার ওদের

সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি! দুধের টাকাটা ফেলে যেদিন দেবো আমি গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসবো। মা গো মা, কি ঘেন্নার কথা! মুখে এক, কাজে আর; মেয়েমানুষের মন যে এমন নিচু হয় তা জানা ছিল না—একবারে তাজ্জব বানিয়ে দিলে!

কিন্তু পরের দিন সকালেই কানাই দুধ, আর এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে উপস্থিত। খিড়কির পথ দিয়ে হন্-হন্ করে কানাইকে এ-বাড়ীতে আসতে দেখেই করুণা তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মায়াও সেই সময় ঘাটের দিকে যাচ্ছিল, করুণা চাপা গলায় তাকে ডেকে সতর্ক করে দিলঃ ওদিকে যাস্নি মায়া, কানাই পোড়ারমুখো নির্লজ্জের মতন আবার আসছে—শীগ্গির ঘরে যা, ওর সামনে বের হ'স্নি যেন আর!

কথাটা শুনে মায়া থম্কে দাঁড়ালো ওষ্ঠটি দাঁতে চেপে, সঙ্গে সঙ্গেই শক্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটলো। পরক্ষণেই উঠানে কানাইয়ের আবির্ভাব এবং তাহার ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনেই মায়ার ঘরের দরজাটি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। কানাইয়ের মনে হ'লো—দু'টি কপাটের মাঝে পড়ে তার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তটিও চেপ্টে গেছে! কিন্তু তাই ব'লে কানাই দমে যাবে কিংবা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বাড়ীর পথ ধরবে—সে পাত্রই সে নয়; বরং এ-সব ক্ষেত্রে তার উৎসাহ আরো উদ্দীপিত হয়ে উঠে। মায়ার ঘরটির পানে মিনিট খানেক চেয়ে থেকেই সে করুণার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাকলোঃ বৌদি কোথায় গো—

করুণা তখন ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে। মায়ার মত ঘরের দরজাটি বন্ধ করে অসহযোগটা এমন খোলাখুলি ভাবে জানাতে তার বধূ-সুলভ কোমল রুচিতে বাধছিল; অথচ বাড়ীতে অভ্যাগত এই অবাঞ্ছিত মানুষটির

ডাক শুনে কি যে এখন করবে, সেই চিন্তাই তাকে বিব্রত করছিল। এক দিন যাকে আদর করে বসতে আসন পেতে দিয়েছে, আজ কোন্ মুখে তাকে বলবে—তুমি আর এ-বাড়ীতে এসো না কানাই!···করুণা ভেবেছিল—অন্ততঃ কিছু দিন কানাই এ-বাড়ীর দরজায় আর মাথা গলাবে না। কিন্তু এত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে পুনরায় এ ভাবে তার উপস্থিতি করুণাকেও স্তব্ধ করে দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য তা স্থির করতে সে যেন অসমর্থ হয়ে পড়েছে।

কোন সাড়া না পেয়ে কানাই নিজের মনেই একটু হাসলো, তার পর আস্তে আস্তে দাওয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে রসিকতার সুরে বললো: বলি, হলো কি? মায়া দেবী ত আমাকে দেখেই দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিলে—বৌদিও কি তার দেখাদেখি আড়ি করলে না কি?

ভিতর থেকে করুণার সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু বাইরের দিকের দরজা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তীক্ষ্ণ স্বরে কানাই চমকে উঠলো:—কে ওখানে?

মুখ ফিরিয়ে কানাই দেখল—দুই চোখ পাকিয়ে তার পানে চেয়ে এই প্রশ্ন করছে গোকুলদা নিজে। চকিতে মুখের ভাব পালটে একগাল হেসে কানাই বলে উঠল: এই যে গোকুলদা!, বাড়ীতে এসেই ডাকাডাকি করছি কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে—

মুখখানা শক্ত করে গোকুল জিজ্ঞাসা করলো: ডাকাডাকির কি দরকার শুনি?

কানাই উত্তর করলো: নবীন মামা মহালে গেছলেন কি না, আজ সকালে ফিরেছেন; সেখান থেকে পাতক্ষীর এনেছেন এক হাঁড়ি—মা পাঠিয়ে দিলেন, আর এই দুধ—

কথাটা শুনতে শুনতেই. গোকুলের সর্বাংগ ঘৃণায় রী-রী করে উঠছিল ; সে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না,—কাল এই সময় এই বাড়ীর যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে সারদা অত বড় কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে গিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কোন্ মুখে সেই বাড়ীতে নিজের ছেলেকে পাঠিয়েছে সে এমনি করে 'আত্তি' জানিয়ে ! এদের কি চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নেই ? মনটাকে শক্ত করেই গোকুল সহজ ভাবে বলল ঃ তুমি ভাই, মিছিমিছি এগুলো কষ্ট করে বয়ে এনেছ ; বাজারের পাত্‌ক্ষীর আমরা কেউ খাইনে, আর দুধের পাট ত কাল চুকেই গেছে। কাল পর্যন্ত যা পাওনা হয়েছে, হিসেব করে আমি শীগ্‌গীর মিটিয়ে দেব—দুধ আর এখন নোব না।

গোকুলের কথায় কানাই যেন একেবারে আকাশ থেকে পড়লো, মুখখানার এক বিচিত্র ভংগি করে দুই চোখে বিস্ময় জাগিয়ে সে বলল ঃ সে কি গোকুলদা, কালকের কথাগুলো তুমি এখনো মনে করে রেখেছ না কি ? আরে, সে ত চুকে গেছে। আর, আমার মাকে ত তুমি চেনো, রাগলে জ্ঞান থাকে না—হাউহাউ করে যা-তা বলে ; তার পরেই একেবারে গঙ্গা-জল ! যেতে যেতে কত দুঃখ করছিল—অমন ক্ষেপামি করার জন্যে। নাও, বৌদিকে ডাকো—দুধটা ঢেলে নিন। আর মামা বললেন, ক্ষীরটা ঠিক বাজারে নয়—তিনি জানা দোকানে অর্ডার দিয়ে—

গোকুল লোকটি সাধারণত অল্পভাষী এবং এই ধরণের ছেঁদো কথায় চিরদিনই তার বিতৃষ্ণা। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করবার জন্যে সে দৃঢ় স্বরে বলল ঃ সকাল বেলায় আর বাজে কথা বলে গোল কোর না কানাই, তুমি ত আমাকে চেনো—এক কথার মানুষ আমি। তোমাদের ঐ দুধ আর ক্ষীর দু'টোই আমার কাছে—গোরক্ত !

এক নিশ্বেসে কথাগুলি বলেই গোকুল হন্-হন্ করে দাওয়ার ওপরে

উঠে গেল—কানাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না। কানাই খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার পর মুখখানা বিকৃত করে বললো: ভালো—তাহলে এই কথাই মাকে বলবো। কাজটা কিন্তু ভালো করলে না গোকুলদা!

গোকুলদা তখন ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। কথাটা তার কানে বাজতেই জবাব দেবার জন্যে উন্মুখও হোল, কিন্তু কি ভেবে তৎক্ষণাৎ জিভ্‌টাকে সংযত করল।

দুধের ঘটি ও ক্ষীরের ঠোঙ্গা নিয়ে কানাই অতুলের ঘরের দিকে চললো। অতুল বেরিয়েছিল, প্রসাদী রান্নাঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। কানাই এদিকে আসতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল: এই ত ভাই, তর সইল না তোমাদের—ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খেতে গিয়ে নাজেহাল হোলে, এখন যে লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে!

হাতের বস্তু দু'টি প্রসাদীর সামনে রেখে কানাই বলল: আমাদের পেটে অত-শত নেই বৌদি, হোল ঝগড়া—তার পর মিটে গেলো, ভাবলুম, শেষে যে কথা হয়েছে তাই থাকবে। সেই জন্যেই ত মা সকালেই পাঠিয়ে দিলে।

মুচকি হেসে প্রসাদী বলল: মা পাঠিয়েছেন বেড়া নেড়ে গেরোস্তর মন বুঝতে, তা পাঠাবার কি আর লোক পাননি মা, তোমাকে কি বলে পাঠালেন শুনি? হাতের ঘা এখনো শুকোয়নি, পটি বাঁধা রয়েছে; তবুও তুমি এলে দুধ ক্ষীর নিয়ে—ছি!

কানাই বলল: তুমি ঠিক বলেছ বৌদি, আমার আসাটা ভুল হয়েছে। এখন কিন্তু শুনলে মা আগুন হয়ে উঠবে। তা এক কাজ করি, এগুলো আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না—তোমাদের ভোগেই লাগুক।

প্রসাদী মুখখানা মচকে বললো : না ভাই, সে কি ভালো দেখাবে! মামা ক্ষীর এনেছেন—যারা আপনার জন, তাদের জন্যেই ত এনেছিলে, আমাদের জন্যে ত আর আননি, কোন্ মুখে আমরা ও নোব ভাই—তুমিই বলো ?

চট করে মাথায় বুদ্ধি খেলিয়ে কানাই বলল : ও, এই কথা! তা মা যে ও-বেলা নিজেই আসবেন, তোমাদের ভাগ আগেই তুলে রেখেছেন—এটা হোল বাড়্তি। যাক্, আমি এখন যাই বৌদি, এর একটা বিহিত ত করতে হবে।

কথা আর না বাড়িয়ে কানাই তাড়াতাড়ি চলে গেল।

* * *

কুটনো কুটতে কুটতে সারদা ভাইয়ের সংগে গল্প করছিল। অধিকারীর মেয়ে মায়া আর নিজের এক মাত্র ছেলে কানাইকে নিয়েই গল্প। ছেলে যে মেয়েটার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে, আর ছেলের সুখেই তার সুখ, সংসার-ধর্ম সব—কাজেই এ বিয়ে হওয়া চাই-ই। ভাইকে বিনিয়ে বিনিয়ে এই কথাই সে শোনাচ্ছিল। সারদা জানে, তার ভাই নবীনের মত খরিস লোক দুনিয়ায় আর দু'টি নেই—যাকে বলা চলে—বুদ্ধির জাহাজ। তার অসাধ্য কিছুই নেই। সেই জন্যেই অধিকারীর বন্ধকী তমসুকের টাকা সারদা দিলেও নবীনকেই মহাজন সাজিয়ে খাড়া করেছিল।

সমদ্দার তখনই হেসে বলেছিল : কান টানলেই যেমন মাথা এগিয়ে আসে, তেমনি এই বন্ধকী তমসুক অধিকারীর মেয়েকে এ-বাড়ীতে টেনে আনবে জেনো।

আগের দিনের ঝগড়ার ব্যাপারটা শুনে নবীন সমদ্দার মাথা নেড়ে বলল : কাজটা বোকার মতন করেছ বোন, ও ঠিক হয়নি। কাজ হাসিল

করতে হলে নিজের মুখে কি বিষ ঝাড়তে আছে, ওর রাস্তা আলাদা। আমি যদি কাল থাকতুম, তাহলে কালকেই হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়তুম।

সারদা বলল ঃ রাগ যে সামলাতে পারলুম না দাদা, মেয়েটার এত বড় আস্পর্দ্ধা। আমি ভাবছি জানো, আগে তো দু'হাত কোন রকমে এক করে বাড়ীতে আনি, তার পর উঠতে বসতে খালি ঝাঁটা আর ঝাঁটা।

সমদ্দার জিজ্ঞাসা করল ঃ যেদো রায়ের ছেলের আর কোন খবর পাওয়া গেছে?

সারদা বলল ঃ না, কোন্ চুলোয় যে গেছেন কেউ-ই জানে না। হাঁ ভালো কথা, আমি ত দাদা ঐ ছোঁড়ার নামে এক বদনাম রটিয়ে দিয়েছি তোমার নাম করে।

চোখের দৃষ্টি প্রখর করে ভগিনীর মুখের পানে চেয়ে সমদ্দার বলল ঃ বটে! তা ব্যাপারটা শুনি?

সারদা একবার সতর্ক দৃষ্টিটা চারি দিকে বিকীর্ণ করে তার পর সমদ্দারের মুখের ওপর ফেলে আস্তে আস্তে বলতে লাগল ঃ পাড়ায় রটিয়ে দিয়েছি, আমার ভাই মেগাকে ইষ্টিসানে দেখেছে—একটা খেমটাউলীকে নিয়ে কোথায় চলেছে।

কথাটা শুনেই সমদ্দার সোজা হয়ে বসে সোৎসাহে বলে উঠল ঃ বাঃ! মাথা খেলিয়ে খাসা বুদ্ধি বার করেছ ত! বাস—তা হলে ভাবনা কি,—এদিকে দেনার টাকায় মেয়েত বাঁধা পড়েছে, ওদিকে ঐ খেমটাউলীর অপবাদে সে ছোঁড়াও বরবাদ হয়েছে। বাছাধন যদি বেঁচেও থাকেন—সে মরারই সামিল।

ভায়ের মন্তব্যটি সারদার মনঃপূত হল। তার পর মৃদু হেসে বলল ঃ

কিন্তু ছোঁড়ার বাপ ঐ যেদো রায় কিছুতেই প্রত্যয় করতে চায় না, বলে—আমার ছেলে গঙ্গাজল, যারা একথা রটিয়েছে— মুখ তাদের খসে যাবে।

গম্ভীর মুখে সমদ্দার উত্তর করল : বাপ ত বলবেই, কিন্তু অপবাদ একবার রটলে আর ওঠে না—উল্কীর মত ছাপ রেখে যায়। এর পর দেখবে মজা—এই নিয়ে কি কাণ্ড করি।

এই সময় কানাই এসে মুখখানা ম্লান করে দাঁড়াল। মামার কথাগুলো আড়াল থেকে শুনেও সে আশ্বস্ত হতে পারেনি।

ছেলের মুখ দেখে সারদার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠল। জিজ্ঞাসা করলো ; কি বললে রে ?

কানাই বলল : নিলে না মা, ফিরিয়ে দিলে।

মুখখানা বিকৃত করে সারদা বলল : বলিস্ কি !

কানাই বলল : গোকুলদা বললে—বাজারের ক্ষীর আমরা খাই না, আর তোদের ও-দুধ আমার কাছে গো-রক্ত।

কথাটা ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়কেই স্তব্ধ করে দিল। একটু পরে সমদ্দার কেশবিরল মাথাটি দুলিয়ে মুখখানা গম্ভীর করে বলল : আগেই তো বলেছি, চাকাটা ভুল পথে ঘুরিয়েছ—ফেরাতে একটু বেগ পেতে হবে, এই যা ! এসে যখন পড়েছি আর ভাবনা নেই। এখন আমি যা বলবো, ঠিক সেই মত কাজ করতে হবে—মিছি-মিছি লম্ফ-ঝম্প করলে চলবে না। রান্না-বান্নার পাট সেরে নাও, খাওয়া-দাওয়ার পর কথা হবে খন।

* * *

মায়ার দিন যেন আর কাটে না। অতীতের অসংখ্য স্মৃতি তাকে যেন কণ্টকবিদ্ধ করে। দিনের প্রথম দিকটা কোন রকমে সাংসারিক কাজের ভিতর দিয়ে চলে যায়, কিন্তু তার পর যেনো অসহ্য হয়ে ওঠে। খাওয়া-

দাওয়ার পাট চুকতে দেরীই হয়, কিন্তু তার পরই মনের ওপর ভাসতে থাকে বাগানে বাগানে ঘোরা, নতুন নতুন লেখা শোনা—সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে জাগে মৃগেনের দৃপ্ত মুখখানি, তার ভঙ্গি, তার কথা, তার সুর। মায়া ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু মৃগেন এখন কোথায়, কেমন আছে, কি করছে—কে জানে!

পুকুরের চাতালটির ওপরে বসে বসে এমনি কত কি ভাবে। এ সময়টা বাড়ীতে যেনো সে তিষ্ঠুতে পারে না, তাই বেরিয়ে পড়ে—বাড়ীর কাছে এই নির্জ্জন স্থানটিতে বসেই অতীতকে স্মরণ করে সে।

এদিনও বিকেলে ঘাটের চাতালে এসে বসেছিল মায়া—অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে অনেক কথাই ভাবছিল। হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে চিন্তা তার ভেঙ্গে গেল:

মায়া-দি, তোমার নামে চিঠি আছে।

চমকে উঠে চেয়ে দেখে মায়া—পাড়ার পিয়ন দুখীরাম তার হাতের এক গোছা চিঠির ভিতর থেকে একখানি পোষ্টকার্ড বেছে নিয়ে তার কাছে আসছে। মায়ার বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করে উঠলো, হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে এক-নজরে দেখেই হাসিমুখে বললো: বাবার চিঠি দুখীদা—আঃ! বাঁচলুম।

দুখীরাম বললো: পিয়নগিরি করে আমার যা হয়েছে দিদি, সে আর কি বলবো! গেরাম শুদ্ধ সবাই তাকিয়ে থাকে আমার পানে, আমিও ত বুঝি; তাই কারুর চিঠি এলেই যেনো বর্তে যাই। চিঠিখানা পেয়েই ভাবছি, আহা হাতে পেলে তোমার কত আহ্লাদ হবে।

গ্রাম্য পিয়ন অন্য পথে চললো—এখনো অনেকগুলি চিঠি তাকে বিলি করতে হবে। যেতে যেতে তার মনে আর একটা চিন্তাও জাগছিল,

প্রত্যেক চিঠিই যদি সুখবর বহন করে আনতো! কিন্তু তা ত নয়,— বাপের খবর পেয়ে মায়ার মন আনন্দে দুলে উঠেছে, কিন্তু এমন চিঠিও আছে, মালিকের হাতে পড়লেই সে হয়ত ডুকরে কেঁদে উঠবে। উঃ, সে কি সাংঘাতিক! এখানে দুখীরামও যেনো নিজেকে হারিয়ে ফেলে—এ কর্ত্তব্য পালনও তার পক্ষে তখন কঠোর অপরাধের মত নিষ্করুণ হয়ে উঠে।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে মায়া খিড়কীর দরজার কাছে এসেছে, এমন সময় তাদের বাড়ী থেকে একটা কলরব শুনে থমকে দাঁড়াল সে, তার পর ত্রস্ত ভাবে বাড়ীর ভিতরে ছুটলো।

বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে তখন সালিসীর মজলিস বসেছে। মহাজন নবীন সমদ্দার একাই একশ' হয়ে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। গোকুল, অতুল এবং পাড়ার আরও দু'-চার জন লোক—কানাইদের যারা প্রতিবেশী এবং দহরম মহরম খুব বেশী তারাও এসেছে সমদ্দারের সংগে। চণ্ডীমণ্ডপের যে দরজাটি বাহির ও অন্দরের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সারদা দরকারী কথা যোগান দিচ্ছে। ভিতরের দিকে করুণা, প্রসাদী এবং পাড়ার আরও কতিপয় মেয়ে উৎকর্ণ হয়ে বাইরের কথা শুনছে।

সমদ্দারের সংগে গোকুলের এই প্রথম দেখা। বন্ধকী দলিল রেজেষ্টারীর সময় অতুলই উদ্যোগী হয়ে পীতাম্বরের সংগে সদরে গিয়েছিল, গোকুল তখন জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করে—স্বগ্রামে ছিল না। সেই সুযোগেই সরল পীতাম্বরকে ভুলিয়ে অতুলের সাহায্যে সারদা কাজ বাগিয়ে নেয়। তখন শোনা গিয়েছিল, নবীন সমদ্দার সারদার দূর-সম্পর্কের ভাই, এখন সমদ্দার নিজেই জানিয়েছে সারদার সে শুধু আপন ভাই নয়— অভিভাবক এবং মুরুব্বী। তা ছাড়া, তাঁর নিজের যে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আছে তারও ওয়ারিসান হচ্ছে একমাত্র ভাগনে কানাই।

অতুলই সমদ্দার মশাইকে আদর অভ্যর্থনা করে চণ্ডীমণ্ডপে এনে বসায়, নিজের ঘর থেকেই চা, পান, তামাক এনে মহাজন অতিথিকে আপ্যায়ন করে। পরে খবর পেয়ে বাধ্য হয়ে গোকুলকেও আসতে হয়। কিন্তু এই মহাজনটির প্রকৃত পরিচয় পেয়ে গোকুলের মুখে যেন অন্ধকার নেমে আসে—মনের মধ্যে একটা সন্দেহ গভীর হতে থাকে। বুঝতে তার বিলম্ব হয় না যে, তার অবর্ত্তমানে সেদিন এই যে ভীষণ প্রকৃতির মহাজনটিকে খাড়া করা হয়েছিল, এর মূলে রয়েছে রীতিমত একটা ষড়যন্ত্র এবং তার সংগে ভাই, ভ্রাতৃজায়া, সারদা, কানাই প্রত্যেকেই জড়িত।

শান্তকণ্ঠেই সে নবীন সমদ্দারকে বোঝাতে চাইল: টাকা যখন নেওয়া হয়েছে—সে টাকা নষ্টই হোক বা উপে যাক, আপনার দেনা শুধতে হবে বৈ কি। এরই দায়ে বাবা এই বয়েসে বিদেশে বেরিয়েছেন উপার্জ্জনের আশায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও এখন বেকার, তার ওপর রোগে ভুগছি। আর আপনিও নিজের মুখেই বললেন, বিষয়-সম্পত্তি আপনার প্রচুর, আর ভোগ করতে শুধু এই ভাগনে। তাহলে টাকার জন্যে এত তাড়া নাই-বা এখন দিলেন, মাস তিনেক সময় দিন, তার মধ্যেই আমরা টাকা দিয়ে দলিল ফিরিয়ে নোব।

সমদ্দার উত্তর করল: বললুম ত, কানাইয়ের মা'র কথাতেই টাকা আমি দিয়েছি, আর এ-ক'টা টাকার জন্যে আমার যে ঘুম হচ্ছে না তাও নয়; তবে কি জানো গোকুল বাবু, কথার খেলাপেই আমাকে আজ শক্ত হতে হয়েছে। যার মুখ চেয়ে একদিন এক কথায় টাকা বা'র করে দিয়েছি, তারই মুখ চেয়ে আজ সেই টাকা ঘরে তোলবার জন্যে এখন শক্ত হয়েছি। মুখের কথা আপনারা যদি ভাঙতে পারেন, আমিই বা তাহলে আপনাদের কথা কেন রাখতে যাবো বলুন ত?

বিস্ময়ের স্বরে গোকুল বলল : মুখের কথা আমরা ভেঙেছি—এর মানে ?

সমদ্দার হাসতে হাসতে উত্তর করল : মানে কি আপনি জানেন না গোকুল বাবু ? আসল কথা কি বলুন ত ? আপনার বোনটিকে দেখে আমার বোন একবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেন যে, ছেলের বৌ করে তাকে ঘরে না এনে ছাড়বে না। শুনে আমিই বরং বলেছিলুম—তোমার ছেলের বিয়ের জন্য ক'নের অভাব আছে না কি যে মেয়ের বাপের মন রাখতে টাকা ধার দিতে ছুটেছ ? তাতে উনি বললেন—কি করি দাদা, কথা দিয়েছি যে, অধিকারী ভারি মুস্কিলে পড়েছে ; টাকাটা আমি তার মেয়ের মুখ চেয়েই দোব বলিছি, আর মেয়েটিকে দেখলে তুমিও না বলে পারবে না—হ্যাঁ, এ মেয়ের জন্যে মেয়ের বাপকে টাকা অবিশ্যি দেওয়া যায়।

সমদ্দারের কথা শুনতে শুনতেই গোকুলের মুখখানা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠছিল ; কথাটা শেষ হতেই সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল : যথাসর্ব্বস্ব বন্ধক রেখে যেখানে টাকা নেওয়া হয়েছে, আজ এ কথা উঠছে কেন ? তা হলে ত দলিলেই ওটা লিখিয়ে নিতে পারতেন।

তেমনি মৃদু হেসে সমদ্দার কথাটার উত্তর করল : সেটা ভাল দেখায় না কি না; তাই আর ওটা লেখানো হয়নি। তবে কথা ছিল—ভালয় ভালয় বিয়ে হয়ে গেলেই দলিল ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আপনি ত তখন ছিলেন না—আপনার ভাই সব জানেন ; বলুন না অতুল বাবু !

অতুল বাবু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল : আপনি কি মিছে কথা বলছেন সমদ্দার মশাই, যে না বলবো ?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতুলের মুখের দিকে চেয়ে গোকুল বলল : তাহলে

আমার কথার জবাব দে অতলো, ভিটে-মাটি বাঁধা রেখে বাবা কেন টাকা ধার করেছিলেন ? তুই কি জানিস্ নে মায়ার বিয়ের পণের জন্যেই বাবা অস্থির হয়ে ওঠেন আর ঐ বাবদেই টাকা ধার করেন ? মায়ার বিয়ের কথা আগে থাকতেই যাদব রায়ের ছেলে মৃগেনের সংগে পাকা হয়েছিল—এ কথা কে না জানে ! আর কানাইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা যদি হয়ে থাকবে, তাহলে এমন করে টাকা কর্জ করবার কি দরকার ছিল—যখন ওঁরা মেয়ের মুখ চেয়ে টাকা দিতেই ব্যস্ত, পণের দাবী মোটেই নেই !

মুখখানা বেঁকিয়ে এবং অন্য দিকে ফিরিয়ে অতুল উত্তর করলঃ অত শত আমি জানি না বাপু, যাদব রায় ত চামার, তার কথা এখানে তুলো না, আর তার ছেলের কীর্তিও ত সবাই শুনেছে। বাবা শেষকালে তিতিবিরক্ত হয়েই এ কাজ করেছিলেন।

কথাটা শুনে এবং অতুলের অবস্থা উপলব্ধি করে গোকুল একটু হাসল ; তার পর শ্লেষের সুরে বললঃ তুই যে এ কথা বলবি সে জানা কথা, তোকে জিজ্ঞেসা করাই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু কথাটা যে মিছে, তোর মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছে—আমার মুখের পানে চেয়ে এত বড় মিথ্যে কথা বলবার শক্তি তোর নেই।

কিন্তু এত বড় কঠোর অনুযোগও গায়ে না মেখে অতুল নির্লজ্জের মত সুর নরম করে বললঃ আমি বলি দাদা, কি দরকার এ সব হাঙ্গামায় ; সমদ্দার মশাই যখন এসেছেন, একটা হেস্তনেস্ত করলেই ত হয়। টাকার তাগাদা—নালিশের ভয়—দেনা-পাওনা—সবই ত এক কথায় মিটে যায়। উনি বলছিলেন—২রা মাঘ ভালো দিন রয়েছে। তার পর শুভ কাজ হয়ে গেলেই দলিল ফিরিয়ে দেবেন আর বিয়ের খরচ-পত্তর যা কিছু উনিই দাঁড়িয়ে করবেন—

এই পর্যন্ত বলে অতুল দাদার অভিপ্রায়টি জানবার জন্যে তার মুখের পানে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। মনে হোল—দাদার চোখ দু'টো যেনো জ্বলছে, এখনি অগ্নি-গোলার মত ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। অতুল থামতেই গোকুল সরোষে গর্জন করে উঠল: তোর এ কথার জবাব দিতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে অতলো—বাবা যদি এখানে থাকতেন এর উত্তরে জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দিতেন। তুই ঠাওরেছিস্ কি? আমরা কি পেঁটেল—যে টাকা নিয়ে মেয়ে বিক্রী করব? এ কথা বলতেও তোর মুখে বাধল না!

এর পর কি জবাব দেবে অতুল তা ভেবে পেল না; কিন্তু সমদ্দার তার অবস্থা বুঝেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল: আহা হা, আপনি অত চটছেন কেন গোকুল বাবু, আর—মেয়ে বিক্রীর কথাই বা এখানে আসছে কেন? ভালো ঘর, ভালো মেয়ে হলেও, পয়সার জন্যে যেখানে পার করা হয় না, সমাজের দিকে চেয়ে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থেকে কন্যাদায়ের সব ঝক্কি যে নিয়ে থাকেন—এমন অনেক দৃষ্টান্ত আপনি পাবেন। আপনাদের ভালোর জন্যেই আমি এসেছিলুম মীমাংসা করতে, তা আপনি যখন শুনবেন না, আমি নাচার—

তিক্ত কণ্ঠে গোকুল বলল: শুনুন সমদ্দার মশাই, আপনি হচ্ছেন আমাদের মহাজন, আর আমরা খাতক—এই আমাদের সম্বন্ধ। এ ছাড়া আর কোন কথা এখানে নেই। এখন আমার কথা হচ্ছে—টাকা শোধবার সময় দেন ভালোই, না হয় নালিশই করবেন—আদালতেই আমরা টাকা জমা দেব।

সমদ্দারও সংগে সংগে শ্লেষের সুরে উত্তর করল: সেই ভালো, তবে মনে রাখবেন—বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা—শেষ পর্যন্ত জেরবার হতে হবে।

সারদা এতক্ষণ নীরবেই দু'পক্ষের কথা শুনছিল; পাছে বেফাঁস কথা কিছু বলে বসে তাই সমদ্দার তাকে বরাবর চুপ করে থাকতেই পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সে দেখল, অনেক বেয়ে-চেয়েও হালে পানি পাওয়া গেল না, তখন তার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হোল না, সমদ্দারের কথার পরেই সে চড়া সুরে বলে উঠল: তাহলে আমিও বলি বাপু, সম্পর্ক যখন কাটাতেই চাইছ, আর চক্ষুলজ্জাই বা কেন—আমার এদিক্‌কার পাওনা গণ্ডা নিয়ে তবে উঠবো। দাদার টাকা—না হয় নালিশ করে প্যারদা বসিয়ে আদায় করে নেবে, কিন্তু আমার দুধের টাকা আমি গলায় গামছা দিয়ে বুঝে নিয়ে ছাড়বো—

এই সময় দরজার পাশের ভীড় কাটিয়ে এবং এ-পাশের সারদাকে সরিয়ে দিয়ে অসংকোচে চণ্ডীমণ্ডপে এলো মায়া—হাতে তার চিঠি, সারা মুখখানায় অপূর্ব্ব এক দীপ্তি। এ-ভাবে এ-সময় মায়াকে দেখে চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত সকলেই চমকে উঠল। মায়া সবেগে গোকুলের কাছে গিয়ে তার হাতে চিঠিখানা গুঁজে দিয়ে বলল: বাবা চিঠি লিখেছেন দাদা, টাকা পাঠিয়েছেন মনিঅর্ডার করে—আর আসছে শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন ওখান থেকে বেরুবেন। তুমি ওঁকে বল দাদা—পরশু এসে যেন ওঁর দুধের টাকা নিয়ে যান, কালই হয়ত টাকা এসে পৌঁছবে।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে গোকুলের বিমর্ষ মুখখানাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সারদাকে লক্ষ্য করে বলল: বাবার চিঠি, ওখান থেকে টাকা পাঠিয়েছেন; আমিও আপনার টাকার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি; যাই হোক, পরশু এসে—.

আশ্চর্য্য, অমনি সারদার কথার সুর বদলে গেল; কোমল কণ্ঠে বলল: দুধের দামের জন্যে যেন আমার ঘুম হচ্ছে না! তাগাদা কি সত্যি সত্যি

টাকার ?' মেয়েটাকে যে কি নজরে দেখেছি কে তা বুঝবে। দু'হাত এক করবার জন্যে যত চেষ্টাই করছি বাছা, তুমিই ত তা ভেঙ্গে দিচ্ছ! নৈলে—

গোকুল এবার নিজেকে বিপন্ন মনে করে সবিনয়ে বলল: দেখুন, তাহলে বলি—মায়ার বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কারুর হাত নেই, বাবা এসে যে ব্যবস্থা করবেন তাই হবে।

এই ভাবে কথাটার উপসংহার করেই মায়াকে নিয়ে গোকুল ভিতরে চলে গেল। সমদ্দার হাতছানি দিয়ে অতুলকে কাছে ডেকে চুপি চুপি বলল: কৌশল করে কোন রকমে দাদার কাছ থেকে বাবার ওখানকার ঠিকানাটা আজই জেনে নেওয়া চাই—বুঝলে।

* * * * * * * * *

সন্ধ্যার পর প্রদীপের আলোয় মায়া পীতাম্বরকে চিঠি লিখতে বসেছে। বিদেশে গিয়েও বাবা যে অষ্টপ্রহরই তার জন্য ভাবেন সেই সঙ্গে মৃগেনকেও—কেন না তিনি জেনেছেন যে, মায়াকে সুখী করতে হলে মৃগেনকেও চাই—বাবার এই অনুভূতিই মায়ার মনটি আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার বাবা ত আজও শোনেননি—মায়া-মৃগের মিলনের জন্যে তিনি অধীর হলেও মৃগ মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে কোথায় গেছে কেউ তা জানে না। তাই মায়া তার পত্রে—পীতাম্বরের গৃহত্যাগের পর থেকে মৃগেনের গৃহত্যাগের উপলক্ষগুলি একটি একটি করে চিঠিতে লিখতে থাকে; তার পর মিনতি করে—দেখা হলে সব কথা তাকে খুলে বলবে, সে যেনো ভুল না বোঝে!··· চিঠি লিখতে লিখতে মায়ার চোখ দু'টি জলে ভরে ওঠে—চিঠিখানা ভিজে যায়। বার বার আঁচলে অশ্রু মোছে মায়া, আবার লেখে। মনের সংকোচ লজ্জার আবরণ আজ কলমের মুখে সরিয়ে দিয়েছে, ছিন্ন করেছে—অকপটে নির্ভীক ভাবে সব কথাই সে স্নেহময় বাবাকে লিখতে থাকে।

পিতলের ছোট পীলসুজটির উপরে বসানো প্রদীপের মৃদু আলোকে মায়া যখন তার বাবাকে চিঠি লিখছিল, সেই সময় একশো ক্রোশ তফাতে ভিন্ন জেলার সদর সহরে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন অঞ্চলে ছবির মত একখানি দ্বিতল বাড়ীর সুসজ্জিত ঘরে নাট্যকার মৃগেন রায় তার নূতন নাটক 'ছিন্নমস্তা'র গীতায়নে ব্যস্ত।

একখানি 'পালার' দৌলতে বরাত যে এভাবে প্রসন্ন হবে, মৃগেনের বাস্তব মনে তার কোন সম্ভাবনা জাগেনি। অবিশ্যি, বসন্ত রায়ের মুখে বউরাণীর মেজাজ এবং পালা-রচয়িতাদের যশ ও অর্থ-ভাগ্যের কাহিনী তাকে আশান্বিত করেছিল, কিন্তু আশাটি যে এত শীঘ্র এভাবে সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে—এ যেনো ধারণারও অতীত। পালাটি মনোনীত হবার পর বউরাণী যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি এখন কি চান বলুন?

মৃগেন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিল: দেখুন, আমার মা নেই, কিন্তু মায়ের স্নেহ আমি অনুভব করতে পারি। সেই স্নেহ দিয়েই আপনি আমার লেখাকে সবার সামনে বাড়িয়েছেন, আপনার জন্যেই দেশের সামনে আমার লেখা আদর পাবে। এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে—আমার চাইবার ত কিছুই নেই আর!

ভাবের আবেগেই কথাগুলি এভাবে বলে ফেলেছিল মৃগেন, কিন্তু সেই কথাগুলি বুঝি ব্রহ্মাস্ত্রের মতনই মমতাময়ী নারীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁকে অভিভূত করে। একটু ভেবে তিনি সংক্ষেপে তখন জানিয়ে দেন: বেশ, তোমার চাইবার মতন কিছুই যখন নেই, দেখি ভেবে কি করতে পারি। তবে একটা কথা বলে রাখি, বইখানা খোলা না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে, অবিশ্যি তার ব্যবস্থা আমি যথাসাধ্য করে দেব।

কথাটা জানাজানি হতেই দলের মধ্যে কথা ওঠে : ছেলেটা কি বোকা ; খপ্ করে বলে ফেলল—চাইবার কিছু নেই ! পালা শুনে বউরাণী যে-রকম খুশী হয়েছেন, পাঁচশো টাকা চাইলেও উনি 'না' বলতেন না !

কেউ বলে : আহা বুঝছ না বই খোলা হবার আনন্দেই ছোকরা টাকার কথা আর মুখে আনেনি—পাছে দর শুনে বউরাণী পেছিয়ে যান !

মাতব্বর গোছের লোকেরা মুখ টিপে ঘাড় নেড়ে জানায় : লিখিয়ের মুখ হে না চেয়েই ও ছোকরা সব পেয়ে গেছে দেখো ! বৌরাণীমা আমাদের বিনি পয়সায় বই নেবার পাত্রীই বটে !

পরদিনই মৃগেন জানতে পারল, তার জন্যে আলাদা একখানি বাড়ী ঠিক করা হয়েছে, সেইখানে সে থাকবে। ম্যানেজার বসন্ত রায়, এষ্টেটের গাড়ী করে স্বয়ং মৃগেনকে সেই বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। রাস্তার ধারেই ফটকওয়ালা ছোট বাড়ী, ভিতরে ঢুকলেই ফুলের বাগানটি চোখে পড়ে। একতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায় ; উপর-তলার ঘর দুইখানি সুন্দর ভাবে সাজানো। একখানি ঘরে পড়া-শোনা ও বসবার আসবাব-পত্র পরিপাটি করে রাখা ; অপরখানিতে নূতন খাট পাতা, তার উপরে পরিচ্ছন্ন সুকোমল শয্যা, খাটের ছতরিতে জড়ানো রয়েছে নেটের মশারি।

ঘরগুলি দেখিয়ে বসন্তবাবু বললেন : দেখছেন ত আমাদের বউরাণীর নজর—পান থেকে চুণটুকু খসতে দেন না। 'এই বাড়ীখানা নতুন তৈরী হয়েছে ; বললেন—বাজে খরচ করে গৃহ-প্রবেশের হাঙ্গামা করে আর দরকার নেই, গুণী ব্রাহ্মণের বসবাসে পবিত্র হোক।' এই দেখুন না—রসুয়ের তৈজস-পত্র থেকে আরম্ভ করে খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল প্রত্যেক

জিনিসটি নতুন কেনা। এক জন চাকর আর এক জন রাঁধুনী বাহাল হয়েছে—যাতে আপনার কোন অসুবিধে না হয়, বুঝলেন ?

ঘর ও ঘরের বস্তুগুলি দেখে ও সেই সঙ্গে রায় মহাশয়ের কথা শুনে মৃগেন অবাক-বিস্ময়ে ভাবতে থাকে—সে স্বপ্ন দেখছে না ত ? সন্দিগ্ধ হয়ে দু'হাতে একবার চোখ দু'টো রগড়েই বসে ! পরক্ষণে বিস্ময়টা কাটিয়ে আপন মনেই বলে ওঠে : এমনি টেবিলের সামনে কুসন-দেওয়া চেয়ারে বসে লিখব, ঘরে দেশের মহাপুরুষদের ছবি ঝুলবে, পাশে একখানি তক্তপোষও পাতা থাকবে—এগুলো মনে মনে কল্পনা করতুম, কিন্তু আজ দেখছি সে কল্পনা বাস্তব হয়েছে।

বসন্ত রায় বললেন : লোকে বলে কি জানেন, আমাদের বউরাণী না কি অন্তর্যামিনী, একবার যাকে দেখেন আর মুখের কথা শোনেন—তখনি মনে মনে তিনি জেনে ফেলেন সে লোকের কি কি চাই আর কিসে সে খুসি থাকে, কি পেলে তার মনটি আনন্দে ভরে উঠে। যাক্, এখন শুনুন —বউরাণীর ধারণা হয়েছে, আপনি যখন চমৎকার গাইতে পারেন, তখন গান বাধতে আপনার বাধবে না। পালায় 'জুড়ীদের' আর 'ছেলেদের' গান অনেকগুলো চাই ; আমাদের দলের মূল জুড়ীই ঐ সব গানের সুর দেবেন, আর সেই সুরে আপনাকে গান বেঁধে দিতে হবে। এই ঘরেই সে কাজ চলবে। সন্ধ্যার দিকে তিনি এসে আপনাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে নেবেন।

মৃগেন হাসি-মুখে সম্মতি জানায়। এর পরই মৃগেনের পালার মহলা সুরু হয়ে যায়, সংগে সংগে গান বাঁধার কাজও চলতে থাকে। বউরাণী খবর নিয়ে জানলেন, মৃগেন ছেলেটি শুধু পালা লিখে দিয়েই খালাস নয়—গানে বাজনায় অভিনয়ে সব দিক্ দিয়েই যেনো পাকা ওস্তাদ। মহলার

সময় নাম-করা পাকা অভিনেতাদেরও গলদ ধরে দিয়ে বাচনভঙ্গির নূতন রূপ দেখিয়ে দেয়, সুর অনুসারে শব্দ বসিয়ে সংগে সংগে গান বাঁধতেও তার ক্ষমতা অদ্ভুত। তা ছাড়া, স্বরচিত কয়েকখানি একালে গানে নিজের পরিকল্পিত নূতন সুর দিয়ে মহলায় যখন গানগুলি গীতিভংগিতে সে শুনিয়ে দেয়, সকলেই মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করতে থাকে, এবং সেই সুরই সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। এই সব ব্যাপারে এবং একবাক্যে সবার মুখে ছেলেটির সুখ্যাতি শুনে আনন্দে বউরাণীর মুখখানিও চক্-চক্ করতে থাকে।

দিন কয়েক পরে বসন্ত রায় একখানা লেখা কাগজ এনে মৃগেনের সামনে ধরলেন। নূতন বাসা-বাড়ীর পড়বার ঘরে বসে সে তখন তারই পালার একটি গর্ভ-দৃশ্য রচনা করছিল। কাগজখানা দেখে বিস্ময়ের সুরে মৃগেন জিজ্ঞাসা করল: কি ব্যাপার, রায় মশাই?

সামনের চেয়ারখানায় বসেই মৃদু হেসে বসন্ত রায় বললেন: আর কি, আপনাকে বেঁধে ফেলবার একটা খসড়া অর্থাৎ এগ্রিমেণ্ট। অবিশ্যি, ঘাবড়াবার কিছুই নেই, পড়ে দেখুন।

একখানি ডেমী কাগজে মুক্তার মত অক্ষরে সাজিয়ে গুটি-পঁচিশেক ছত্রে মৃগেনকে বাঁধবার যে সর্তগুলি তৈরী করা হয়েছে, পড়তে পড়তে মৃগেনের চোখ দু'টো বিস্ফারিত হতে থাকে। তার মর্মার্থ এই যে, বর্তমান 'ছিন্নমস্তা' পালাটির অভিনয়-সংক্রান্ত পূর্ণ মূল্য হাজার এক টাকা মৃগেনকে দেওয়া হবে এই সর্তে যে, ভবিষ্যতে ছয় বছরের জন্য সে বউরাণী সম্প্রদায়ের সংগে বাঁধা 'অথার'-রূপে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং বছরে দুইখানা করে নূতন পালা লিখে দেবে। অবিশ্যি তার জন্যে বার্ষিক বারো শত টাকা এবং শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার সময় প্রতি বছর অতিরিক্ত এক শত টাকা প্রণামী বা 'পার্বণী' ধার্য থাকবে। নির্দিষ্ট বার্ষিক পরিশ্রমিকের টাকা মাসে মাসেও

তিনি নিতে পারবেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, পালার খ্যাতি অনুসারে এক এক বছর অন্তে পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি পাবে।

কম্পিত হাতে কাগজখানি সামনে টেবিলের ওপর রেখে মৃগেন ধরা-গলায় বলে ওঠেঃ রায় মশাই, আমার অবস্থা যে আরব্য উপন্যাসের আবুহোসেনের মতন হচ্ছে দেখছি! বউরাণীমা আমাকে সত্যিই বাঁধছেন, কিন্তু শিকল দিয়ে নয়—মায়ের দরদ আর দয়া দিয়ে। 'তাই দেখছি, যোগ্যতার চেয়ে ঢের বেশীই তিনি দিয়েছেন।

স্নিগ্ধ স্বরে বসন্ত রায় বললেঃ তখন আমি, পথেই ত আপনাকে বলেছিলুম মৃগেন বাবু, পালা যদি ওঁর মনে ধরে, বরাত আপনার খুলে যাবে! এখন শুধু পালা কেন, আপনিও ওঁর মনে ধরেছেন। না চেয়েই আপনি ওঁকে মাত করেছেন। আপনাকে এক হাজার টাকা দেবার জন্যে মঞ্জুর হয়ে আছে, যখন ইচ্ছে নেবেন।

মৃগেন বলেঃ ও টাকা আমার ওঁর কাছেই এখন জমা থাক, দরকার পড়লেই চেয়ে নেব।

মৃগেনের ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষাভিমানী দাম্ভিক অশোক চৌধুরীর মতি-গতিও আশ্চর্য রকমে বদলে গেছে। পল্লীগ্রামের ইস্কুল থেকে এনট্রেন্স পাস করার বিদ্যে নিয়ে নাটক লিখেছে শুনে অশোক চৌধুরী প্রথমে কৌতুকবোধই করেছিল, ছেলেটির দুঃসাহস ও ধৃষ্টতার ওপর কটাক্ষ করে সীতাকে ত অনেক কথাই শুনিয়েছিল, এমন কি, বউরাণীর সামনেও কথা-প্রসংগে মৃগেনের মতন শিক্ষাহীন লেখকদের প্রতি আক্রমণ করবার প্রলোভনও দমন করতে পারেনি। সীতা নীরবেই তার কথায় সায় দিলেও বউরাণী কিন্তু প্রতিবাদ না করে পারেননি। হাসতে হাসতে তিনি ছিলেনঃ কারুর লেখা না শুনে আগে থেকেই বিচার করা ত যায় না;

আর, তিন-চারটে পাস করতে না পারলে যে লেখা উচিত নয় বা লিখলেও সে লেখা উৎরোবে না এ কথা বলাও ঠিক নয়। যাঁরাই যাত্রার দলে বই লিখে দেশ-যোড়া নাম করেছেন—কেউ যে কতকগুলো পাস করেছেন বলে শুনিনি। পাসের চেয়ে এখানে দরকার হচ্ছে শাস্ত্র-পুরাণ সব ভাল করে জানা, আর ভাবটুকু লেখার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—মা সরস্বতীর দয়া, কেন না, পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে লেখায় ভাব ফোটানো যায় না, জোর করে কিম্বা পাসের জোরে যাত্রার বই লেখা চলে না।

বউরাণীর কথাগুলি অশোক চৌধুরীর ভালো লাগেনি: তাঁর অসাক্ষাতে সীতার সামনে ঐ সব কথা নিয়ে সে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি। সীতা সর্বতোভাবে অশোক চৌধুরীর পক্ষপাতিনী হলেও মায়ের প্রতি তার কটাক্ষ নীরবে সহ্য করতে পারেনি, হাসি-মুখেই বলেছিল: হতে পারে মা একটু বাড়িয়ে বলেছেন—উচ্চ শিক্ষা বা ইউনিভারসিটির ডিপ্লোমার মর্ম হয়ত উনি বোঝেন না, তাই; কিন্তু তা বলে যাত্রার দলের নাটকের ব্যাপারে মাকে আনাড়ী ভাববেন না, মা যা বোঝেন, আর বই শুনে যা বলেন, কেউ তাতে আপত্তি তুলতে ভরসা পান না।

সীতার কথার উত্তরে অশোক চৌধুরী বলে: তার কারণ, তোমার মা হচ্ছেন মালিক—তাই। শুনিছি, যাত্রার দলের মালিকের দপ্‌দপা এত বেশী যে থিয়েটারের ম্যানেজাররাও না কি হার মানে।

সীতা বলে: আমার মা'র সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সত্যিই যাত্রার দলের মালিককে দলশুদ্ধ সবাই 'অধিকারী মশাই' বলতে অজ্ঞান! কত গল্পই তার শুনেছি। মায়ের প্রকৃতি কিন্তু আলাদা, তিনি নিজের

মতে-মর্জ্জিতে দেওয়া-থোওয়া ছাড়া কাজের ব্যাপারে সবার মত-নেন—প্রত্যেককে বলবার সুযোগ দেন।

ক্রমে ক্রমে অশোক চৌধুরী অবস্থাটি উপলব্ধি করতে পারে—পালা-রচনা ব্যাপারে বউরাণীর কথাগুলি যে অতি সত্য, মৃগেনের অসাধারণ রচনা-শক্তির চাক্ষুস পরিচয় থেকেই সেটা সুস্পষ্ট ও প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে এবং সেই সংগে নিজের সম্বন্ধে নোট মুখস্ত করে ইউনিভারসিটির একটার পর একটা পরীক্ষার ডিপ্লোমা-প্রাপ্তির গভীর অবলেপন ক্রমশঃ লঘু হতে থাকে। তারপর পালা সম্পর্কে অশোকের আশা সাফল্যমণ্ডিত না হলেও সীতার সম্বন্ধে একটা সম্ভাবনা সেই ব্যর্থ আশাকে আর এক দিক্ দিয়ে রঙিন ও রমণীর করে তোলবার যে আভাস দেয়, তাও উপেক্ষার বিষয় নয়। চূর্নীর তীরে সীতার প্রতি তার অশোভন আচরণের পরেও সীতার আচরণে কোন ছন্দপতন হয়নি দেখে তার উৎসাহ আরো নিবিড় হয়ে ওঠে—মনে মনে সে সাব্যস্ত করে ফেলে যে, সীতাকে সে ভুল বুঝে নাই—তার মনটিকে আয়ত্ত করেই ফেলেছে। সে জানে, তার ভগিনী—সীতাদের অধ্যাপিকা অনেক আগে থেকেই ধনবতী বউরাণীর এই উত্তরাধিকারিণী কন্যাটিকে তার সুযোগ্য জীবনসংগিনী সাব্যস্ত করে যোগাযোগের পথটিও নিরংকুশ করে রেখেছে! বউরাণীর সহজ সরল ব্যবহার ও কথাবার্ত্তাও তাকে উৎসাহিত করে। সেদিন তিনি নিজেই তার ঘরে এসে বলেন: তোমার এখন যাওয়া হবে না অশোক, সীতাকে সংগে করে যেমন এনেছ—তেমনি সংগে করেই নিয়ে যাবে বাবা! আর একটা কথা, লেখবার ক্ষমতা যখন তোমার আছে—এ বইখানা চললো না ব'লে যেন চুপ করে ব'সে থেকো না, যে ক'দিন আছ এখানে মহলাটা দেখো, তাহলে লেখার ধরণ-ধারণ বুঝতে পারবে। তোমার ওপরেও আমি অনেক আশা রাখি জেনো। মৃগেনের ওপর তুমি

যদি রাগ কর, তাহলে ওর ওপর সত্যিই অন্যায় করা হবে, ও কিন্তু তোমাকে সত্যিই খুব মানে আর শ্রদ্ধা করে, ও জানে তুমি কত বড় বিদ্বান্। সেদিন আমাকে বলছিল, আমার ইচ্ছা করে অশোকবাবুর কাছে ভাল করে ইংরিজীটা শিখি। আমি বলি কি, ওর যা শেখবার তোমার কাছে শেখে, আর তুমিও ওর কাছে পালা বাঁধবার ধরণ-ধারণ শেখ, তাতে কারুরই নিন্দে নেই বাবা—বরং ছ'জনেই লাভবান হবে।

পরদিনই সীতা এসে বলেঃ চলুন অশোকবাবু, আজ আমরা মৃগেনবাবুর বাসায় যাই—পুরাণো গানের সুর শুনে তিনি সংগে সংগেই কেমন করে গান বাঁধেন, চলুন না দেখে আসি।

অশোক এ দিন আর প্রতিবাদ করল না, প্রসন্ন মনেই বললঃ বেশ ত, চল না যাই; আমাদের ছ'জনকে কিন্তু দেখলেই সে ঘাবড়ে যাবে।

মৃগেনের বাসা-বাড়ীর পড়বার ঘরে ঢুকেই অশোক ও সীতা থমকে দাঁড়ালো। তারা দেখল, দলের গায়ক তক্তোপোষের ওপর বসে ঘাড় নেড়ে-নেড়ে সুর দিয়ে একখানা গান চাপা-গলায় বলে যাচ্ছে, আর নিজের জায়গাটিতে বসে ঠিক সেই গানের ছন্দ আর সুরের সংগে সমতা বজায় রেখে নূতন শব্দ সংযোগ করে গান বেঁধে চলেছে মৃগেন। হারমনিয়ম বাঁয়া-তবলা পাখোয়াজ মন্দিরা বেহালা প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে আর সব বাজিয়ে ও গাহিয়েরা প্রতীক্ষা করছে। গানটি বাঁধা হবা মাত্রই তখনি সংগতের সংগে সাধা হবে। তখনো যাত্রার অভিনয়ে জুড়ীর গানের প্রচুর আদর; সমঝদার শ্রোতারা তাদের উচ্চগ্রামের রাগ-রাগিণীযুক্ত কণ্ঠ-সংগীত শুনে গুণের বিচার করতে অভ্যস্ত। কাজেই জুড়ীদের জন্যে গান বাঁধতে পালা-রচয়িতাকে হিমসিম খেতে হয়। জুড়ীদের গান ছাড়া ছেলেদের গান—সে আর এক পর্ব। পনেরো-ষোলটি সুকণ্ঠ ছেলে বক্তার

আসরের বিভিন্ন অংশে গিয়ে গান গাইতে থাকে। এই সব গানের বিষয়-বস্তু নাটকের সংলাপকে অবলম্বন করেই রচিত।

অশোক ও সীতাকে এই প্রথম বাসায় আসতে দেখে মৃগেন তাড়াতাড়ি উঠে সবিনয়ে বলল: আমার কি সৌভাগ্য, আপনারা আসবেন কল্পনা করতেও পারিনি! বসুন—বসুন।

মৃদু হেসে সীতা বল্‌ল: ও কি কথা, বরং আমাদেরই সৌভাগ্য, আপনার গান-বাঁধা চাক্ষুস দেখতে পাবো।

অশোক বলল: সত্যি, আপনার সুখ্যাতি ত আর লোকের মুখে ধরে না; আপনার প্রতিভা আমরা প্রথমে ধরতে পারিনি, তাই ক্রিটিসাইজ কত করেছি, আপনি অনুগ্রহ করে সে সব ভুলে যাবেন, মৃগেন বাবু।

কুণ্ঠিত ভাবে মৃগেন বল্‌ল: আপনি আমাকে লজ্জা দিবেন না,—না হয় রচে লিখতে কিছু পারি, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা আমার কিছুই নেই—আপনার কাছে কত কি শেখবার আছে। আপনি যে দয়া করে ওঁকে নিয়ে এসেছেন তাতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন।

মৃগেনকেও অভ্যর্থনা করতে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল, সেই সংগে যে প্রধান জুড়িটি সুর দিতেছিল, এবং সংগতের জন্যে যারা প্রতীক্ষা করছিল তারাও উঠে পড়ছিল। সীতা সেদিকে কটাক্ষ করে বল্‌ল: আমাদের দেখে আপনারাও যে উঠে পড়েছেন—হয়ত কাজের ক্ষতি করেছি। আসুন সকলেই বসি, কাজ চলুক।

বসার সংগে সংগেই গায়ক প্রাচীন একটা ভাবোদ্দীপক গান সুর করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে চল্‌ল: মৃগেনও সেই গানের ছন্দে নতুন নতুন শব্দ সংযোগ করে সংলাপের মর্মটুকু ফুটিয়ে নতুন একখানি গান বেঁধে

ফেলল। তৎক্ষণাৎ সংগতের সংযোগে সমস্বরে গানটির সাধনা সুরু হয়ে গেল। সুরের সমতা এবং ওজন করে বসানো শব্দগুলির মাধুর্যে গানখানি দিব্যি উৎরে গেলো। জুড়ীর গায়ক মুক্তকণ্ঠে সর্বসমক্ষে মৃগেনের রচনা-শক্তির প্রশংসা করল। অশোক ও সীতা তার পর অনেকক্ষণ বসে এই ভাবে আরও কয়েকখানি গান রচনা ও সাধনার কৌশল দেখে চমৎকৃত হোল।

সম্প্রদায়ের লোকেরা কাজের পর চলে গেলে, অশোক ও সীতা আরও কিছুক্ষণ থেকে আজ সেধে মৃগেনের সংগে ভালো করে আলাপ করল—লেখা সম্বন্ধে অনেক সন্ধানও নিল। মৃগেনও মন খুলে বলে চলল—ছেলেবেলা থেকে কল্পনাকে সাথী করে সে ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করে—চর্চার সংগে সংগে তার অক্ষম কলমের মুখ দিয়ে কি ভাবে তার অজ্ঞাতে নূতন নূতন বাণী বেরিয়ে আসে। অনেক সময় সে নিজেই স্থির করতে পারে না—তার বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধারণার বহির্ভূত ভাবপূর্ণ কথাগুলি কি করে সে লিখে ফেলেছে! পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে উঠল: শোনেননি, ঠাকুর পরম-হংসদেব বলতেন—ভাবমুখে বড় বড় শক্ত কথা সহজ হয়ে বেরিয়ে আসে? আমরাও ত দেখেছি, একবারে মূর্খ নিরক্ষর—হঠাৎ বেহুঁস হয়ে বকতে থাকে, লোকে বলে তার ওপর ঠাকুর-দেবতার ভর হয়েছে; তা সে যাই হোক—কিন্তু যতক্ষণ সেই ভাবে সে থাকে, যে সব কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয়, শুনে জ্ঞানী লোকেরাও চমকে ওঠেন। আসলে হচ্ছে ওটা ভাব। আমার লেখাও এই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র—নিজের কৃতিত্ব এতে কিছু নেই।

অবাক হয়েই এরা দু'জনে শোনে, কিন্তু তারা ভেবে পায় না—এই 'ভাব' কি—কেমন করে তা মনের মধ্যে আসে, অথচ কথাটা জিজ্ঞাসা

করতেও বাধে। পথে যেতে যেতে এ সম্বন্ধে তাদের মধ্যেও আলোচনা চলে।

সীতা জিজ্ঞাসা করল : কি বুঝলেন বলুন ত ?

অশোক উত্তর করল : সত্যিই ওকে আমি ভুল বুঝেছিলুম—আসলে ছোকরা সত্যিই জিনিয়াস, আর, ঐ যে ভাবের কথা বললে—ওটা হচ্ছে প্রতিভা। তোমার মা ঠিকই বলেছেন, ও জিনিষটি পড়া-শোনায় জন্মায় না—আপনিই আসে, অর্থাৎ সহজাত।

মৃগেন তখন অস্থির ভাবে একাকী ঘরের ভিতর পায়চারি করছে—এ দিনের এমন অপ্রত্যাশিত প্রশস্তিও তার মনের মধ্যে নিদারুণ একটা অস্বস্তি তুলেছে। গায়ক বাদক অশোক সীতা—এক ঘর লোকের মুখগুলি তখন কোথায় তলিয়ে গেছে—ফুটে উঠছে শুধু একখানি মুখ, আর সে মুখের দরদ-ভরা দু'টি কথা—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যে স্বপ্ন দেখি মৃগদা; তুমি পালা পড়ছ, শুনছে কতো লোক, কিন্তু আমি সেখানে নেই!···মৃগেনের মুখখানাও কালো হয়ে যায়—আয়ত দু'টি চোখে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা!

পীতাম্বরের হাতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—সমগ্র আটচালাটি সমাপ্ত-প্রায় বাগ্‌দেবীর প্রতিমায় ভরে গিয়েছে। এখনো শেষের কাজটুকু বাকী—চোখের দৃষ্টি সিদ্ধ তুলির সতর্ক পরশে ফুটিয়ে তোলা—তবুও, প্রতিমাগুলির পানে তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না—কমলবনে যেন বীণাপাণিদের মেলা বসেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত লোকই আসে এই সাধক শিল্পীর অপরূপ সৃষ্টি দেখতে—দূর-গ্রামের বাসিন্দারাও এসে দেখে; তুলি চালাতে চালাতে পীতাম্বর তাদের প্রশংসা শোনে, মনটি দুলে ওঠে আনন্দে; অমনি আপন মনে আনন্দময়ীকে জানায়—তা ব'লে আমার মনে যেনো দ্যামাক দিও না মা, মস্ত

কারিকরী আমি—এ অহংকারে নরকের পথ যেনো না খুলে দিই জননি !

পূজার দিন ঘনিয়ে এসেছে, মাঝে আর ক'টা দিন। কাল সকালেই মহাজন এসে প্রতিমা সব নিয়ে যাবে। সকাল থেকেই পরেশ পাল তাড়া দিতে সুরু করেছে : সন্ধ্যের আগেই হাতের কাজ সব শেষ করা চাই অধিকারী ; মনে আছে ত, মহাজন কাল সকালেই 'কিস্তী' নিয়ে হাজির হবে ?

তুলি চালাতে চালাতে পীতাম্বর বলল : তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পালের পো, যার কাজ সেই করিয়ে নেবে—আমি ত উপলক্ষ গো ! তবে আমার কথাটাও মনে রেখো, কাজ হয়ে গেলে আমাকেও বিদেয় দিতে হবে কিন্তু। কাল এ আটচালা খালি হয়ে গেলে আমার বুকখানাও খালি হয়ে যাবে—আর এখানে টেঁকতে পারব না।

জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে পরেশ বলল : বিলক্ষণ, সে কি আর আমি বুঝি নে অধিকারী, ঘর-বাড়ী ছেলে-মেয়ে ছেড়ে মায়ের প্রিতিমের মধ্যেই মনটাকে থুয়ে রেখেছে, এর পর কি আর মন এখানে টেঁকে কখনো ? আর কাজ হয়ে গেলে তোমাকে আটকে রাখবই বা কেন ? তোমার হিসাব বুঝে নিয়ে হাসকে হাসতে দেশে চলে যাবে ; আর পাওনা-গণ্ডাও ত কম নয়—এক রাশ ট্যাকা। 'তা ও কথা এখন না তুললেই পারতে অধিকারী—ট্যাকা ত তোমার তোলাই আছে গো।

মুখখানা একটু গম্ভীর করেই পীতাম্বর উত্তর কবল : কথাটা তুলতুম না পালের পো, সে-দিনের কথাটার যদি নড়চড় না হোত। পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলুম। আর তুমিও দেবে বলেছিলে, তাই না বাড়িতে চিঠি লিখি। তা পঞ্চাশের জায়গায় তুমি ত ঠেকালে কুড়িটি টাকা, কি

করি—তাই পাঠাতে হোল। কিন্তু ঐ ক'টা টাকায় তাদের কি হবে ? সেই ভেবেই কথাটা তোলা, যাতে কালও না···

মুখখানার এক বিচিত্র ভংগি করে পরেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল : পাগল ! কালকের কথা বেঠিক হবে কেন বলো ? এক হাতে ট্যাকা নোব, আর সব প্রিতেমে ছেড়ে দোব ; ট্যাকার জন্মে তাহলে কথা বেঠিক কেন হবে ? তবে সে-দিনের কথা যদি বলো, যোগাড় করে উঠতে পারিনি। আর তাতে তোমার ক্ষতি আর কি এমন হয়েছে, বাড়ীতে খরচ করে ফেলত ; এখন তুমিই টাকার পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাবে—তখন মুখে হাসি ধরবে না দেখো, মানতেই হবে— হ্যাঁ, পরেশ পাল যা বলেছিল মিছে নয় !

মধ্যাহ্নের আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে পরেশ পাল আটচালায় এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল— তখনো পীতরম্বর নিবিষ্ট মনে তুলি চালাচ্ছে। মুখ টিপে একটু হেসে কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে সে বলল : তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাটটা সেরে নিয়েই কাজে বসলে হোত না অধিকারী—সন্ধ্যের আগে ত আর ফুরসদ পাবে না ?

তুলি চালাতে চালাতেই পীতাম্বর জানালঃ ছ'টো ফুটিয়ে নেবার ফুরসদও আজ হবে না পালের পো, এ লাইনের মূর্ত্তিগুলির চোখ টেনে তার পর নেয়ে নেব, আর চাড্ডি চিঁড়ে সকালে ভিজিয়ে রেখেছি, তাতেই হয়ে যাবে। বেশী ভার পেটে পড়লে হাতের কাজ এগুবে না। যা হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পালের পো—কাজ আটকাবে না।

না জানি—সেই জন্যেই ত ভরসা করে মহাজনকে খবর দিতে চলেছি গো ! আজ ফিরি ভালোই, নৈলে কাল ভোরেই তার কিস্তীতেই এসে পড়ছি ; তুমি কিন্তু মুখ রেখো অধিকারী—কালকের জন্যে যেনো একখানি

প্রতিমেও ফেলে রেখো না। আর এতে তোমারও সুবিধে— পুজোর আগেই বাড়ী পৌছতে পারবে, অপিস্কে আর করতে হবে না। কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলেই পরেশ পাল আটচালার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

গুন্ গুন্ করে একটি রামপ্রসাদী গান ধরে পীতাম্বর তুলি চালিয়ে চলেছে। কত লোক আসছে, প্রতিমা দেখছে, শিল্পীর তুলি চালনা দেখে দেখে প্রশংসা করছে, কিন্তু পীতাম্বর নির্বিকার—কারুর দিকে তার লক্ষ্য নেই। একটি প্রতিমার চোখের কাজ শেষ করে পার্শ্বের প্রতিমাটির দিকে তুলি নিয়ে এগিয়েছে, এমনি সময় গ্রামের ডাকঘরের পিয়ন আটচালার সামনে এসে ডাকল: চিঠি আছে গো— পীতাম্বর অধিকারীর নামে— কেয়ার অফ পরেশচন্দ্র পাল।

তুলি রেখে পীতাম্বর ছুটে এলো দাওয়ার দিকে—ক্ষিপ্র হাতে চিঠি-খানা নিয়ে খাম খুলে পড়তে বসল। চিঠি লিখেছ মায়া।

কত কথাই বিনিয়ে বিনিয়ে মায়া লিখেছে। চিঠি যখন আসে, বাড়ীতে তখন কি বিভ্রাটই বেধেছিল, কিন্তু চিঠিখানার জন্যেই তাদের মুখ রক্ষা হোল। তার পর মৃগেনের নিরুদ্দেশের কথাও লিখে মায়া অনুরোধ করছে— "মৃগেনদা'র সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য পাষণ্ড কানাই সে দিন ছড়া লইয়া যে কাণ্ড বাধাইল তাহা আমার বুকে বিষের কাঁটার মতন বিঁধিয়া আছে। কিন্তু দুঃখ এই যে, মৃগেনদা' মশার উপর রাগ করিয়া নিজের গালেই চড় মারিয়া চলিয়া গেলেন। যদি তাহার সহিত দেখা হয় তাহা হইলে কানাইএর বদমাইসীর কথা যাহা উপরে লিখিয়াছি সব বলিও!" আর কত কথাই সে জানিয়েছে।

মায়ার চিঠি পড়তে পড়তে পীতাম্বরের মূর্তিটাই বদলে গেলো—

আপন মনে বিড় বিড় করে বলে উঠল : বটে—এত দূর! আচ্ছা দেশে গিয়েই আগে সেই নচ্ছার মাগীর টাকাগুলো ফেলে দোব—তার পর ঐ বওয়াটে কানাই হারামজাদাকে একবার দেখে নেব—

কোন রকমে দু'টি ভিজে চিঁড়ে দই-গুড় মেখে নিয়েই পীতাম্বর আবার কাজে বসে—প্রতিমাগুলির শেষের কাজ আজ তাকে শেষ করতেই হবে। সাধক শিল্পী সে—ভালো করেই জানে যে একাগ্রচিত্তে শিল্পের সাধনা না করলে সৃষ্টি সার্থক হয় না, কাজে খুঁত থেকে যায়। তাই সে সব ভাবনা মন থেকে জোর করে ছেঁটে ফেলে মনটি নিবিষ্ট করল অবশিষ্ট মূর্তিগুলির অংগরাগ তুলির শেষ আঁচড়ে সম্পূর্ণ করে তুলতে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সমান উৎসাহে তুলি চালিয়ে চলেছে পীতাম্বর। সমস্ত দিন কেটে গেলো, দিনের আলো নিবে এসেছে—তুলি আর চলে না, চোখে যেনো ঝাপ্‌সা ঠেকছে। পরেশ পালের চাকর এসে আলো জ্বেলে দিয়ে গেল—দু'টো হারিকেন ল্যণ্ঠন। তাকে দিয়ে এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে খানিকটা অবসর নিল দীর্ঘ কয় ঘণ্টা পরে। গুড়ুকের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সংগে এতক্ষণে তার মনের ভিতরকার মানুষগুলিও যেনো আবছা আবছা ঘুরে বেড়াতে লাগল—মায়া, মৃগেন, গোকুল, অতুল, কানাই—শেষের মানুষটির হিংস্র মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তর্জনের সুরে বলে উঠল : দুষমণ, দুষমণ, ঐ ত আমার সর্বনাশ করেছে রে!

কাছেই জন-কয়েক লোক ছিল, পরেশ পালের ভৃত্যও। তারা শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল : হোল কি অধিকারী, হোল কি?

নিজেকে সামলে নিয়ে পীতাম্বর একটু হেসে উত্তর করল : কিছু নয়,ও একটা যাত্রার র‍্যাক্টো করা গেল।

শেষ প্রতিমাটির চোখের-কাজ সেরে পীতাম্বর যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন দুপুর রাত—সারা গ্রাম নীরব, নিস্তব্ধ। পীতাম্বরের সমস্ত শরীর তখন অবসন্ন, চোখ দু'টো জ্বালা করছে, মাথা ঘুরছে। আটচালার একটা খুঁটি ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে কাছের হারিকেনটি তুলে সে সমাপ্ত প্রতিমা-গুলির পানে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকালো, মনে হোল—সত্যিই তার সৃষ্টি সার্থক হয়েছে, কোথাও সে ফাঁকি দেয়নি, মূর্তিগুলি যেন হাসছে! অমনি বুকের ভিতরটা তার ধুক ধুক করে উঠল—এ হাসি ব্যঙ্গের নয় ত?

টলতে টলতে হাতের হারিকেনটির আলোকে পথ দেখে সে নিজের চালা-ঘরটির দিকে এগিয়ে চলল। ঘরের এক পাশে এক বাটি দুধ, মুড়ি, কলা ও গুড় রাখা ছিল—রাতের আহার্য। পীতাম্বর কিছুই স্পর্শ করল না, শুধু ঘটির জলটুকু নিঃশেষ করে ক্লান্ত দেহটিকে এলিয়ে দিল মলিন বিছানায়।

ঘণ্টা-খানেক পরে আটচালার পিছনে খালের ঘাটে একখানি মহাজনী নৌকা এসে লাগলো। গেঞ্জি-গায়ে কতকগুলি যোয়ান লোক টপাটপ করে লাফিয়ে পড়ল তীরে। একটা টর্চের আলো ফেলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পরেশ পাল আটচালার দিকে।

আটচালা জুড়ে শতাধিক বিভিন্ন আয়তনের বাণীর প্রতিমা। টর্চের সাদা আলোর আভায় শ্বেত পদ্মাসীনা মূর্তিগুলির মুখ হোল সুস্পষ্ট, মরি, মরি, কি সুশ্রী ভ্রূ—কি সুন্দর চোখগুলি! এক নজরে সব দেখে নিয়ে হাসি মুখে পরেশ পাল বলে উঠল: লোকটা কাজের হে—কাজ শেষ করে তবে শুয়েছে!

ভোরের সময় পরেশের চীৎকারে পীতাম্বরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। —ও অধিকারী, এ কি সর্বনাশ হোল,—মূর্তিগুলো সব কোথায় গেল হে?

কে ও কী

ধড়-মড় করে উঠে পীতাম্বর টলতে টলতে আটচালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল—আশ্চর্য কাণ্ড ত! আটচালা একবারে খালি, কোথাও একখানি প্রতিমা নেই; পীতাম্বরের বুকটাও বুঝি খালি হয়ে গেল—দু'হাতে মাথার দু'টি রগ ধরে কাঁপতে কাঁপতে বসে প'ড়ল সে!

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পরেশ জিজ্ঞাসা করল: ঠাকুর সব গেল কোথায় শুনি? তুমি ছাড়া ত এ তল্লাটে অরে কেউ ছিল না, রাতারাতি এক ঘর ঠাকুর কোথায় গেল?

পীতাম্বর তার বড়ো বড়ো চোখ দু'টো মেলে পরেশের কঠিন মুখখানার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল: ঠাকুরের চোখ আমরা ফোটাই আর আমাদের চোখ ঠাকুর বুজিয়ে রাখে, তাই এর জবাব দিতে পারলুম না পালের পো—ঠাকুরগুলো কোথায় গেল! যাই হোক, তুমিই আজ নতুন শিক্ষা দিলে, ঠাকুর আর গড়ব না—বামুনের ধাতে ও সইল না—সইবে না!

কথাগুলো বলেই আর কোন উত্তরের প্রত্যাশা বা পরেশ পালের কোন তোয়াক্কা না করেই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে মাতালের মত সামনের পথটার দিকে ছুটিল পীতাম্বর।

পরেশ পাল অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল এই অদ্ভুত মানুষটির পানে।

* * *

খেয়ালের ঝোঁকে মায়া সেদিন এক কাণ্ড করে বসলো।

দুপুর বেলায় খাওয়া-দাওয়ার 'পর ঘণ্টা কয়েকের জন্য এ-বাড়ীর সকলেই চিরাভ্যস্ত দিবা নিদ্রায় আচ্ছন্ন থাকে। মায়ার পক্ষে এই সময়টুকু খুবই অস্বাস্তিকর হয়ে ওঠে। মৃগেনের অসংখ্য স্মৃতি—তার রচিত নাটকের চরিত্রগুলি মূর্তি ধরে তাকে যেনো বিহ্বল করে তোলে; কিছুতেই

সে বাড়ীতে তিষ্ঠতে পারে না তখন। এই সময়টুকু কি আনন্দেই কাটত—জমিদার বাবুদের পোড়ো ভূতের বাগানটিতে। মৃগেনের নিরুদ্দেশ যাত্রার পর সে বাগানের ত্রিসীমাতেও কোন দিন যায়নি মায়া, অথচ প্রতিদিনই এই সময় বাগানের পরিবেশগুলি তাকে যেনো হাতছানি দিয়ে ডাকে—মায়া অস্থির হয়ে উঠে; কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়—এ আকর্ষণ নিরর্থক, তবুও উপলক্ষ মানুষটির অদ্ভুত প্রভাব উপলব্ধি করে সে অভিভূত হয়—মুখখানা আঁচলে চেপে গুমরে গুমরে কাঁদে, চোখের জলে আঁচল ভিজে যায়। সেদিন এমনি অবস্থার মধ্যে বাগানের অশোক গাছটি এবং তার কাণ্ডকে বেষ্টন করে পাথরের বেদীটি এমনি সুস্পষ্ট হয়ে উঠল যে অনেক দিন পরে সেটিকে আর একবার দেখবার প্রলোভন কিছুতেই সে দমন করতে পারল না। নিঃশব্দে খিড়কির দরজাটি খুলে বাইরে এসে সন্তর্পণে খোলা পাল্লাটি বন্ধ করে সতর্ক দৃষ্টিতে একবার চার দিক দেখে নিল, তার পর দ্রুতপদে এগিয়ে চলল অদূরবর্তী বাগানটি লক্ষ্য করে। কয়েক মাস জন-সমাগম না হওয়ায় বনপথ দুর্গম হয়েছিল, প্রবেশ করবার সময় পায়ে কাঁটা বিঁধল, কোমল অঙ্গের দুই-তিন স্থানে নলখাগড়ার আঁচড় লাগল, একটা বেতান গাছের কণ্টকময় শাখায় লেগে শাড়ীর আঁচলের খানিকটা ছিঁড়ে গেল—কোন রকমে মুক্ত হয়ে ফাঁকা জায়গাটায় এসে দাঁড়াল সে। ঐ ত তাদের মিলন-পীঠ—পাথরের সেই পরিচিত বেদী, সর্বাংশ অশোকের বিবর্ণ ফুলে ও শুকনো পাতায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে, কেমন একটা সোঁদা সোঁদা গন্ধ মৃদু-মন্দ বাতাসে ভেসে আসছে। এই বেদীতে প্রতিদিনই মৃগেন আগে এসে বসে থাকতো তার প্রতীক্ষায়, কোন দিন বা তন্ময় হয়ে নূতন রচনায় নিবিষ্ট হয়ে থাকত, আবার এক এক দিন ছুরির ডগা দিয়ে অশোক গাছের কাণ্ডটির

উপর কত কি লিখত। ঐ যে এখনো তার নিদর্শন রয়েছে···একটি দুটি তিনটি···পর পর পাশাপাশি। এগিয়ে গিয়ে বেদীর ওপর উঠে বদ্ধ-দৃষ্টিতে দেখতে লাগল—মৃগেনের সিদ্ধহস্তের চিহ্নগুলি অজ্ঞেও কত সন্তর্পণে বহন করছে তাদের মিলন-সাথী এই প্রাচীন গাছটি। চোখের দৃষ্টি প্রখর করে মায়া পড়তে লাগল···'মায়া-মৃগ'; 'শিব-দুর্গা'; 'রাম-সীতা'; 'যশোরেশ্বরী'; 'বাঙ্গলার হলদিঘাট'···এমনি কত অন্তরস্পর্শী শব্দ। পড়তে পড়তে মায়ার অন্তরটিও দুলে ওঠে, এই সব শব্দ দিয়ে কত কথাই হোত, কত ব্যাখাই করত মৃগেন···

গাছের গায়ে অমন করে কি দেখা হচ্ছে?

পিছন থেকে ব্যঙ্গের সুরে এই পরিচিত কণ্ঠের প্রশ্নটি শুনেই চরকীর মত মায়া ঘুরে দাঁড়ালো—কানাই যে তার অনুসরণ করে এই দুর্গম বনে এসে দাঁড়িয়েছে, ঘুণাক্ষরেও সে তাহা জানতে পারেনি। আসবার সময় সতর্ক-দৃষ্টিতে চারিদিক্ দেখেই পথে নেমেছিল—কই, তখন ত এই অসভ্য ও অবাঞ্ছিত মানুষটা তার চোখে পড়েনি? তবে কি সে আগে থেকেই এখানে ছিল কিংবা তার অজ্ঞাতেই বাড়ীর কানাচ থেকেই অভদ্রের মত পিছু নিয়েছিল! ক্ষণকাল বিমূঢ় দৃষ্টিতে সে কানাইয়ের অশিষ্ট মুখখানার পানে চেয়ে রইল, তার পর সুশ্রী সুঠাম,কপালটি একটু কুঞ্চিত করে মুখে কোন কথা না বলে অশোক গাছের কাণ্ডটির পাশ দিয়ে বেদী থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ল—তার সংস্পর্শ থেকে পালাবার উদ্দেশ্যে।

কানাই বেদীর ওপর ওঠেনি, নিচেই ছিল। সংগে সংগে সে-ও বেদীটা ঘুরে এক দৌড়ে মায়ার সামনে গিয়ে পথ আটক করে দাঁড়াল, নির্লজ্জের মত হাসতে হাসতে বলল: আমি কি বাঘ, যে দেখেই হরিণের মতন লাফিয়ে পালাচ্ছ?

দৃপ্ত কণ্ঠে তর্জন করে উঠল মায়া : পথ ছেড়ে দাও বলছি।

নারীকণ্ঠের তর্জনে কিছুমাত্র অপ্রতিভ বা লজ্জিত না হয়ে ইতরের মত বিশ্রী একটা ভংগি করে হাসতে হাসতে কানাই বলে উঠল : মাইরি না কি —হাতে পেয়ে এক-কথায় ছেড়ে দোব ! ক'দ্দিন ধরে এমনি একটা ফুরসৎ খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম, একটি দিনও বাগে পাইনি ; আজ বিষহরি মুখ রেখেছেন।

এমন জায়গাটিতে কানাই পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে যে, পাশ কাটিয়ে যাবার কোন উপায় নেই। এক নজরে দুই পাশ দেখে অবস্থাটা বুঝে মায়া মনে মনে একটু শংকিত হোল, কিন্তু সে ভাব মুখে প্রকাশ না করে নির্ভীক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল : তোমার মতলব কি শুনি ?

দন্তপাটি বিকশিত করে হিঃ হিঃ করে হাসতে হাসতে কানাই বলল : মাইরি, রাগলে তোমাকে কি সোন্দর দেখায়। হ্যাঁ, মতবব কি তা বুঝতে পারনি—সত্যি ? ভূতের বাগানে আমরা দুজনে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি— এ তল্লাটে এখন কেউ নেই······

মুখখানা শক্ত করে রুক্ষ কণ্ঠে মায়া বলল : তোমার মতন ইতরের সংগে এখানে দাঁড়িয়ে নেকামী করবার আমার সময় নেই, ভালয় ভালয় পথ ছেড়ে দাও কানাইদা, নইলে······

অবলার এরূপ অশোভন শৌর্যে কানাইয়ের পৌরুষ উদীপ্ত হয়ে উঠল, মুখের হাসি মুখেই বিলীন করে সামনের দিকে একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল সে : নইলে করবে কি মায়ারাণী ? জানো, এখন আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছ তুমি—চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ এখানে আসবে না ; আর এলেও এর পর এমন খোয়ার করব যে বাড়িতে সেঁধুবার আর রাস্তা পাবে না ; লোকের সামনে জাঁক করে বলয়ো—মেয়েটা নষ্ট, নৈলে ভূতের বাগানে পীরিত করতে আসে ? আজ ঝগড়া হয়েছে তাই—

কানাইকে আর কথাটা শেষ করতে হোল না। তার কল্পিত বিশ্রী কথাটা শুনেই মায়ার চোখ দু'টো দপ্ দপ্ করে জলে উঠল এবং এই ধরণের কথার প্রতিবাদের যা মোক্ষম অস্ত্র—দুর্জয় সাহসে তাই সে প্রয়োগ করে বসল। কথাগুলো বলতে বলতে কানাই আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছিল, এ অবস্থায় মায়ারই পিছিয়ে যাবার কথা, কিন্তু সে এটাকে সুবিধা ভেবেই তার নিটোল সুডৌল ডান হাতখানি বিদ্যুদ্বেগে চালিয়ে দিল কানাইয়ের মুখের থুতনিটি লক্ষ্য করে। যন্ত্রণাব্যঞ্জক একটা অস্ফুট আওয়াজ করে কানাই ঠোঁট দু'টো চেপে ধরল।

শৈশব থেকেই এই মেয়েটির অটুট স্বাস্থ্য ও স্বাভাবিক দৈহিক শক্তির খ্যাতি ছিল—এই দুইটি ঐশ্বর্যের জন্যই তার সৌন্দর্য এতখানি চক্ষুচমৎকারী হয়ে উঠেছে। এই উদ্যানে বসেই সে কল্পনার দৃষ্টিতে অতীত বাংলার তেজস্বিনী কিশোরীদের সাহস ও শক্তিদীপ্ত মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করেছে—সেই সংগে তাদের আদর্শে নিজের প্রকৃতিকে গড়ে তুলতে চেয়েছে, কাজেই মুখের সামনে এক অবাঞ্ছিত যুবার এই ইতর উক্তি অম্লান বদনে পরিপাক না করে হাতে হাতেই সে উপযুক্ত উত্তর দিয়ে কল্পনাকে বাস্তব করে তুলল। শুধু তাই নয়, পরক্ষণেই ক্ষিপ্রহস্তে পায়ের কাছ থেকে একখণ্ড পাথর তুলে নিয়ে কানাইয়ের মাথার দিকে টিপ করে জোর-গলায় হুমকি দিল: হাতের ঘা শুকাতে না শুকাতেই আবার ইতরামি সুরু করেছ, কিন্তু ভুলে যেও না—আমি ভয় পাবার মেয়ে নই; ফের বাড়াবাড়ি করলেই এই পাথর ছুঁড়ে মুখখানা জন্মের মতন থেঁতো করে দেব।

কানাইয়ের জানা ছিল, মেয়েরা সহজে হাত চালায় না, আর চালালেও বড় জোর ঠেলা পর্যন্ত তার এক্তিয়ার। কিন্তু নারীর পেলব হাতের চাঁপার কলির মত আঙুলগুলি যে এমন শক্ত ঘুঁষিতে

পরিণত হয়ে থুতনির দু'খানা ঠোঁটকে আড়ষ্ট করতে পারে, এ ধারণা তার কোন দিনই ছিল না। এর পর মুখখানা চেপে প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে চোখ দু'টো পাকিয়ে তাকাতেই মাথা তার ঘুরে গেল ; বুঝতে বিলম্ব হল না যে, ঘুষি চালিয়ে যে-মেয়ে তার মত বলিষ্ঠ জোয়ান ছেলের দু'খানা ঠোঁট জখম করতে পারে, পাথর ছুঁড়ে মাথাটাকে ঘায়েল করা তার পক্ষে অসাধ্য ত নয়ই—বরং যে ভাবে ছোঁড়ার মত জায়গার ব্যবধান রেখে রুখে দাঁড়িয়েছে তাতে তার দিকে আর এক পা এগিয়ে গেলেই, মুখে যা বলেছে কাজেও তা হাসিল করতে কিছুতেই সে পিছপাও হবে না। মনে মনে কানাই নিজের বুদ্ধিকেই দোষ দিল—সুযোগটাকে ঠিক মত সে কাজে লাগাতে পারেনি, সুরুতেই মেয়েটাকে রাগিয়ে দিয়ে সে মস্ত ভুল করেছে ; এখন তাকেই নীচু হয়ে ব্যাপারটার মোড় ফেরান চাই। তাই সে তৎক্ষণাৎ অত বড় অপমান অনায়াসে পরিপাক করে রুষ্ট ও ক্লিষ্ট মুখে হাসি ছড়িয়ে বলে উঠল : মারতে ইচ্ছা হয় মারো—মাথা আমি পেতে দিচ্ছি ; তা বলে তোমার সংগে মারামারি করবার ইচ্ছে আমার নেই জেনো। সত্যি, আমায় ত চেনো, ঠাট্টাঠুট্টি ভালোবাসি—কথার ছলে ঠাট্টাটা একটু বে-ফাঁস বলে ফেলেছিলুম ; কিন্তু তাই বলে অমন করে ঘুষি মারতে হয় ? দেখ না—দু'টো ঠোঁটের গোড়ায় রক্ত জমে গেছে, দেখতে দেখতে ফুলে উঠেছে ? বা-ব্বা ! তোমার হাত এতো শক্ত, আর ঘুষির এতো জোর...

এক নিশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ফেলল কানাই, আরও কি বলতে যাচ্ছিল ; কিন্তু এইখানে বাধা দিয়ে মায়া বলল : জোরটা চেষ্টা করেই করতে হয়েছে—ইজ্জতে ঘা পড়লে যাতে রুখতে পারি ! তোমার যদি লজ্জা থাকত, হাত পোড়ার পর আর এমন করে মুখ পোড়াতে আসতে না।

দৃঢ় মুষ্টিতে ধৃত পাথরখানা কানাইয়ের মাথার দিকে টিপ করেই মায়া কথাগুলি বলল! কানাই কোঁচার খুঁটে আহত থুতনিটা চেপে ধরে মায়ার কথাগুলি শুনছিল, এখন কাপড় সরিয়ে চোখের দিকে তুলেই শিউরে উঠল; পরক্ষণে সেই দৃষ্টিতে মিনতি ফুটিয়ে সে বলল: তোমার রাগ এখনো পড়লো না মায়া—আমাকে এমন করে মেরেও? আমি ত স্বীকার করছি—খুবই অন্যায় হয়েছে, কিন্তু তার শাস্তিও তুমি কম দাওনি, এই ত্যাখ—কি করেছ! ··বলতে বলতে কানাই তার কোঁচার কুঞ্চিত অংশটা খুলে মায়াকে দেখাল।

মায়ার চোখ দু'টো বড় হয়ে উঠল! সে বুঝল, কানাইয়ের নিচের ঠোটটা দাঁতে লেগে কেটে গেছে, সেই রক্তে কোঁচার খুঁটের খানিকটা লাল হয়ে উঠেছে। অমনি তার নারীমন বেদনায় টন্-টন্ করতে লাগল, তথাপি সে লক্ষ্য হারাল না, কানাইকে সে ভাল ভাবেই চেনে এবং আজ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে, এখনো সে তা থেকে নিষ্কৃতি পায়নি। তাই হাতের টিপটি বজায় রেখে এবং মনের বেদনা মুখে না ফুটিয়ে দৃঢ় স্বরেই সে বলল: তোমার ভাগ্য ভাল যে দাঁতে লেগে ঠোঁটটা একটু কেটেছে—দাঁত ভাঙ্গেনি একটাও।

আর্তস্বরে কানাই বলল: দাঁত ভাঙ্গলেই তুমি বোধ হয় বেশী খুসি হতে—নয়? কিন্তু হাতের পাথরখানা ধরেই থাকবে, নামাবে না?

মুখখানা শক্ত করে মায়া জানাল: না, তোমাকে বিশ্বাস কি? তুমি যেমন আছ ঠিক অমনি দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না আমি বাগান থেকে বেরিয়ে যাই—

কণ্ঠস্বর অত্যন্ত কোমল করে সবিনয়ে কানাই বলল: বিষহরির দিব্য করে বলছি মায়া, আমাকে বিশ্বাস কর। এমন কোন কাজ আর আমি করব

না—ঐ পাথরখানা যার জন্যে ছোঁড়বার দরকার হবে। ক'দিন ধরেই আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি—নিরিবিলিতে গুটিকয়েক কথা তোমাকে শোনাব বলে, সে কথাগুলো তোমার ভালোর জন্যেই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কানাইয়ের মুখখানার দিকে চেয়ে পাথর-শুদ্ধ হাতখানা নামিয়ে মায়া বলল: কিছু বলবার থাকলে তুমি বড়দাকে বলোনি কেন? বড় বৌদির সংগে ত তোমার কথা চলে—তাঁকেও ত বলতে পারতে।

কানাই বলল: সেদিনের হাংগামার পর আমার সংগে যে ওঁরা আর কথা কন না—বড় বৌদি আমাকে দেখলেই কথা বলবার ভয়ে তাড়াতাড়ি সরে যান।

মায়া বলল: হাংগামা ত আমাকেই নিয়ে—তবুও আমার সঙ্গে কথা বলা চাই! কি এমন কথা শুনি?

কানাই একটু উৎসাহিত হয়ে বলল: কথাটা হচ্ছে তোমার বাবার সেই দেনাটা নিয়ে। আমার মামা নালিশ করে শমন চেপে ডিক্রী পেয়েছে। এর পর তোমাদের সর্বস্ব নিলেম করে নেবে।

স্থির হয়ে মায়া কথাগুলো শুনল, কিন্তু কোনরূপ চাঞ্চল্য বা ঔৎসুক্য-প্রকাশ না করে উপেক্ষার সুরে বলল: নেয় নেবে, এ কথা আমাকে শুনিয়ে কি হবে? শুনেও আমি মুখ বুজিয়ে থাকব—কাউকেই এ কথা বলব না।

এত বড় একটা বিপদের কথা শুনেও চেপে যাবে—কাউকে বলবে না?

কি দরকার? তোমার মামা ত এ বিপদের কথা জানিয়েই গেছেন—সর্বস্ব যাবে এ ত জানা কথাই!

তবুও এর বিহিত করা ত চলে ? তুমি মনে করলেই—

এ পর্যন্ত বলেই মায়ার পানে চাইতে তার জলন্ত দৃষ্টিতে চমকিত হয়ে কানাই মুখ বন্ধ করল। সেই দৃষ্টি কানাইএর মুখে নিবদ্ধ করে মায়া ব্যঙ্গের সুরে বলল : আমার মনে করবার কিছু নেই ; কিন্তু তুমি কি মনে করে কথাটা আমার কাছে পেড়েছ সেটা বোঝবার মত বুদ্ধি আমার ঘটে অবিশ্যি আছে। তবে তুমি যা ভাবছ তা হবে না। সেদিন বড়দা যে কথা বলেছেন, আমারো সেই কথা জেনো। আমি সাত জন্ম আইবুড়ো থাকবো তবুও···

কথাটা আর মায়া শেষ করল না, কিন্তু কথার সংগে সংগে মুখ-চোখ ঘৃণায় বিকৃত করে যে ভংগিতে সে কানাইএর পানে তাকালো, তাতেই বাকি কথাটা বুঝে নিতে কানাইয়ের বিলম্ব হোল না। সে তখন সজোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল : আমার দুর্ভাগ্য মায়া, এত করেও তোমার মন পেলুম না। ঘর-বাড়ী বিষয়-আসয় টাকা-কড়ি মান-সম্ভ্রম—কি আমার নেই বল ? শুধু বানিয়ে বানিয়ে ছড়া বাঁধতে পারে বলে মেগার জন্যেই তুমি পাগল ? কিন্তু ছড়ায় কি পেট ভরবে ? তার পর ওদিকে শুনচি গুণের তার চারা নেই—একটা বেশ্যাকে নিয়ে ঢলাঢলির পরও তুমি তাকে···

এ কথায় মায়ার চোখে পুনরায় বহ্নির আলো ঝলমল করে উঠল। তর্জনের সুরে সে ধমক দিল : থামো বলছি—ইতরামিরও একটা সীমা আছে। মনে রেখো, তোমার মা আর মামা ঢাক পিটে ও-কথা রটালেও কেউ বিশ্বাস করবে না। চাঁদের কলংক আছে, পৃথিবীর কোন কলংক কস্মিন্ কালেও মৃগদাকে স্পর্শ করবে না—যত চেষ্টাই তোমরা কর।

বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে কথাগুলি বলেই মারা অকুতোভয়ে কানাইয়ের পাশ কাটিয়ে বিদ্যুৎ-ঝলকের মত চলে গেল। স্তব্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে বিহ্বল দৃষ্টিতে অপস্রিয়মান মূর্তিটির পানে চেয়ে রইল কানাই।

*　　　*

*

দুর্গোৎসবের মত শ্রীপঞ্চমীও যাত্রা-সম্প্রদায়ের বিশেষ স্মরণীয় মরশুম। পৌষ মাসের শেষ থেকেই এই উৎসবের জন্য বড় বড় দলগুলির বায়না হয়ে যায় এবং দালালদের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়। বউরাণীর দলে বহুদিন পরে একখানি উৎকৃষ্ট পালা খোলা হচ্ছে—লোকের মুখে-মুখেই খবরটা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ে। নদীয়ার রাজবাড়ীতে তৎকালে কলিকাতার শ্রেষ্ঠ দলকেই সর্বোচ্চ হারে বায়না করা হোত—তখনকার মহারাজা যাত্রার সমঝদার শ্রোতা ছিলেন, আরম্ভ হতে শেষ পর্য্যন্ত সপারিষদ আসরে বসে সমগ্র পালা শুনতেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলী এবং নাট্য-রসিক-সমাজও আমন্ত্রিত হয়ে আসরের শোভাবর্ধন করতেন। এহেন আসরে রসোত্তীর্ণ পালার খ্যাতি সারা বাঙলায় ছড়িয়ে পড়ত, পালারচয়িতা এবং দলের অধিকারী বিশেষ ভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত হতেন। এই জন্য এ পর্যন্ত কোন সম্প্রদায় সুপরীক্ষিত ও প্রশংসিত পালা ভিন্ন আনকোরা নূতন কোন পালার উদ্বোধন করে এখানকার আসরে ভাগ্যপরীক্ষায় সাহস পাননি। কিন্তু বউরাণীর বিচারসিদ্ধ যুক্তির সংগে অন্য সম্প্রদায়গুলির মতসাম্যের অভাব প্রায়ই দেখা যেত। এবারকার নূতন পালাটির সংগে গোড়া থেকেই তিনি সুপরিচিত থাকায় এবং তার মহলাগুলি পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ ঘটায় অন্যান্য স্থানের বায়না ত্যাগ করে স্থানীয় রাজবাটিতে শ্রীপঞ্চমী-বাসরে নূতন গীতাভিনয়ের বায়না নেবার নির্দেশ দিলেন। এই সূত্রে

সহরে রীতিমত সাড়া পড়ে গেল, দলের মধ্যেও নূতন উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো।

বউরাণী মৃগেনকে বললেনঃ আপনার পানে চেয়েই এত বড় দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছি। কষ্টি-পাথরে ঘষে যেমন সোণা যাচাই হয়,—নদের রাজবাড়ী আর নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর সামনে যাত্রার পালারও সে অবস্থা ঘটে। এঁদের বিচারে পালার সুখ্যাতি হলে তার আর মার নেই। এক পালা লিখেই আপনি নামজাদা হয়ে যাবেন, আমার দলও ফেঁপে উঠবে। এখন আমার বরাত আর আপনার হাত-যশ।

মৃগেন সবিনয়ে বলল: যশ যদি হয় আপনার বরাতেই হবে আমি এর জন্যে নিজের যোগ্যতাকে মোটেই বাড়াতে চাইনে। গুণী লোকজন যোগাড় করে অজস্র পয়সা ঢেলে আপনি পালাখানিকে জাঁকাবার যে ব্যবস্থা করেছেন, আমার পক্ষে সে ত কল্পনাতীত ব্যাপার! আমি কী আর করেছি, খানকতক কাগজ, এক দোত কালি আর একটা কলম—এই ত আমার মূলধন মা, এই নিয়ে হিজিবিজি লিখে গেছি বই ত নয়, কিন্তু আপনি এর পেছনে কত টাকা ঢেলেছেন বলুন ত? মোটা-মোটা মাইনে-করা অত সব লোক, নতুন নতুন যন্ত্রপাতি, আগাগোড়া দামী দামী পোষাক —নিজের চোখেইত সব দেখেছি, বই যদি জমে আপনার জন্যেই।

মৃদু হেসে বউরাণী বললেনঃ কিন্তু আপনার ঐ সামান্য মূলধনে এক অমূল্য ধন তৈরী করতে পেরেছেন বলেই না আমি এর জন্য এত পয়সা ঢেলেছি। খনি থেকে মণি যখন বেরিয়ে আসে, তাকে শোধন করতে অনেক কিছু করতে হয় জানি, কিন্তু তাতে মণির গৌরবই বাড়ে। যত খরচই আমি করি, আপনার লেখা বইয়ে বস্তু থাকলে তবে তা সার্থক হবে, সেটা জেনেছি বলেই না দরাজ হাতে খরচ করছি।

পাশের ঘর থেকে এমন সময় সীতা বেরিয়ে এসে বলল: আপনি যে বিনয়ে কালিদাসকেও হারিয়ে দিলেন মৃগেন বাবু! কাগজ কালি আর কলম সম্বল করে খালি হিজিবিজি লিখেছেন না কি? সত্যই কি আপনি ধারণা করতে পারেননি আপনার পালাটা কি ভাবে উতরাবে? জানেন, অশোক বাবু পর্য্যন্ত আপনার লেখার ভক্ত হয়ে পড়েছেন—অভিনয়ে যাতে কোন দিক দিয়ে খুঁৎ না থাকে তার জন্যে তিনিও উঠে-পড়ে লেগেছেন?

মৃগেন বলল: আপনি যে বিনয়ের কথা বললেন, তা, সত্যিকার বিনয় দেখালেন অশোক বাবু—আমার মতন শিক্ষাহীন অভাজনের লেখার সুখ্যাতি তিনি যখন সবার সামনে করেন, লজ্জায় আমি এতটুকু হয়ে যাই!

ভ্রূভংগি করে সীতা বলল: ঐ লজ্জাটি এখন আপনাকে খাটো করতে হবে। লেখকদের অতটা বিনয় আর লজ্জা সত্যিই অশোভন। এখন শুনুন—পালাটার উপরি উপরি গোটা কয়েক ফুল রিহার্সেল দিন নিজে বসে থেকে, শেষেরটা চুল-পোষাক পরে সেজে-গুজেই করা চাই; আমরাই আগাগোড়া দেখে সেদিন বিচার করবো, কি বলেন?

বউরাণীর দিকে চেয়ে মৃগেন বলল: মা যেমন বলবেন তাই হবে। তবে এ প্রস্তাব খুব ভালো।

স্মিতমুখে বউরাণী বললেন: আপনার পালা খোলা না-হওয়া পর্যন্ত সীতার চোখে আর ঘুম নেই; কিসে অভিনয় ভাল হবে, কি করলে গোড়া থেকেই পালা জমে যাবে, সবাই ধন্য ধন্য করবে—এ ছাড়া ওর আর কোন ভাবনা নেই—অথচ, প্রথমে আপনাকে ও-ই পাত্তা দিতে চায়নি।

মুখখানা ভার করে সীতা বলে উঠল: বা:রে, তখন বুঝি জেনেছিলুম উনি বর্ণ-চোরা আম—এত গুণ সব চেপে রেখেছিলেন? এখন যদি

তদ্বিরের দোষে ওর বইএর অপযশ হয় আমাদেরই লজ্জা রাখবার আর জায়গা থাকবে না যে! সেই জন্যই ত আমার এত ভাবনা।

বউরাণী বললেন: বেশ ত, যে রকম করে মহলা দিলে পালা ভাল করে উতরাবে মনে কর, সেই মত ব্যবস্থাই তুমি করবে—তোমার কথার ওপরে দলের কেউ কথা বলবে না।

বিস্ফারিত চোখে মৃগেনের দিকে চেয়ে সীতা বলল: শুনলেন ত মৃগেন বাবু, তাহলে আসুন একটা চার্ট তৈরী করা যাক্—কোন্ দিন কোন্ সময় রিহার্সেল বসবে, ভুলগুলো কি ভাবে নোট করা হবে। আপনার কিন্তু খুব শক্ত হওয়া চাই—যত বড় য়্যাক্টর বা গাইয়ে হোন না কেন, ভুল হলে তখুনি ধরে দেবেন—আপনি যখন অথার, তার ওপর অভিনয় আর গান দু'টোটেই ওস্তাদ—আপনার কাছে কারুর চালাকি চলবে না। আসুন ত, চার্টটা এখনি তৈরী করে ফেলি দু'জনে বসে।

সীতার পীড়াপীড়িতে মৃগেনকে তার পিছু-পিছু পাশের ঘরটিতে যেতে হলো। এখানি সীতার পড়বার ঘর। কাচের দু'টি আলমারীতে সাজানো বইগুলি ঝক-ঝক করছে। দেওয়ালে দেশের মনীষীদের ছবি। সুশ্রী একখানি সেক্রেটেরিয়েট টেবিল, কুসন দেওয়া চেয়ারগুলির উপর কারুকার্য-খচিত সাদা আবরণ। সামনের চেয়ারে মৃগেনকে বসিয়ে সীতা বিপরীত দিকে তার চেয়ারে বসল। প্যাড ও ফাউণ্টেন পেনটি মৃগেনের সামনে এগিয়ে দিয়ে বলল: লিখুন।

মৃগেন কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিল। ঢোঁক গিলে জিজ্ঞাসা করল: অশোকবাবুকে আজ দেখছি না যে?

এক-মুখ হেসে সীতা বলল: শোনেননি বুঝি—তিনি লাইব্রেরীতে গেছেন কি একখানা বইয়ে সিপ্লটিস্থ সেঙ্গুরীর বাংলার অস্ত্র-শস্ত্র আর যোদ্ধা-

দের পোষাক-পরিচ্ছদের ছবি বেরিয়েছে—সেটা খুঁজে বের করতে! ওঁর একান্ত ইচ্ছা, সেই ছবির আদর্শে আপনার নাটকের পোষাক-পত্র ও অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী হয়।

আনন্দে ও বিস্ময়ে মৃগেনের মুখভংগি বদলে গেল। তার বইএর জন্য অশোক বাবুর মত একজন উচ্চশিক্ষিত পণ্ডিত ব্যক্তির এতখানি আন্তরিকতায় সে যেন অভিভূত হয়ে পড়ল, সত্যই এটা তার পক্ষে একেবারেই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত। সীতার দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে সে বলল ঃ আমি কিন্তু অবাক হয়ে যাচ্ছি, মুখে কথা ফুটছে না!

ঠিক এই সময় প্রকাণ্ড একখানা বই হাতে করে অশোক মল্লিক সবেগে ঘরে ঢুকল, তার পর বইখানা টেবিলের উপর রেখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠল ঃ এই যে মৃগেন বাবু, দেখুন আপনার জন্যে পাঠাগার তোলপাড় করে এই গন্ধমাদন বয়ে এনেছি। সীতার কাছে আমার অভিযানের কথাটা শুনেছেন বোধ হয়?

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে অশোকের দিকে চেয়ে কুণ্ঠিত ভাবে মৃগেন উত্তর করল ঃ এইমাত্র সেই কথাই হচ্ছিল! সত্যি মল্লিক মশাই, আপনি যে আমার বইয়ের জন্যে এমন করে মাথা ঘামাচ্ছেন আমি তা ভাবতে পারিনি। আপনার ঋণ—

পাশের চেয়ারখানায় বসতে বসতে সহাস্যে অশোক বাবু বলল ঃ না, আপনাকে নিয়ে আর পারা যায় না দেখছি—নিজের সম্বন্ধে একেবারে অচেতন। আরে মশাই, বই যদি আপনার উতরে যায়—একটা রেকর্ড তৈরী করে, তাহলে আপনার কাছে এঁরাই থাকবেন ঋণী। জানেন ত, লেখার নেশাটা নিজেরও আছে। আপনাকে দিয়ে এখন লাইনটা যদি ক্লীয়ার করতে পারি, এর পরে আমার পক্ষে এগোনো সহজ হবে। আপনার

সংস্পর্শে এসে আমি লোক-সাহিত্যের একটা দিক আবিষ্কার করে ফেলেছি তা জানেন? এখন আসুন—এই বইখানার ছবিগুলো আপনাকে দেখাই—এর পর ড্রেসারকে ডেকে এ থেকে ডিজাইন নেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

টেবিলের উপর বইখানা খুলে ফেলল অশোক মল্লিক—সীতা ও মৃগেন সংগে সংগে সকৌতূহলে ঝুঁকে পড়ল প্রত্নতত্ত্বের সেই বিরাট ইতিহাসখানার উপরে।

সংসারে এক শ্রেণীর মানুষ আছে-যারা ভাবে, নিয়মের রাজ্য যেমন নিয়ম মেনে চলেছে, দিনের পর রাত—তার পর দিন আসে, একটা ঋতুর পর ঠিক তার পরের ঋতুটি এসে হাজির—এর জন্যে কোন গোলযোগ নেই, দিব্যি স্বাভাবিক ভাবে এই পরিবর্তন ঘটছে—কোথায় এতটুকু ফাঁক বা গলদ নেই;—মানুষের জীবনযাত্রাও এমনি নিয়ম মেনে চলবে; যার যা প্রাপ্য ঠিকমত পাবে, যার সংগে যার যেমন বাধ্য-বাধকতা—ঠিক তাই বজায় থাকবে, কেউ কাউকে ফাঁকি দেবে না—কাজের মজুরীর জন্যে ঝগড়া-ঝাঁটি করতে হবে না—ঐ প্রাকৃতিক নিয়মের মতই গড়িয়ে যাবে—যেমন হয় দিনের পর রাত, রাতের পর দিন, একটা মাসের পর আর একটা মাসের আসা-যাওয়া; যারা মনে মনে নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রার এই সহজ গতির স্বপ্ন দেখে থাকে—পীতাম্বর অধিকারীকেও এই দলে ফেলা যায়।

নিষ্ঠাবান ভক্ত যেমন ভক্তির সংগে দেবপূজা করে তৃপ্তি পায়, ভাবে—এই তার ধর্ম ও সাধনা—জীবনযাত্রার একটা স্বাভাবিক পন্থা। পীতাম্বর

তেমনি তার পেশাকে জীবনের একটা সাধনা ভেবেই আনন্দ পান। তাঁর ধারণা—নিষ্ঠার সংগে তিনি করবেন কাজ, সেই দিকেই তাঁর মনটি ষোল আনা লিপ্ত থাকবে। আর এই কাজের যিনি উপলক্ষ, শ্রদ্ধার সংগেই তাঁর ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দেবেন—এই নিয়ে দর-কষাকষি বা ভাঁড়াভাঁড়ির কি আছে? আর সাধনার উপচার—দেবতার প্রতিমা, পূজার ফুল—এ সব কি দর করে কেনা-বেচা চলে?

এ সব ব্যাপারে পীতাম্বর বরাবরই এক কথার মানুষ। এ পর্য্যন্ত কোন দিন তাকে কেউ দরাদরি করতে দেখেনি। সে-বার আচার্য বাবুদের বাড়ী থেকে লক্ষ্মী প্রতিমা গড়বার বরাত নিয়ে আসে তাঁদের এক বিজ্ঞ গোমস্তা। জিজ্ঞাসা করলেন: 'দাম কি নেবেন অধিকারী ঠাকুর?' পীতাম্বর বললেন: দাম নয়, দান বলুন। কাজ ত আপনাদের নতুন নয়—আমার কাছেই না হয় নতুন এসেছেন। যা ন্যায্য হয় তাই দেবেন—হাত পেতে নেব।' কিন্তু গোমস্তা বাবু পীড়াপীড়ি করলেন—'যেটা ন্যায্য আপনিই বলুন অধিকারী—কি রকম প্রতিমা হবে সে ত আগেই বলেছি।' পীতাম্বর বললেন—'তাহলে দশ টাকাই দেবেন।' দর শুনে গোমস্তা মনে মনে খুসিই হয়েছিলেন, কারণ, যে রকম প্রতিমার বাবুদের বরাত, তাতে পীতাম্বর দর অন্যায় বলেনি, এর চেয়ে কম দরে ভাল প্রতিমা পাবার কথা নয়। কিন্তু সকলেই ত আর পীতাম্বর অধিকারী নয়—পাটোয়ারী বুদ্ধি চালিয়ে অনুরোধ করলেন—'দু'টো টাকা কমিয়ে আটে নামুন—এই নিন বায়না।' অধিকারী তখন ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন—বায়নার টাকা দু'টো উঠোনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন—'বায়নার দরকার নেই। পুজোর আগের দিন মায়ের প্রতিমা নিয়ে যাবেন—এক পয়সাও দিতে হবে না।' গোমস্তা অবাক্! এর পর অনেক তোষামোদ আর ত্রুটি

স্বীকার করে—অধিকারীর আগের কথা বজায় রেখে একটা নতুন শিক্ষা নিয়ে ফিরে গেলেন তিনি। এমনি অনেক নজির পাওয়া যায় পীতাম্বর অধিকারীর দীর্ঘ জীবন-যাত্রায়।

কিন্তু এ-ভাবে নিয়মের তালে তালে পা ফেলে অনেক জায়গায় অধিকারীকে ঠকতেও হয়েছে ; তার জন্যে অদৃষ্টে দুর্ভোগও কম আসেনি —কিন্তু পীতাম্বর তাতে বিচলিত হননি। এ দিক্ দিয়ে তাঁর ধারণা হচ্ছে —জীবনে যেটা পাবার কথা, সেটা যে কোন পথে আসবেই। এক জন ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করলেও, নিয়মের তোষাখানায় সেটা সঞ্চিত হয়ে থাকবেই—এক সময় সুদে-আসলে আর এক জনের হাত দিয়ে সেটা ঠিক হাতে এসে যাবে।

পরেশ পালের কাছে প্রতারিত হয়ে যদিও পীতাম্বর অধিকারী প্রথমে বহ্নির মত জ্বলে উঠেছিলেন, কিন্তু তার পর নিজেকে সামলে নিয়ে নিয়মের যিনি অদৃশ্য চালক—তাঁরই অমোঘ ইচ্ছায় অধীনে আপনাকে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এবারকার আঘাতটা প্রথমেই হৃদয়ে একটা প্রচণ্ড ঘা দিয়েছিল—যেটা তাঁর দেহের পক্ষেও মারাত্মক হয়ে ওঠে। অর্ধাহারে—অনিদ্রায়—উদ্দাম একটা উৎসাহকে সাথী করে দিনের পর দিন—অর্ধরাত্রি পর্য্যন্ত তুলি চালিয়ে যে কঠোর সাধনা তিনি করেছিলেন, তার বেদনাদায়ক ব্যর্থতা—তিনি উপেক্ষা করতে চাইলেও দীর্ঘ দিনের অনিয়মজনিত ত্রুটিগুলি সময় বুঝে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। হাতে একটি পয়সা নেই, যে উৎসাহ বার্ধক্যক্লিষ্ট দেহটাকে কোন রকমে কর্মলিপ্ত করে রেখেছিল,—সেও অদৃশ্য হয়েছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি এক সংগেই বুঝি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—হস্ত-পদ অসাড়, চক্ষুর দৃষ্টি নিষ্প্রভ, চলার পথে পদক্ষেপেরও সামর্থ নেই, আশ্রয় নেবার মত স্থান নেই, প্রবৃত্তিও নেই। তথাপি যেন

সর্বনিয়ন্তার ওপর অভিমান করেই পীতাম্বর অধিকারী ক্ষিপ্তের মত তাঁর দুর্বহ দেহটাকে জোর করে ঠেলে নিয়ে যেতে চান সামনে—সামনে।

দু'টো দিন দু'টো রাতের পর,—এই অভিমানী উন্মত্ত পথিকের উদ্দেশ্যহীন যাত্রা যে স্থানে সহসা স্তব্ধ হয়ে মহাযাত্রিকের শয্যা রচনা করল, সে স্থানটি তখন বহিরাগত অসংখ্য যাত্রি-সমাগমে বিরাট এক মেলায় পরিণত হয়েছে। পথের ধারে এক প্রাচীন ব্যক্তি—আকৃতিগত বৈশিষ্টটুকু যার লোকচক্ষুকে আকৃষ্ট না করে পারে না—সহসা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়তেই চার দিক থেকে লোক-জন ছুটে এলো এবং এ ক্ষেত্রে যেটা স্বাভাবিক—তাই ঘটল। অর্থাৎ উৎসাহী মানুষগুলি কৌতূহলের আগ্রহে মূর্চ্ছাতুর মানুষটিকে চার দিক্ দিয়ে এমন ভাবে ঘিরে দাঁড়াল যে বায়ু সঞ্চালনের পথটুকুও বুঝি বন্ধ হয়ে যায়।

—তাই ত হে—কি হোল ?

—আসতে আসতে হঠাৎ কেন পড়ে গেল ?

—বিদেশী বলে মনে হচ্ছে যে !

—কিন্তু ভদ্দর লোক—

—আরে বামুন বামুন—ঐ যে গায়ের জামার ফাঁক দিয়ে গলায় পৈতেটা দেখা যাচ্ছে।

—তাহলে বদ্দি কিংবা যুগীও হতে পারে !

মূর্চ্ছিত মানুষটিকে ঘিরে কৌতূহলী বিজ্ঞদের এই ভাবে গবেষণা চলছে, কিন্তু তাকে তুলে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাওয়া কিম্বা সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা সম্বন্ধে কেউ ব্যস্ত নয়—স্পর্শ করতেই তারা যেন সংকুচিত।

কে ও কী

সতেরো-আঠোরো বছর বয়েসের একটি ছেলে একখানা রামপ্রসাদী গান আপন মনে গাইতে গাইতে এই পথে আসছিল। ভীড় দেখে থমকে দাঁড়াল সে। তার পর—যেই শুনল, একটা অচেনা লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে—মারা গেছে মনে করে কেউ ছুঁতে ভরসা করছে না,—অমনি ছেলেটির চেহারা যেন পালটে গেল। কোঁচাটা ফর্-ফর্ করে খুলে কোমরে বেঁধেই ভীড়ের ভেতরে সেঁধুল—সংগে সংগে মুখখানা বেঁকিয়ে চড়া সুরে বলল: ছোঁবে না ত সংয়ের মতন ঘিরে দাঁড়িয়ে আছ কি করতে শুনি? পথ ছাড়—জানো ত ও সব ছোয়া-ছুঁয়ির পরোয়া আমি করি নে!

জনতার মধ্যে অমনি একটা গুঞ্জন উঠল: 'ওরে, কেষ্টা—বকা কেষ্টা! সন্ধান করে ঠিক এসে জুটেছে।'

এ অঞ্চলে ছেলেটি সব-চিন! নাম কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। কিন্তু জনসমাজে 'বকা কেষ্টা' নামে পরিচিত। যেহেতু ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোই তার স্বভাব। ভয়-ডরের পরোয়া রাখে না, লোকনিন্দা গ্রাহ্য করে না। যে কোন জাতের আপদ-বিপদে বুক দিয়ে পড়ে—নিজের ঘর-বাড়ী কাজ-কর্ম ছেড়ে প্রয়োজন বুঝে পরের চরকায় তেল দিতে এর আর যুড়ি নেই; শব-সৎকারে এমন করিতকর্মা লোক অল্পই দেখা যায়—খবর গেলেই হোল, কোমরে গামছা বেঁধে এসে হাজির। পড়া-শোনার দিক্ দিয়ে শিক্ষা এর সামান্য কিন্তু দেহের ও মনের শক্তি অসামান্য। মাতুলালয়ে মানুষ—মামাদের অবস্থা স্বচ্ছল, কিন্তু এই অমানুষ ভাগ্নেটির, জন্যে তাঁরা খুবই চঞ্চল—দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। যেহেতু, কেষ্টো শাসন মানে না এবং মামাদের ওপর সম্পর্কগত অধিকার ত্যাগ করতেও রাজি নয়। অগত্যা মামার বাড়ীতে থেকেও তাকে

যেন 'এক-ঘরে' হয়েই থাকতে হয়। বাইরের একখানা ছোট ঘর মামারা তাকে ছেড়ে দিয়েছেন, সেই ঘরেই মামীরা তার দু'বেলার আহার্য রেখে যান—মামার বাড়ীর সংগে ভাগনের সম্বন্ধ এই পর্যন্ত। দুর্মুখ দুর্জন গোঁয়ার ভাগনের সংগে এইভাবে একটা রফা করে মামারা কতকটা আশ্বস্ত হয়েছেন।

কেষ্টোর গায়ে যেমন অসীম শক্তি, মনেও তেমনি দারুণ সাহস। সবাই এই গোঁয়ার প্রকৃতি ছেলেটিকে এড়াতে চান। তার আবির্ভাব আর হুমকীর সংগেই জনতা পাতলা হয়ে গেল। কেষ্ট ঠেলে-ঠুলে ধাক্কা দিয়ে ভীড় সরিয়ে মূর্চ্ছিত পীতাম্বরের মাথাটি কোলে নিয়ে বসল—মূর্চ্ছিত ব্যক্তির চৈতন্য সঞ্চারের কতকগুলি প্রক্রিয়া তার জানা ছিল; সেগুলি প্রয়োগ করতে করতে সে কাছের লোকটিকে বলল: ঐ দোকান থেকে শীগ্‌গীর এক ঘটি জল আনুন ত!

এক জনের স্থলে তিন জন তখন ছুটল জল আনতে। মুখে-চোখে জলের ঝাপ্‌টা দিতে দিতেই কেষ্ট বুঝল, শুশ্রূষার ফল হয়েছে—সংজ্ঞা ধীরে ধীরে ফিরে আসছে। তখন জনতার দিকে চেয়ে কেষ্ট বলল: ইনি বেঁচে আছেন, আর চেষ্টা করলে এঁকে হয়ত সারিয়ে তোলাও যাবে। কিন্তু এঁকে তুলি কোথায়?

সকলেই নির্বাক্। নিকটেই যাদের বাড়ী বা বিপণি, তারা অতঃপর ধীরে ধীরে সরে পড়ল। এক ব্যক্তি যুক্তি দিল: বাঁচবার আশা যদি থাকে, হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই ভালো।

কেষ্ট বলল: তাহলে একখানা গাড়ী বা পাল্কী আনতে হয়। এর ভাড়াটা আপনারা কেউ দিন, এর পর আমি দোব। আমার ট্যাঁকে দু'আনা মাত্র পয়সা আছে।

কিন্তু কেষ্টোর প্রস্তাব সম্বন্ধে কাউকে উৎসাহী দেখা গেল না—সমবেতদের মধ্যে আরও কয়েক জন এই সময় পা ঘসতে ঘসতে সরে পড়ল।

ঘটনাচক্রে এই সময়ে নূতন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হলো। এমন একখানা বাড়ীর গাড়ীর উপর জনতার দৃষ্টি পড়ল—এ পথে প্রায়ই যার গতিবিধি হয় এবং একই আকৃতির দু'টি বড় বড় তেজীয়ান ঘোড়া ও গাড়ীখানির বাহ্যিক সৌন্দর্য এ অঞ্চলের বাসিন্দাদের সুপরিচিত।

গাড়ীর ঘণ্টাধ্বনি শুনেই এক জন বলে উঠল: 'বৌরাণীর গাড়ী!'

আর একজন সোৎসাহে বলল: 'এক কাজ করলে হয় না—বোলে-কোয়ে ঐ গাড়ীখানায় যদি—'

কথাটা শুনেই কেষ্ট বললে: 'ঠিক বলছেন—ভগবানই গাড়ী পাঠিয়েছেন, ঐ গাড়ীতেই এঁকে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাবো। আপনারা পথ আটক করে গাড়ী থামান। তার পর যা করবার—আমি করছি।'

ইতিমধ্যেই গাড়ীখানা রাস্তা কাঁপিয়ে কাছে এসে পড়ল, তার পর পথের ওপর এতগুলো লোকের সমাগম দেখে কোচোয়ান সবলে রাশ টেনে গাড়ীর গতি থামাল।

গাড়ীর ভিতরে ছিল একমাত্র আরোহী—বৌরাণীর যাত্রা সম্প্রদায়ের নতুন 'অথার' মৃগেন রায়। এই গাড়ী এসে এই অঞ্চল থেকেই ভাগ্যবান্ ছেলেটিকে নিয়ে যায় ও পৌঁছে দেয় এবং ছেলেটি যে কেউ-কেটা নয়—ওস্তাদ লিখিয়ে, ভারি এলেমদার—এরই মধ্যে এ সব কথা জানা-জানি হয়ে গেছে। কাজেই, ছেলেমানুষ হলেও মৃগেনকে সকলেই খুব সম্ভ্রম করে—শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকে চেয়ে চেয়ে দেখে—গাড়ী চেপে যখন এই

রাস্তা দিয়ে সে যাতায়াত করে, কেউ কেউ নমস্কারের উদ্দেশে হাতও যুক্ত করে। কেষ্টোও কতবার এ গাড়ী দেখেছে—গাড়ীর আরোহীকেও। সে-ও শৈশব থেকে যাত্রার ভক্ত—কোথাও যাত্রা হচ্ছে শুনলে আর রক্ষা নেই, সে আসরে কেষ্টোকে হাজির হতে হবেই—অবিশ্যি কোন মহাযাত্রার ব্যাপারে তার আহ্বান যদি না হঠাৎ এসে পড়ে।

আস্তে আস্তে পীতাম্বরের মাথাটি কোল থেকে নামিয়ে কেষ্টই ছুটে গেল গাড়ীর কাছে। মৃগেনও জনতা দেখে ব্যাপার কি জানবার জন্যে নামতে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় কেষ্ট গাড়ীর পাদানি ঘেঁসে মিনতির সুরে জানাল: 'দেখুন, একটি রাহি লোক মারা যেতে বসেছে—হাসপাতালে পাঠাতে পারলে বোধ হয় বাঁচতে পারে। আপনি যদি দয়া করে গাড়ীখানা—'

কেষ্টকে আর কিছু বলবার ফুরসত না দিয়েই মৃগেন বলে উঠল: 'তার জন্যে কি হয়েছে—গাড়ী ত হাসপাতালের সামনে দিয়েই ফিরে যাবে—চলুন ত দেখি—'

ক্ষিপ্রপদে মৃগেন উঠে দাঁড়াল—গাড়ীর দ্বারের ছিট্‌কিনি খুলে দেবার জন্যে সহিস ছুটে আসছিল, কিন্তু তার আগেই মৃগেন সলম্ফে নিচে নেমে পড়ল।

ঠিক এই সময় পীতাম্বরের কণ্ঠ থেকে একটা আর্তস্বর নির্গত হয়ে জনতাকে ক্লিষ্ট এবং মৃগেনকে স্তব্ধ করল: 'অ-মা—মায়া, রে!'

চেনা স্বর, জানা সুর, জপের মন্ত্রের মত অতিবাঞ্ছিত নাম! শুনেই মৃগেনের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত কেঁপে উঠল। পরক্ষণে পথপার্শ্বে শায়িত মূর্তির দিকে পাগলের মত ছুটে গেল। জনতা অবাক্, কেষ্ট পর্যন্ত—ব্যাপার কি?

আর্ত কণ্ঠের পরিচিত স্বর শুনে মৃগেন স্তব্ধ হয়েছিল, এখন যে মুখ থেকে সে স্বর নির্গত হয়েছিল—তার ওপর দৃষ্টি পড়তেই বুঝি ভেঙ্গে পড়বার যো হল। কিন্তু স্থান ও সময় বুঝে মৃগেন তখনি আপনাকে সামলে নিল।

বিপদে মন স্থির করে উপযুক্ত উপায় নির্ধারণে চিরদিনই সে অভ্যস্ত। তাই জনতার সমক্ষে বিচলিত না হয়ে প্রথমেই সে গাড়ী ফিরিয়ে দিল। তার হুকুম পেয়ে কোচয়ান প্রফুল্ল হয়ে এবং সমবেত উৎসাহী মানুষগুলিকে নিরুৎসাহ করে মোড় ফিরিয়ে গাড়ী নিয়ে চলে গেল। তার পর মৃগেন বলল: 'দেখুন, কাছেই আমার বাসা—জায়গা যথেষ্ট আছে। হাসপাতালে নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই; তার কারণ—সকলেই হাসপাতালে যাওয়া পছন্দ করেন না। আর, গাড়ীতে তুললে এঁকে কষ্ট দেওয়াই হবে- তার চেয়ে আসুন আমরা দু'তিন জনে ধরাধরি করেই এঁকে নিয়ে যাই আমার বাসায়।'

কেষ্ট বলল: 'তা যেন নিয়ে গেলেন, কিন্তু চিকিৎসার কি হবে?'

মৃগেন বলল: 'সে ভার আমার। এখন কথা এই - এঁকে সারিয়ে তুলতেই হবে। তার জন্যে আমি আমার বাসাতেই হাসপাতাল বসাব, চিকিৎসার ত্রুটি হবে না, সব খরচ আমার। এখন আসুন, এঁকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি।'

মৃগেনের কথা শুনে সকলেই উৎফুল্ল হয়ে 'সাধু—সাধু' বলে উঠল—আর কেষ্ট হেঁট হয়ে মৃগেনের পায়ের দিকে হাতখানা বাড়িয়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল: 'পায়ের ধুলো দিন আপনি - নতুন এসেছেন, জানি আপনি লিখিয়ে—পালা বাঁধেন, কিন্তু প্রাণটাও যে এত দরাজ তা জানতাম না—পায়ের ধুলো দিন স্যার - মাথায় মাখি।'

তাড়াতাড়ি মৃগেন কেষ্টোর হাতখানি ধরে দৃঢ়স্বরে বলল: 'করছ কি, ছি! ওঠ। গাড়ী থামিয়ে তুমি যদি আমাকে না নামাতে ভাই— তাহলে হয়ত আমার জীবনে এ সুযোগ আসতো না। মরণাপন্ন মানুষকে বাসায় তুলে তাকে বাঁচিয়ে তোলার সৌভাগ্য ক'জনের অদৃষ্টে ঘটে বল ত? এর উপলক্ষ তুমি, আর এঁরা সবাই। এখন চল—ওঁকে হাতে হাতে ধরাধরি করে বাসায় নিয়ে যাই।'

পীতাম্বরের অবচেতন অন্তরে তখন ধীরে ধীরে সংজ্ঞার অস্পষ্ট আলো পড়েছে—তারই আভায় আয়ত দু'টি চোখের মুদিত পাতা অল্প অল্প মুক্ত হচ্ছে; ক্ষীণ দৃষ্টির স্বল্প পরিধির মধ্যে যেন ভেসে উঠছে একখানা মুখ—অতি-বাঞ্ছিত অতিপরিচিত মুখ।

ফুল রিহার্সেলেই মৃগেনের নূতন পালাটির অভিনয় সাফল্যের যেরূপ সম্ভাবনা সূচিত করল, সর্বরসাশ্রিত গীতাভিনয়ের গুণবিচারে অভিজ্ঞ-মহলের সিদ্ধান্তে তা নাকি অপ্রত্যাশিত। এর আগে মহলায় কোন নূতন গীতাভিনয় না কি এভাবে জমে ওঠেনি। দলশুদ্ধ সকলেই আনন্দে উৎফুল্ল। বউরাণী সে দিন ভুরিভোজে সকলকে আপ্যায়িত করলেন।

রিহার্সেলের পর সীতা মুখখানা হাসিতে ভরিয়ে বলল: কেমন, আমি যা বলেছিলুম তাই হলো ত? রিহার্সেলেই এই, এর পর দেখবেন আসরে কি ভাবে উৎরোয়।

মৃদু হেসে মৃগেন উত্তর করল: এর কৃতিত্ব আপনারই, সীতা দেবী!

রিহার্সেলের পর মাঝে একটা দিন, তার পরেই শ্রীপঞ্চমী-বাসর—রাজবাটীতে নূতন পালার উদ্বোধন উৎসব। ফুল রিহার্সেলের পরদিনে

ছোট-খাটো ভুল-ত্রুটিগুলো শোধরাবার ব্যবস্থা হয়েছে। একখানা কাগজে সীতা সেগুলো টুকে রেখেছিল।

কাজ শেষ হলে মৃগেন বলল: আজ একটু সকাল সকাল পালাই, একটা মাস ধরে এক নাগাড়ে খাটুনি গেছে—কাল একবারে রাজবাড়ীতেই হাজির হচ্ছি।

রাজবাড়ী থেকে বউরাণী, সীতা, অশোক চৌধুরী এবং নব নাট্যকার মৃগেন রায়—বিশেষ ভাবেই নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বউরাণী বললেন: তাহলে বাসা থেকেই আপনাকে যাতে রাজবাড়ীতে নিয়ে যায়, তারই ব্যবস্থা করা যাবে।

মৃগেনের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বউরাণী বাড়ীর গাড়ী পাঠিয়ে তাকে রিহার্সেলে আনাতেন, গাড়ী করেই পৌছে দিতেন। তার আপত্তি শুনে হাসিমুখে বলতেন: আপনি আমার দলের 'অথার'—আপনার মানে আমাদের মান। আমরা গাড়ী চড়ে বেড়াব আর আপনি পায়ে হেঁটে ট্যাংওস ট্যাংওস করতে করতে আসবেন—সে কি কখনো হয়? তা ছাড়া, দশজনে যাঁদের নাম শুনলেই দেখতে চায়, তাঁদের উচিত নয় এমন সস্তা হওয়া।

ফুল রিহার্সেলের পরদিন খুঁটি-নাটি কাজগুলি সব দেখে এবং পরদিনের সম্বন্ধে কথা স্থির করে মৃগেন বউরাণীর গাড়ীতে বাসায় ফিরছিল, তার পর বাড়ীর কাছেই চৌমাথার মোড়ে এই বিভ্রাট—কেষ্টোর প্রচেষ্টায় অপ্রত্যাশিত ভাবে মূর্চ্ছিত পীতাম্বরের সংগে তার সাক্ষাৎ ঘটে।

গাঁয়ের লোক কেষ্টো যখন তার স্বভাবসিদ্ধ দরদে মূর্চ্ছাহত অপরিচিত মানুষটির শুশ্রূষার মেতে ওঠে, স্থানীয় লোকগুলি তাতে বিস্মিতও হয়নি—

আর এমন বৈচিত্রও কিছু দেখেনি—যাতে চিত্তে কোন রকম চাঞ্চল্য জাগে। কিন্তু ধনবতী বউরাণীর দলের 'পালা-লিখিয়ে' যাঁর নতুন পালা খুব ঘটা করে স্থানীয় রাজবাটীর পুজার আসরে খোলা হবে—সেই সম্মানী মানুষটিকেও জুড়ী-গাড়ী থেকে নেমে পথশায়ী আতুর মানুষটির সেবায় একেবারে ভেঙে পড়তে দেখে যেন তারা আকাশ থেকে পড়ল—এত বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বুঝি এই প্রথম তারা প্রত্যক্ষ করল। ফলে, মৃগেনের দেখাদেখি, যে সংকোচটুকুর জন্যে এতক্ষণ তারা নির্লিপ্ত ছিল, এখন তার আবেষ্টন কাটিয়ে সকলেই হামরাই হয়ে ছুটে এল ; এমন একটা দরদের ভাব প্রত্যেকের ব্যবহারে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, পথশায়ী আতুর মানুষটির সেবায় কোন রকম অংশ গ্রহণ করতে পারলেই যেন বর্তে যায়—কৃতার্থ হয়!

সুতরাং এতগুলি উৎসাহী লোকের সাহায্যে পীতাম্বরকে বাসায় নিয়ে যাওয়া মৃগেন ও কেষ্টোর পক্ষে এর পর আর কঠিন হোল না। অবশিষ্ট দিন ও সমস্ত রাত ধরেই পীতাম্বরের চিকিৎসা চলল তখন যতদূর সম্ভব ঘটা করে। নাম-করা ডাক্তারকে ডেকে আনা, প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ঔষধ-পত্রাদির ব্যবস্থা—সব কিছুই সুশৃঙ্খলে চলল। ছোটাছুটিতে কেষ্টোর জুড়ী নেই, কাজেই এ বিপদে তাকে পেয়ে মৃগেন যেন বর্তে গেল। রোগীর সেবা-শুশ্রূষার ব্যাপারেও কেষ্টো ওস্তাদ ছেলে, সে যতদূর সম্ভব মৃগেনকে রেহাই দিয়ে নিজেই একা রোগীর সেবায় লেগে পড়তে চায়। মৃগেনকে বলল : আপনি সুখী মানুষ, চেহারা দেখেই ত বুঝি ; রোগী নিয়ে রাত-জাগা আপনার পোষাবে না। তার চেয়ে আপনি বরং ঘুমোন গিয়ে, আমি ওঁকে নিয়ে রাত কাটাই—আমার অভ্যেস আছে।

মৃগেন বলল : আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারি ভাই—তুমি

একা রোগী নিয়ে পড়ে থাকবে! একটা রাত কাটিয়ে দেওয়া যাবে, দু'জনেই জাগবো—কষ্ট গায়ে লাগবে না।

ডাক্তার রুগীকে দেখে বলে গেলেন : শরীরের ওপর খুব কষ্ট গেছে, তাতেই ভেঙ্গে পড়েছেন, তার ওপর বয়েস হয়েছে। বলকারক ঔষধ ও পথ্য চাই—গোটাকতক মিল্ক ইনজেকসান দিতে হবে, তাহলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবেন।

রিহার্সেলের মুখে বউরাণী জোর করে মৃগেনের হাতে শ'পাঁচেক টাকা দিয়েছিলেন। বাসার খরচ-পত্র বউরাণীর সেরেস্তা থেকেই নির্বাহ হয়—কাজেই সে টাকায় মৃগেনকে হাত দিতে হয়নি, এখন সেটা কাজে লাগে। মৃগেন যেন কৃতার্থ হয়ে ভাবে—তাঁর প্রথম উপার্জনের টাকা সত্যিকার সার্থক হয়েছে, সেই সংগে চোখের সামনে ভেসে ওঠে একখানা হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

পরদিন বহু প্রত্যাশিত নাটকের অভিনয়-বাসর। কিন্তু সমস্ত রাত্রির মধ্যেও পীতাম্বরের সংজ্ঞা নেই। মধ্যে এক একবার যদিও চোখ মেলে চান, কিন্তু সে দৃষ্টি যেন নিষ্প্রাণ। মৃগেন বার বার তাঁকে ডেকেছে, নিজের নাম বলেছে, কিন্তু কোন সাড়া পায়নি।

সকালে ডাক্তার এসে রোগীকে দেখে চমকে উঠলেন; বুঝলেন, তাঁর ইন্‌জেকসনে কোন কাজ হয়নি, রোগী সেই ভাবেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন। তিনি এবার নিজেই সন্ধান করে ইন্‌জেকসনের ওষুধ-পত্র আনলেন। তাঁর নির্দ্দেশে সহরের আর এক জন নামী ডাক্তারকে আনানো হোল—দু'জনের সংযোগে নতুন উদ্যমে চিকিৎসা চলতে লাগলো।

বউরাণীর দলে এবং রাজবাড়ীতে সারাদিন ধরে উদ্যোগ আয়োজন

চলছে। রাত দশটার পর 'অভিনয় সুরু হবে। কিন্তু মৃগেনের এখন তার সম্বন্ধে চিন্তারও অবসর নেই। দু'টি লোকই একই ভাবে রোগীর শিয়রে ব'সে—পালা করে উভয়ের স্নানাহার চলে।

রাত্রি আটটার সময় বউরাণীর গাড়ী এসে বাসার দেউড়ীতে থামল। মৃগেন উৎকর্ণ হয়েই ছিল। তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গিয়ে কোচোয়ানকে বলল: তুমি গাড়ী নিয়ে যাও, আমি ঠিক সময়ে নিজেই যাব, তোমাকে আর আসতে হবে না। জিজ্ঞাসা করে মৃগেন জানল যে, দলের সকলেই রাজবাড়ীতে চলে গেছে।

পীতাম্বরের শয্যায় বসে মৃগেন ভাবতে থাকে—তাকে নিয়ে ভাগ্যদেবীর এ কি বিচিত্র খেলা চলেছে! তার বড় সাধের বই আজ হাজার লোকের সামনে রূপবন্ত হয়ে জেগে উঠবে। হাজার লোকের রসনা তাঁকে নিয়ে আলোচনা করবে, হাজার লোকের চক্ষু কর্ণ তার সৃষ্ট জীবগুলির রূপ ও বাণী উপভোগ করবে, আর সে মুকের মত এইখানে বসে কল্পনার বস্তুকে কল্পনাই করবে। অথচ এই দিনটির দিকে দৃষ্টি রেখে কত আশাই সে করেছিল।

কেষ্টো বলল: মৃগেন দা, আমি বলছি আপনি রাজবাড়ীতে যান, সেখানে আপনি কত মান পাবেন—মহারাজা আপনাকে হয়ত পাশে বসিয়ে খাতির করবেন—এমন সুবিধে আপনি ছাড়বেন না। আমি থাকতে এঁর সেবা-শুশ্রূষার কোন ত্রুটিই হবে না তা-ও বলে রাখছি।

কিন্তু মৃগেন একবারে অটল। তার সেই একই কথা: তা হয় না ভাই, জানছি, জীবনের একটা মাহেন্দ্রযোগ আজ—যাবার জন্যে খুবই লোভ হচ্ছে, কিন্তু এ লোভ আমাকে কাটাতেই হবে। একসঙ্গে দু'টো সাধ পুরাণো যায় না। এঁকে বাঁচিয়ে তোলাই আমার আজকের একান্ত

সাধ, কাজেই ওদিককার সাধ-আহ্লাদ ত্যাগ না করলে এ সাধ ত ভগবান পূর্ণ করবেন না ভাই! আমাদের যাত্রা আজ এখানেই।

আশ্চর্য! এই রাত্রেই ভোরের দিকে পীতাম্বর যখন তার দীর্ঘায়ত দু'টি চোখ মেলে তাকালো, একটানা কয়েক ঘণ্টা ঠায় বসে থেকে কেষ্টো তখন মৃগেনের পীড়াপীড়িতে সবে মাত্র গড়াতে গেছে; রোগীর মাথার কাছে একখানা কেদারায় বসে মৃগেন তাঁর রোগশীর্ণ মুখখানার দিকে বদ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে; নূতন বই, তার অভিনয়, খ্যাতি, নিন্দা—এ সব চিন্তার কোন বালাই আজ নেই, সব কিছু আচ্ছন্ন করে ভেসে উঠছে একখানা মুখ—শুধু একখানা অপরূপ মুখ। রোগীর মুখের সংগে সেই মুখের সাদৃশ্য কোন্ অংশে—চোখ, নাক, ভুরু, চিবুক—কোন্‌টি আগেই ঝাঁ করে সেই মুখখানি মনে করিয়ে দেয়, সেই চিন্তাই এখন মৃগেনের সমস্ত মনটিকে ঘিরে রেখেছে। চেয়ে চেয়ে দেখছে আর মনে মনে মিলাচ্ছে মৃগেন, এমন সময় রোগীর চোখের মুদ্রিত পাতাগুলি সহসা খুলে গেল—উভয়ের চোখে চোখে হলো সংযোগ। পরক্ষণে কেঁপে উঠল দু'টি শীর্ণ ঠোঁট, শুষ্ককণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল অতি ক্ষীণ স্বর: মৃগেন!

উল্লাসের সুরে মৃগেন বলল: হ্যাঁ—অধিকারী মশাই, আমি মৃগেন।

মৃগেন লক্ষ্য করল, পীতাম্বরের দুই চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন, অশ্রুর আবর্তে স্বর রুদ্ধ হয়েছে। তাড়াতাড়ি শিশি থেকে ঔষধ ঢেলে মৃগেন রোগীকে পান করাল, তার পর তোয়ালে দিয়ে মুখখানা মুছাতে মুছাতে বলল: কি কষ্ট আপনার হোচ্ছে? ক'দিন ত কথাই বলতে পারেন নি—আমরা কেবল অনুভব-চিকিৎসাই করে চলেছি।

আস্তে-আস্তে টেনে-টেনে পীতাম্বর বললেন: না বাবা, এখন আর

কোন কষ্ট নেই। আমি একটা চৌমাথার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই মনে আছে। তুমি কি সেখানে ছিলে বাবা? তার পর···

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলেই বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগলেন। মৃগেন তখনি উঠে তাঁর বুকে একটা মালিশ লাগিয়ে আস্তে-আস্তে ডলতে লাগল; সেই অবস্থায় বলল: আপনি এখন কথা বলবেন না অধিকারী মশাই, একটু বল পান আগে—তার পর সব কথা হবে।

মৃগেনের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে পীতাম্বর মৃদু স্বরে বললেন: বেশ।

মৃগেন বুঝল, কথা বলবার ও শোনবার একান্ত ইচ্ছা সত্ত্বেও পীতাম্বরের কণ্ঠ তখন নিস্তেজ, স্বর বেরুচ্ছে না।

পরক্ষণেই তাঁর চোখের পাতাগুলি আবার জুড়ে গেল। কেষ্টো এই সময় সদ্য-ধৌত চোখ দু'টি মুছতে মুছতে এসে বলল: একটা ঘুম দিয়ে এলুম দাদা, এবার আপনি গিয়ে একটু গড়িয়ে নিন। তার পর, জ্ঞানটান কিছু হয়েছে কি—চোখ কি মেলেছেন?

মৃগেন বলল: হ্যাঁ, একটু আগেই চেয়েছিলেন, দু'-একটা কথাও বলেছেন। তার পরেই আবার ঘুমিয়ে পড়লেন।

কেষ্টোকে মৃগেন পীতাম্বরের সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু জানিয়েছে যে—তারই গ্রামের লোক, স্বজাতি, সম্পর্কে গুরুজন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাকে সতর্ক করে দিয়েছে—বউরাণীর যাত্রার দলের সঙ্গে তার সম্বন্ধ আছে, এ কথা যেন কেষ্টোর কাছ থেকে কিছুতেই পীতাম্বর না জানতে পারেন।

কেষ্টো উত্তর করে: আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরদারীতে কি দরকার দাদা! সেরে না ওঠা পর্যন্তই ওঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ—উনি উঠে বসলেই আমি সরে পড়ব।

পরদিন সকালে পীতাম্বরকে বেশ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ দেখা গেল। ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন: সেরে গেছেন—আর চিন্তা নেই। এখন পথ্যই ভরসা।

মৃগেন তাঁর পথ্যের কোন ক্রুটিই রাখেনি। ডাক্তারের নির্দেশ মত প্রত্যেক জিনিষটিই—তা সে যত ব্যয়সাধ্যই হোক, সংগ্রহ করে রোগীকেও অবাক করে দিয়েছে। প্রাতরাশের পর মৃগেনকে ডেকে পীতাম্বর বললেন: এ সব কি ব্যাপার বাবা? রাজারাজড়ার মত আমার চিকিৎসে চালিয়েছ যে! চোখেও যে সব ফল-পাকুড় দেখিনি, আমার জন্যে জড়ো করেছ। আমি যে কিছু ভেবে পাচ্ছিনে বাবা, জিজ্ঞাসা করতেও জিভ্ সরচে না যে! কি করে তুমি এ সব…

বৃদ্ধের কথা এখানেই বন্ধ হয়ে গেল, আর বলতে পারলেন না। অবিশ্যি, যে ছেলেটিকে তিনি বেকার বলেই জানেন, তাকে দরাজ হাতে তাঁর জন্যে এত খরচ-পত্র করতে দেখে তিনি মনে মনে ভারি একটা অশান্তি বোধ করছিলেন। তার পর, ইমারতের মত খাসা ঘর, তার দামী সাজ-সজ্জা, আসবাব-পত্র, চাকর, পাচক—এ সব দেখে তিনি ভেবে ঠিক করতে পারছিলেন না—তাঁদের সেই মৃগেন এত ঐশ্বর্য কোথা থেকে পেল!

পীতাম্বরের মনের অবস্থা মনে মনে উপলব্ধি করে মৃগেনই তাঁর সংশয়টা কাটিয়ে দিল। বেশ একটু ভণিতা করেই সে জানাল—তার এক বন্ধুর এই বাড়ী, মৃগেন তাঁর কাছে কনট্রাক্টরী কাজ শিখছে। তিনি একটা বড় অর্ডার পেয়ে বাইরে গেছেন। অতিথি-সজ্জন কিম্বা আতুর রোগীর ওপর তাঁর ভারি দরদ—তাঁদের জন্যে খরচের ঢালাও ব্যবস্থা; যেমন তিনি দেদার উপায় করেন, তেমনি দরাজ হাতে ব্যয় করতেও জানেন। কাজেই আপনার কুণ্ঠার কোন কারণ নেই।

পীতাম্বর দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে মৃগেনের কথাগুলি শুনেই যান—'কিন্তু মনের মধ্যে তবুও কেমন যেন একটা খটকা লাগে। বন্ধুর টাকায় মৃগেনের খরচ-পত্রের এত বাড়াবাড়ি! তাঁর দুর্বল চিত্তটি রীতিমত নাড়া দিতে থাকে।

একটু বেলা হতেই কেষ্টো বাজার থেকে ঘুরে এসে মৃগেনকে আড়ালে ডেকে বলল: দাদা, আপনার পালার যশে সারা সহর ভরে গেছে, লোকের মুখে সুখ্যাতি আর ধরে না। কলকাতার থিয়েটারকেও না কি হার মানিয়ে দিয়েছে।

মৃগেন কেষ্টোকে কথা দিয়েছে, পূজার হিড়িকটা কেটে গেলেই সে তাকে নিজে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে বউরাণীর দলে ঢুকিয়ে দেবে এবং ব'লে-ক'য়ে একটা মাইনের বন্দোবস্তও গোড়া থেকে যাতে হয়—তার ব্যবস্থাও করবে। সেই আশায় কেষ্টো এখন থেকেই এমনি উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে যে, তার কাছে কিছুই যেন আর অসাধ্য বা দুর্বোধ্য নয়। মৃগেনের জন্যে এখন সে সব কিছুই করতে সমর্থ!

দুপুরের সময় বউরাণীর চিঠি নিয়ে এক পাইক উপস্থিত। কম্পিত হাতে মৃগেন খামখানি খুলে চিঠিখানা এক নিশ্বাসে পড়ে শেষ করল। বউরাণী লিখেছেন: যাত্রার আসরে ভীড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন—দেখতে পেলাম না ত। সীতা বলে—পালার সুখ্যাতি শুনে লজ্জায় না কি লুকিয়েছিলেন। আপনার 'মানের' টাকাও নেননি শুনলাম। ম্যানেজার বাবু বললেন যে, আপনাকে না কি খুঁজেই পাননি তিনি। বাসায় ফিরলেন কখন? রাত জেগে ঘুমোচ্ছেন ভেবে সকালে আর গাড়ী পাঠাইনি—বিকেলে গাড়ী যাবে, অবিশ্যি আসবেন। হ্যাঁ, ভাল কথা—সীতারা আজ এগারোটার ট্রেণে কলকাতায় গেলো।

আপনার জন্যে না কি একটা সম্বর্দ্ধনা-সভা করবে ওরা—তাই দেখে-শুনে কেনা-কাটি করবার ইচ্ছা আর কি। তা ছাড়া, ওর মেস থেকেও নেমন্তন্নের চিঠি এসেছে—কোন্ এক বন্ধুর বিয়ে। কাজেই ফিরতে দু'চার দিন দেরী হতে পারে।

বাহকের হাতেই মৃগেন চিঠিখানার এই মর্মে এক জবাব লিখল: আমার এক আত্মীয় এখানে মেলা দেখতে এসে অসুখে পড়েছেন, সে জন্য খুবই ব্যস্ত আছি। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। কাজেই দু-এক দিন বেরুতে পারব না, তার জন্যে ক্ষমা করবেন। তিনি একটু সামলালেই গিয়ে দেখা করব—আপাতত গাড়ী পাঠাবার প্রয়োজন নেই।

সীতারা যে এ সময় সহসা কলকাতায় গেছেন—এ সংবাদে মৃগেন আশ্বস্ত হয়ে মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল। সীতার ভয়েই সে অস্থির হয়ে উঠেছিল—যদি হঠাৎ দমকা বাতাসের মত এই বাসায় এসে একটা অশোভন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে বসে। নিজের ভাগ্যোদয়ের কথা সে যেমন পীতাম্বরের কাছে ব্যক্ত করতে নারাজ, পীতাম্বরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটাও সীতাদের কাছে প্রচ্ছন্ন রাখাই তার অভিপ্রায়। এ অবস্থায় সীতাদের কলিকাতা-যাত্রার সংবাদে নিরুদ্বেগ হওয়াই তার পক্ষে স্বাভাবিক।

দিন কয়েকের মধ্যেই পীতাম্বর সুস্থ হয়ে উঠলেন, দেহে বলও পেলেন। মৃগেন এ পর্য্যন্ত তাঁকে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেনি—কোথায় এত দিন ছিলেন, কি করছিলেন, এখানেই বা কেন এসেছিলেন—এগুলি জানবার জন্যে স্বভাবতই কৌতূহল জাগ্রত হবার কথা, আর কথা-প্রসংগে জিজ্ঞাসা করাও উচিত. কিন্তু মৃগেন ছেলেটি এত চাপা এবং কৌতুহল

দমন করতে এমনি অভ্যস্ত যে, প্রশ্নগুলি একবারেই এড়িয়ে গেল! কেবল পীতাম্বরই কথার পীঠে অসংলগ্ন ভাবে তাঁর পণ্ডশ্রম সম্বন্ধে যে দু'-চারটে কথা বলেছেন—তাই শুনেছে এ পর্য্যন্ত।

—জানো বাবাজী, কালটা হচ্ছে কলি; মানুষের মতি-গতি পালটে গেছে, মুখের কথার দাম আর নেই। এই দেখ না—পরেশ পাল কত আশা দিয়ে নিয়ে গেলো, দেশ-ভুঁই ঘর-সংসার ফেলে ছুটে গেলুম তার কথায় ভুলে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে কি না বিল্বিপত্র গুঁজিয়ে বিদেয় দিলে। এই হোল কালের ধর্ম। কিন্তু আমি তোমার বন্ধুর কথা ভেবে কুল-কিনারা পাচ্ছি নে—ভাবি, সত্য যুগের লোক এ যুগে এলো কি ক'রে!

মৃগেন শুধু মুখ বুজিয়ে শোনে, কোন কথাই বলে না—কোন প্রশ্নও তোলে না।

পীতাম্বর ভেবেছিলেন, মৃগেন হয়ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জিজ্ঞাসা করবে, জানতে চাইবে, তিনিও তখন একটি একটি করে সব বলবেন। কিন্তু মৃগেনকে এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ ও গম্ভীর দেখে তিনিও শেষে মুখ বুজাতে বাধ্য হন, সেই সঙ্গে মনটিও ভার হয়ে ওঠে।

মৃগেন ইতিমধ্যে বউরাণীর সংগে দেখা করেছে, তাঁকে কেষ্টোর কথা বলে তাঁর দলে ঢুকিয়েও দিয়েছে। এ সব ব্যাপারে বউরাণীর সহৃদয়তার অন্ত নেই। বিশেষ করে, দলের ম্যানেজারের ওপর মৃগেনের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তাঁর সিদ্ধান্তে কেষ্টোর সম্বন্ধে যে বেতন সাব্যস্ত হয়—কেষ্টোই তা শুনে চমকে ওঠে।

পীতাম্বরের গায়ের মাপে মৃগেন একটা দামী ফ্লানেলের জামা এনে দেয়—সেই নরম ও গরম জামাটি গায়ে দিয়ে, পীতাম্বর বড় আরামই পেয়েছেন। মৃগেনের সামনে তা ছাড়া মনে মনে কত আশীর্বাদই করেন।

এখন তাঁর মনে সাধ জেগেছে—মৃগেনকে সংগে করেই দেশে যাবেন, আর একটু বল দেহে এলেই হয়। তবে কথাটা এখনো মৃগেনকে বলা হয়নি।

সেদিন হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল মায়ার একখানা চিঠির কথা। চিঠিতে মায়া যেন মৃগেনের সম্বন্ধে কি লিখেছিল—কাজ করতে করতেই সে চিঠি তিনি পড়েছিলেন, সব কথা মনেই আসে না। চিঠিখানা তাঁর পকেটেই ছিল। মলিন জামাটি ছাতির সঙ্গে জড়িয়ে তিনি এই ঘরের একটা কোণেই রেখেছিলেন। কি মনে করে সেটি খুলে চিঠিখানা বার করলেন।

মায়ার চিঠি—ডাকে পেয়েছিলেন তিনি, পরেশ পালের আটচালায় যখন তিনি ঠাকুর গড়া নিয়ে ডুবেছিলেন। খাম থেকে খুলে চিঠিখানি আজ আবার পড়তে বসলেন। কিন্তু মাঝের কথাগুলোর ওপর চোখ পড়তেই দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে এল, বুকের ভিতরটা টন-টন করে উঠল, তিনি আবার পড়তে লাগলেন :

> মৃগদার সংগে আমার বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য পাষণ্ড কানাই সেদিন তালের বড়া লইয়া যে কাণ্ড বাধাইল আজও তাহা আমার বুকে বিষের কাঁটার মতন বিঁধিয়া আছে। কিন্তু দুঃখ এই যে, মৃগদা মশার উপর রাগ করিয়া নিজের গালেই চড় মারিয়া চলিয়া গেলেন। যদি তাহার সহিত দেখা হয় কানায়ের বদমাইসির কথা যাহা উপরে লিখিয়াছি সব বলিও। আর…

পীতাম্বর আর পড়তে পারলেন না, তাঁর মাথার ভিতর তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। চিঠিখানা খামে ভরে পকেটে রেখে তিনি উঠে পড়লেন।

কানাইকে উদ্দেশ করে খানিকটা খুব ঝাল ঝাড়লেন।—শাপ-মণ্যিও দিলেন, মাথার জ্বালা বুঝি তাতে কিছু থামল। তারপর আপন মনে বলতে লাগলেন: আহাম্মুখ আমার মত আর দু'টো নেই—কথাগুলো মেগাকে বলতেই ভুলে গেছি, চিঠিখানা দেখালেইত' সব গোল চুকে যেত। এখন বুঝছি কেন সে সর্বক্ষণ মুখ ভার করে থাকে—কিছুই শুধোয় না। সে ফিরলেই এই চিঠি তাকে দেখাব—তখন বাবাজী বুঝবেন, কার ওপর অভিমান করে মিছিমিছি চলে এসেছেন। তবে এও বলি, ঈশ্বর যা করেন—ভালর জন্যেই করেন; দেশ ছেড়ে এসে মৃগেন ত সুখের মুখ দেখেছেন—একটা হিল্লে তার হয়েছে। যাই হোক, আজই তার ভুল ভেঙে দেব; তার পর তাকে সংগে করে দেশে গিয়ে ঐ কানাই হারামজাদার ছেরাদ্দ পাকাব আগে—দেখাব বাছাধনকে কত ধানে কত চাল।

তখনও বেলা রয়েছে—বৈকালি-সূর্যের পাটে বসবার সময় হয়ে এসেছে। কি একটা কাজে অপরাহ্নের অনেকটা আগেই মৃগেন বাইরে বেরিয়েছে। কিন্তু ঘরে বসে তার ফেরার প্রতীক্ষা করার মত ধৈর্য্যও বুঝি হারালেন পীতাম্বর; পায়ে পায়ে উপর থেকে নেমে নিচের তলায় এলেন, তার পর কি ভেবে ফটক দিয়ে রাস্তায় বেরুলেন। বাড়ীর কাছেই চৌমাথা—মেলার জের তখনও চলছে, কত রকমের কত মানুষ চলেছে পথে। রাস্তাটি দেখে ঝাঁ করে মনে পড়ল সে দিনের কথা—অনাথার মত এইখানেই এসে পড়ে গিয়েছিলেন না? চিঠির বিষয়-বস্তুর কথা আবার মনের তলে তলিয়ে গেল, হঠাৎ একটা মানুষের মুখের পানে দৃষ্টি পড়তে মনটি তাঁর কৌতুহলী হয়ে উঠল। যুধিষ্ঠির সামন্ত না? হ্যাঁ—সেই ত! পরেশ পালের আটচালায় এসে আড্ডা জমাত, তার কারিগরির সুখ্যাতি

মুখে যেন ধরত না! পায়ের গতি দ্রুত করে পীতাম্বর এগিয়ে চললেন যুধিষ্ঠিরকে ধরবার জন্যে।

দু'জনে চোখাচোখী হতেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠল যুধিষ্ঠির। এক গাল হেসে বলল: আরে, অধিকারী মশাই যে—বড় ভাগ্যে দেখা হয়ে গেল!

পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন: এদিকে কোথায় আসা হোয়েছিল সামন্তর পো?

যুধিষ্ঠির বলল: কেষ্টনগরে মেলা দেখতে এসেছিনু গো! রাজবাড়ীতে যাত্রা শুনমু, কি গাওনাই গাইলে—এমন জবর পালা কথনো শুনিনি। হ্যাঁ, আপনি শোননি বুঝি অধিকারী—পিরতিমেগুলো পালের-পো-ই কারসাজি করে সরিয়েছিল, কিন্তু পাপের মৃত্তিকেয় মা ভর করবেন কেন—তাই না ঝড় তুলে ভরা ডুবিয়ে দিলেন। তোমার শ্রমও মিছে হলো, আর পরেশের এ-কূল ও-কূল দু-কূল গেলো! কলি হলেও ধম্মা এখনো আছেন, বুঝলে অধিকারী?

পীতাম্বর স্তব্ধ-বিস্ময়ে এই কাহিনী শুনলেন – মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না—শুধু জোরে একটা নিশ্বাস পড়ল।

যুধিষ্ঠির বলল: এখন হয়েছে কি, তোমার এই নিশ্বেস, পালের-পোকে শেষ করে ছাড়বে। হ্যাঁ, ভাল কথা গো, যে দিন গেরাম থেকে বেরুচ্ছি, পিওন একখানা চিঠি আনে—তোমার নামের চিঠি গো! তুমি চলে গেছ, আর আমিও সদরে আসছি শুনে—চিঠিখানা আমার হাতেই দেয়। তোমার নামের চিঠি বরাবর আম্মার কাছেই দিত কি না। ভাগ্যিস্ এনেছিলুম চিঠিখানা - এই নাও।

পকেট থেকে খামে ভরা এক খানা পুরু চিঠি বা'র করে যুধিষ্ঠির পীতাম্বরের দিকে এগিয়ে দিল। খামের ওপরে পাকা হস্তাক্ষরে পীতাম্বরের নাম লেখা। কিন্তু হস্তাক্ষর অপরিচিত—অন্তত মায়ার কাছ থেকে চিঠিখানা যে আসেনি, শিরোনামার লেখা দেখেই পীতাম্বর সেটা বুঝতে পারল। একবার চোখের সামনে ধরেই চিঠিখানা সে মুষ্টিবদ্ধ করল।

'যুধিষ্ঠির আরও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল : কবে এখানে এসেছ, কোথায় আছ, কি করা হচ্ছে—এই সব। পীতাম্বর ভাসা-ভাসা উত্তর দিয়ে শেষটা জানাল : আমার আর থাকা না থাকা সমান কথাই সামন্ত! পালের-পো যে ঘা'টা দিয়েছে সামলাতে পারিনি আজও।

এর পর বিদায় নিয়ে যুধিষ্ঠির ষ্টেশনের দিকে রওনা হলো। পীতাম্বর চিঠিখানা নিয়ে বাসায় ফিরে এল।

উপরের ঘরে ঢুকেই পীতাম্বর চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করল। দীর্ঘ চিঠি, বিনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথাই প্রেরক লিখেছে। পড়তে পড়তে পীতাম্বরের মাথা আবার গরম হয়ে উঠল। চিঠিখানা লিখেছে—সারদার ভাই এবং তার মহাজনীর বেনামদার নবীন সমাদ্দার। চিঠির প্রথম ভাগটা টাকার তাগাদায় ভরা—বাধ্য হয়েই তাকে নালিশ করতে হয়েছে, অথচ এর কোন প্রয়োজনই ছিল না, অধিকারী যদি অবুঝ না হয়ে মায়াকে তার ভাগলে কানায়ের হাতে সঁপে দিতেন! তার পরেই মৃগেনের প্রসংগটা ফেনিয়ে এমন কায়দা করে বানিয়ে বুনিয়ে লিখেছে যে প্রত্যয় না করে পারা যায় না। কি ভাবে এক যাত্রার আসরে খেমটাউলির সংগে তার ভাব হয়, তারপর তারই আঁচল ধরে সরে পড়ে, তার পর ষ্টেসনে হঠাৎ সমাদ্দারের সংগে কি প্রকারে দেখা হয়ে যায়, আর তার টাকায় তারই ঘাড়ে চেপে লক্কা পায়রা সেজে বেড়াচ্ছে—দক্ষ কথা-শিল্পীর মত ভণিতা করে মাথা খেলিয়ে পাকা হাতে এমন করে বাদামী কাগজে কালির হরফে ফুটিয়েছে যে—পড়তে পড়তে পাঠকের মনেও তার সুস্পষ্ট ছাপা না উঠে পারে না।

একে ত' পীতাম্বর অধিকারী সাংঘাতিক রকমের রগচটা মানুষ, তার উপর চারিত্রিক নিষ্ঠার দিক দিয়ে তাঁর মত নির্দোষ মানুষ খুবই কম দেখা যায়; শুধু তাই নয়—তাঁর মতে 'চরিত্রহীনের ছায়া মাড়ানোও গুরুতর অধর্ম। সেই ব্যক্তির সম্মুখে এমন লোকের বিরুদ্ধে চরিত্রহীনতার এই গুরুতর অভিযোগ—জীবনের চরম সংকটকালে যার স্নাশ্রয়ে থেকেই তাঁকে কালাতিপাত করতে হচ্ছে! অমনি তাঁর মস্তিকে পুনরায় বিষের দাহ সক্রিয় হয়ে উঠল—যে মৃগেন তাঁকে রাস্তা থেকে তুলে এনে রাজার হালে

আশ্রয় দিয়েছে, প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চিকিৎসা করিয়েছে, যার জন্যে আজও তিনি বেঁচে আছেন—তার বিরুদ্ধে এ কি বিশ্রী অভিযোগ! সে একটা কুলটাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে, তবে এই সব ঐশ্বর্য্য সেই···

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল বাইরে ফটকের দিকে। ঘরের জানালা দিয়ে এই সময় তিনি দেখতে পেলেন—মৃগেন বাড়ীতে ঢুকছে, বাইরে একখানা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। টাঙ্গা থেকে নেমে সে তার ভাড়া দিচ্ছে।

পীতাম্বর স্থির করলেন, মৃগেন এলেই চিঠিখানা তাকে দেবেন, সত্য-মিথ্যার পরীক্ষা এখনি হয়ে যাবে।

কিন্তু নিয়তির বিচিত্র লীলা—ঘটনাচক্রে পরক্ষণে আর এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়ে আবার সব ওলট-পালট করে দিল।

টাঙ্গাওয়ালাকে বিদায় দিয়ে মৃগেন উঠানে সবে মাত্র পা বাড়িয়েছে এমন সময় দেউড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল বউরাণীর জুড়ী, গাড়ী থামিতেই সহিস দরজা খুলে দিল, তার পরেই রূপের আলোকে স্থানটি ঝলসিত করে নেমে এল সীতা। গাড়ীর শব্দে মৃগেনও তখন ফটকের দিকে চেয়েছে—চোখাচোখী হতেই জিজ্ঞাসা করল: কবে এলেন?

সীতা বলল: বেশ মানুষ ত আপনি, দেখাই নেই। শীগ্‌গির আসুন, জরুরী কথা আছে—আপনাকে নিতেই এসেছি।

মৃগেন কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে বলবার কোন অবসর না দিয়েই সীতা এগিয়ে এসে তার হাতখানা ধরে সহাস্যে বলল: স্পীকটি নট—লক্ষ্মী ছেলের মতন চলে আসুন, মস্ত সুখবর আছে।

এক রকম জোর করেই সীতা মৃগেনকে টেনে এনে গাড়ীতে তুলল—তার পরই তেজস্বী ঘুটি ঘোড়া রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটল।

কিন্তু এদিকে—উপরের ঘরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে চোখ দু'টো

পাবিয়ে এক ব্যক্তি যে এই দৃশ্যটি লক্ষ্য করছিল, সে দিকে কারো নজর পড়ল না।

জানলার গরাদ দু'টো দু'হাতে ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছেন পীতাম্বর। কোচোয়ানের পদস্পৃষ্ট ঘণ্টার ধ্বনির সংগে গাড়ীর গতি-শব্দ তাঁর কাণে বাজতে লাগল ; মনে হল—বুকের ছাতির উপরে জোরে জোরে কে বুঝি মুষলের ঘা দিচ্ছে।

তবে ত সমাদ্দারের কথা মিছে নয়—চিঠিতে যা লিখেছে, নিজের চোখেও যে এইমাত্র তাই তিনি স্পষ্ট দেখলেন! চোখ-ঝলসানো রূপ, পরণে বাহারী শাড়ী, এক-গা গয়না—সোমত্ত বয়েস, অথচ সিঁথেয় সিঁদুর নেই! পীতাম্বরের বেশ মনে পড়ছে—বেহায়া মেয়েটার হাসি এখনো তাঁর যে দু'টো চোখের দৃষ্টিতে ভাসছে, সে দৃষ্টিতে মাথার কোথাও সিঁদুরের রেখাটিও ধরা পড়েনি। তবে? কোন্ ভদ্দর ঘরের মেয়ে অমন করে ধেয়ে এসে একটা জোয়ান ছেলের হাত ধরে টানাটানি করতে পারে— এই দিনের আলোয় একটা বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে?...তাহলে, এই মেয়েটাই সেই খেমটাউলি—নবীন সমাদ্দার চিঠিতে যার কথা লিখেছে?

ভাবতে ভাবতে পীতাম্বরের দেহের সমস্ত রক্ত বুঝি মাথায় গিয়ে ওঠে। দু'হাতে মাথাটা টিপে ধরে সে বলল: এই খেমটাউলির পয়সায় তাহলে মেগা নবাবী করছে, আর এই পাপের পয়সাই সে কি না....ছি, ছি, ছি— এ পাপের যে প্রায়শ্চিত্তও নেই!....

পীতাম্বর আর ভাবতে পারলেন না—চিঠিখানা মুড়ে দুমড়ে তক্তপোষের উপর ফেলে দিয়ে ক্ষিপ্তের মত ঘরখানার এদিক্ থেকে ওদিক্ পর্য্যন্ত অস্থির ভাবে বার কতক ছুটোছুটি করলেন। হঠাৎ ঘরের এককোণে আলনায় ঝোলানো তাঁর পুরানো ছাতাটার সংগে জড়ানো ময়লা কাপড় ও

ফতুয়াটির উপর নজর পড়ল। অমনি তাঁর মনে হ'লো—যে জামা গায়ে ঝুলছে, যে মিহি কাপড়খানা তিনি পরে আছেন—সেগুলো তাঁর নিজের নয়, মৃগেন দিয়েছে, আর তার জন্যে টাকা যুগিয়েছে ঐ থেমটাউলি মাগিটা! ছি-ছি-ছি, এখনো কি না পাপের পয়সায় কেনা জামা-কাপড় তিনি পরে রয়েছেন! পীতাম্বরের মনে হলো, সর্ব্বাঙ্গ বুঝি জ্বলে যাচ্ছে তাঁর! তখনি ছুটে গিয়ে ছাতিটা সেই অবস্থায় আলনা থেকে নিয়ে এলেন, টেনে টেনে কাপড়খানা খুলে আলাদা করলেন; তার পর মৃগেনের দেওয়া ফরসা কাপড়, ফ্লানেলের নরম পিরাণ একে একে ছেড়ে ফেলে, সেই ময়লা কাপড়-জামা পরে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। এর পরও—এই ঘর, এখানকার বাতাস পর্য্যন্ত তাঁর অসহ্য হল, অজ্ঞাতে যে পাপ করে ফেলেছেন, তার ত আর চারা নেই, কিন্তু এখানে থেকে, সে পাপের বোঝা আর ভারি করবেন কিসের লালসায়? আবার তাঁর মাথা গরম হয়ে উঠল, আর, কিছু না ভাবতে পেরে কর্ত্তব্য, ভদ্রতা, হিতাহিত জ্ঞান—সব ঠেলে ফেলে পাগলের মত টলতে টলতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

উপহারের উপযোগী নানাবিধ সৌখীন জিনিস-পত্রে সীতার ঘরখানি ভরে গেছে। 'ছিন্নমস্তা' গীতাভিনয়ের বিপুল সাফল্যের জন্য নাট্যকারের সম্বর্দ্ধনা উৎসবে এই জিনিসগুলি উপহৃত হবে।

বৌরাণী, সীতা, অশোক—প্রত্যেকেই এক একটি উপহার স্বতন্ত্র ভাবে দেবে। নাট্যকার থেকে আরম্ভ করে, নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সুষ্ঠু অভিনয় করে যারা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, তাদের জন্যও বহু উপহার-দ্রব্য কলকাতা থেকে কিনে আনা হয়েছে।

প্রত্যেক জিনিসটির সংগে এক এক টুকরো মোটা কাগজ ঝুলছে, যাকে

উপহার দেওয়া হবে তার নাম তাতে লেখা আছে। একটি একটি করে প্রত্যেক জিনিসটি সীতা মৃগেনকে দেখাতে থাকে। সেই সংগে প্রশ্নও চলে—কেমন জিনিসটি বলুন? খুসি হবে ত? সে রাত্রে কি সুন্দর গেয়েছিল বলুন ত?

মৃগেনের পক্ষে সব কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় না। রাজবাড়ীর আসরে অভিনয়ের প্রসংগে কোন প্রশ্ন উঠলেই তাকে সন্তর্পণে সেটি এড়াতে হয়। কিন্তু সীতার মত চতুর মেয়ের কাছে বেশীক্ষণ আর এ ভাবে লুকোচুরি খেলা তার পক্ষে সম্ভব হয় না—অবশেষে তাকে স্বীকার করতে হল: দেখুন, তাহলে না বলে পারছিনে—রাজবাড়ীতে সে রাত্রে আমার যাওয়া হয়নি, অভিনয় দেখব কি করে বলুন?

সীতা আর অশোক উভয়েই যেন আকাশ থেকে পড়ে—যুগপৎ উভয়েই সবিস্ময়ে বলে উঠল: সে কি?

মৃগেন বুঝল, আর লুকোচুরি করে লাভ নেই—সব কথাই খুলে বলে ফেলাই ভাল, নতুবা শেষ পর্য্যন্ত পীতাম্বরের সামনেই রীতিমত অপ্রস্তুত হতে হবে। তাই সে তখন একটি একটি করে সব কথাই বলল। কেন সে রাত্রে রাজবাড়ীতে যায় নাই; পীতাম্বর কে—তার সংগে কি সম্বন্ধ তার; শুধু তাই নয়—উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পীতাম্বরের কন্যা মায়ার প্রসংগ; এমন কি, যে সূত্রে সে অভিমান করে গৃহত্যাগ করে—তার কাহিনী পর্যন্ত সব কথাই শুনিয়ে দিল, কিছুই গোপন করল না।

সীতা বলল: এ যে সেই পিদ্দিমের নীচেই অন্ধকার হলো মৃগেন বাবু! আপনি নাটক লেখেন, চরিত্র সৃষ্টি করেন, আর নিজের নায়িকাটিকে ভুল বুঝলেন!

অশোক বলল: তা বলে ওভাবে অভিমান করে বাড়ী ছেড়ে চলে আসা আপনার কিন্তু ঠিক হয় নি!

সীতা বলল : আপনার যেমন বুদ্ধি! অভিমান করে উনি যদি না নিরুদ্দেশ যাত্রা করতেন, তাহলে বৌরাণীর যাত্রার দলে ওঁর নাটক খুলত কে?

অশোক বলল : হ্যাঁ, হ্যাঁ—এটাও ভাববার মত কথা বটে! যাক্, তাহলে মৃগেন বাবুর জীবনে এরই মধ্যে রোমান্সের আলো পড়েছে বলুন! ঐ যে কে এক—কানায়ের কথা বললেন না, ঐ ছোকরাই তাহলে আপনার শিল্পেশনন্দিনীর 'ওসমান' বলুন?

সীতা বলল : তবে আপনি যে এমন চাপা তা কিন্তু জানতাম না মৃগেন বাবু! কিচ্ছুই ভাঙেননি ত নিজে থেকে, জেরা করে করে আমিই ত আপনার গুপ্তকথা বার করলাম। যাক্, ভালই হলো—আমাদেরই কান্ড একটু বাড়ল। কথা-শিল্পীর সংগে চিত্র-শিল্পীকেও সম্বর্দ্ধনা করা যাবে।

অশোক বলল : কিন্তু তার আগে চিত্র-শিল্পীর চোখের সামনেও আলো ফেলা উচিত ত? তিনি যে এখনো পর্যন্ত অন্ধকারে রয়েছেন—সেটা ভেবেছ?

সীতা বলল : হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কাজের কথা আপনি বলেছেন বটে। বেশ ত, তাহলে চলুন—তিন জনেই একসংগে যাওয়া যাক্, তিনি জানুন—তাঁর হবু জামাই কেউকেটা নয়, আর ওঁর ঐ বন্ধুর কথা বাজে!

সীতা চাকরকে ডেকে গাড়ী বার করবার হুকুম দিল। একটু পরেই তিনজনে এক অদম্য কৌতূহল নিয়ে গাড়ীতে উঠল।

মৃগেনের বাসার সামনে গাড়ী এসে যখন থামল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। পাচক ও চাকর পাকশালায় জটলা করছে—বাড়ীর ওপর-তলায়

আলো পড়েনি। মৃগেনের আগেই সীতার তর্জনে চাকর আলো নিয়ে উপরে ছুটল। তার প্রায় পিছনে পিছনে উপরের আলোকিত ঘরখানায় ঢুকে তিন জনেই দেখল—তাদের একান্ত বাঞ্ছিত মানুষটি সেখানে নেই, ঘরের মেঝের ওপর একখানা চুল-পাড় ধুতি ছাড়া-অবস্থায় পড়ে আছে—তক্তাপোষে বিছানো সতরঞ্চির উপরে ফ্লানেলের পিরাণটিরও ঠিক সেই অবস্থা।

সীতা ও অশোক উভয়েই মৃগেনের দিকে তাকাল—মৃগেনের চোখ দু'টো পীতাম্বরের ছাড়া-কাপড় ও পিরাণটির উপর নিবদ্ধ হয়ে যেন কোন গভীর রহস্যের সন্ধান করছে।

আলো জ্বেলে দিয়ে দ্বারের কাছে চাকরটি দাঁড়িয়েছিল। মৃগেন তাকে জিজ্ঞাসা করল: বুড়ো বাবু কোথায় গেছেন জানিস্?

সে উত্তর করল: না—আজ্ঞা।

—সন্ধ্যার আগে তাঁকে এ ঘরে দেখেছিলি?

—না—আজ্ঞা।

—ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা কর্—সে জানে কি না?

চাকর চলে গেলে মৃগেন বলল: জামা-কাপড় ছেড়ে গেছেন দেখছি।

অশোক বলল: কিন্তু গেলেন কোথা?

হঠাৎ সীতার চোখ দু'টো বড় হয়ে উঠল—সংগে সংগে এগিয়ে গিয়ে সতরঞ্চির কিনারা থেকে দোমড়ানো একখানা বাদামী রংয়ের কাগজে লেখা চিঠি তুলে নিল। সেখানা খুলতে খুলতে বলল: একটা সূত্র পাওয়া গেছে।

অশোক জিজ্ঞাসা করল: কার চিঠি?

ততক্ষণে সীতা মোড়া কাগজখানা খুলে পাঠ সুরু করেছে। পড়তে পড়তেই বলল: যাঁর সন্ধানে আমরা এসেছি।

দু'জনেই নির্বাক দৃষ্টিতে সীতার দিকে চেয়ে রইল। মিনিট দু'য়ের মধ্যেই চিঠিখানা শেষ করে একটা নিশ্বাস ফেলে সীতা বলল: ব্যাপার গুরুতর। মৃগেন বাবু 'কুন্তি' হতে গিয়েই নিজের পায়েই কুড়ল মেরেছেন।

মৃগেন নির্বাক্। অশোক জিজ্ঞাসা করল: কুন্তি হয়েছেন—মানে?

চিঠিখানা মৃগেনের হাতে দিয়ে সীতা বলল: মহাভারত পড়েননি—কুন্তি কি রকম করে কথা চেপে রেখে নিজের সর্ব্বনাশ করেছিলেন?

অশোকও এগিয়ে গিয়ে চিঠির উপরে ঝুঁকে পড়েছিল। পড়ার পরেই বলে উঠল: ওরে বাবা, নবীন সমাদ্দার যে সমুদ্দুর গুলিয়েছে দেখি! শিল্লেশনন্দিনীকে মাত করতে খাসা চাল চেলেছে কিন্তু! হ্যাঁ মৃগেন বাবু, আপনার সে থেমটাউলিকে হারিয়ে এলেন কোথায়?

সীতা বলল: থামুন আপনি—কাটা ঘায়ে আর নুণের ছিটে দেবেন না—থেমটাউলির রহস্য আমি ভেঙে দিচ্ছি। কিন্তু আমি ভেবে পাচ্ছি না—হঠাৎ আজ এ চিঠি উনি কি করে পেলেন?

এই সময় পাচক এসে জানাল যে, বিকেলে যখন সে চৌরাস্তার পানের দোকানে বসেছিল, তখন বুড়োবাবু সেখানে বেড়াচ্ছিলেন। সেই সময় জন কয়েক দেহাতী লোক আসে, এক জনের সংগে তাঁর জানা-শোনা ছিল—সেই লোক একখানা চিঠি বুড়োবাবুকে দেয়। চিঠিখানা নিয়ে তিনি বাড়ীতে ফিরে যান। তার খানিকপরেই বৌরাণীর গাড়ী আসে। গাড়ীর পিছনে বসেই সে বাজারে গিয়েছিল।

মৃগেন বলল: তাহলে আজ বিকালেই তিনি চিঠিখানা কারুর কাছ থেকে পেয়েছেন। বাড়ীতে এসে চিঠি পড়েই মন তাঁর বিগড়ে যায়। রগ-চটা মানুষ ত, রাগ আর বরদাস্ত করতে পারেননি। আমার দেওয়া কাপড়-জামা পর্যন্ত ছেড়ে চলে গেছেন।

অশোক বলল : কিন্তু তার আগে আপনাকে ত একবার জিজ্ঞাসা করাও তাঁর উচিত ছিল।

মৃগেন বলল : ওঁর স্বভাব ত আমি জানি। বৌ-রাণীমার দৌলতে আমার শ্রীবৃদ্ধির কথা কিছুই ত তাঁকে বলিনি, আমি জানি—এই নিয়ে উনি একটু ধোঁকায় পড়েছিলেন। তার পর এই চিঠি পড়েই—ওঁর মনে অন্য ধারণা হয়েছে : হয় ত ভেবেছেন—ঐ খেমটাউলির টাকাতেই আমার এমন নপর-চপর—

সীতা নীরবেই এদের কথা এতক্ষণ শুনছিল, এই সময় সে মুখখানা শক্ত করে বলল : শুধু ভাবেননি মৃগেন বাবু, তাকে চোখে দেখেছেনও তিনি। উড়ো চিঠির খবর পড়েই এমন বাড়াবাড়ি কেউ করতে পারে না —যদি না চোখে দেখে।

অবাক্ হয়ে দু'জনেই সীতার মুখের পানে তাকাল। ধীরে ধীরে গাঢ় স্বরে মৃগেন বলল : আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না—কিন্তু চিঠির ঐ খেমটাউলির কথা আমিও এই প্রথম শুনছি। অথচ আপনি বলছেন—অধিকারী মশাই নাকি তাকে দেখেছেন।

কণ্ঠের স্বরে জোর দিয়ে সীতা বলল : নিশ্চয়। নৈলে আপনাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই তিনি চলে যান ? এখন রহস্যটা শুনুন— চিঠিখানা পেয়েই অধিকারী মশাই এই ঘরে এলেন। খাম খুলে চিঠি পড়েই রক্ত তাঁর গরম হয়ে উঠল। কি করবেন ভাবছেন—এমন সময় আপনি বাড়ীতে ঢুকলেন। সংগে সংগে আমিও গাড়ী থেকে নেমে আপনাকে এক রকম জোর করে ধরে গাড়ীতে নিয়ে গেলাম। এই ঘর থেকেই তিনি তা দেখলেন। চিঠির যে খেমটাউলি তাঁর মগজে ঘুরছিল, চোখের সামনে সে এল বাস্তব হয়ে। মনের সন্দেহ কেটে গেল

সব—আর কি এখানে থাকতে পারেন তিনি! হবু জামায়ের সংস্রব কাটিয়ে বেরিয়ে পড়লেন—আপনিও যেমন করে একদিন আপনার বন্ধু কানায়ের সৌভাগ্য দেখে বৈরাগ্যের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন!

মৃগেন বলল: আপনি ঠিক ধরেছেন সীতা দেবী। আমার বেশ মনে হচ্ছে—এই কাপড়, এই জামা তিনি পরেছিলেন। যাবার সময় ঘেন্নায় ছেড়ে রেখে গেছেন। তাঁর নিজের জামা-কাপড় যা ছিল—তাই পরে চলে গেছেন। এই ঘরেই সেগুলো ছিল। যাক—আপনারা বসুন ত।

মৃগেন জামাটা তক্তপোষ থেকে তুলতেই তার পকেট থেকে একখানা চিঠি বেরিয়ে পড়ল। চিঠিখানার দিকে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট হল। এ সেই মায়ার চিঠি—পিতাম্বর এখানা পড়ে জামার পকেটেই রেখেছিল। মৃগেন চিঠিখানার শিরোনামা দেখেই চমকে উঠল। পড়ার সংগে সংগে তার মুখের আশ্চর্য্য পরিবর্তন সীতা ও অশোককে কৌতুহলী করে তুলল।

সীতা জিজ্ঞাসা করল: কার চিঠি এখানা মৃগেন বাবু?

মৃগেন উত্তর করল: মায়ার চিঠি—তার বাবাকে লিখেছে। এই চিঠিখানা যদি আজ সকালেও পড়তে পেতাম—

মৃগেনের স্বর এখানে রুদ্ধ হল, দুই চোখ তার অশ্রু-বাষ্পে ভরে গেছে।

সীতা বলে উঠল: ওকি, কেঁদে ফেললেন যে মৃগেন বাবু!

চিঠিখানা সীতার হাতে দিয়ে মৃগেন বলল পড়ুন আপনি—তাহলে বুঝবেন।

সীতা ও অশোক দু'জনেই পড়ল সে চিঠি। অশোক বলল: ওর দোষ কি, আমারই কান্না পাচ্ছে। কত কষ্টেই এই ছত্রটা তিনি লিখেছেন ভাবুন ত—'দুঃখ এই যে, মৃগেন মশার উপর রাগ করিয়া নিজের গালেই চড় মারিয়া গেলেন'।

সমবেদনার সুরে সীতা বলল: কিন্তু এখন আফশোষ করে কোন ফল ত নেই মৃগেন বাবু! আপনাদের দু'টি প্রাণে যাতে মিলনগ্রন্থি না পড়ে তাই নিয়ে যে একটা রীতিমত চক্রান্ত চলেছে তাতে ভুল নেই। এখন আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে—অধিকারী মশাইকে ধরে ফিরিয়ে আনা। গাড়ীও দাঁড়িয়ে আছে—হেঁটে তিনি আর কত দূর যাবেন? আর দেরী নয়—উঠুন!

তিনজনেই তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়ল। মায়ার চিঠির মর্মস্পর্শী কথাগুলি মৃগেনকে তখন অভিভূত করেছে···অভিভূতের মতই সে তাদের সংগে চলল।

তখন খানিকটা রাত হয়েছে।

টলতে টলতে জনবিরল পথ ধরে চলেছেন পীতাম্বর। তাঁর ভগ্ন দেহ আশ্রয় করে বইছে দুশ্চিন্তা ও বিক্ষোভের একটা বিশ্রী ঝড়। কোথায় চলেছেন তার হিসাব নেই, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, কাউকে কোন প্রশ্ন নেই, আপন মনেই চলেছেন।

সীতার জুড়ি চলেছে রাস্তা কাঁপিয়ে সবাইকে সচকিত করে। মাঝে মাঝে গাড়ীর গতি হ্রাস করে রাস্তার দিকে মুখ খাড়িয়ে দোকানী, পসারী বা পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে সীতা: একটি অচেনা লোককে যেতে দেখেছেন কেউ? লম্বা চেহারা—ফতুয়া গায়ে—হাতে ছাতা?

কে এক জন বলল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখিছি। ঘণ্টাখানেক আগে এই পথ ধরে গিয়েছে যেন—

গাড়ীর গতি আবার দ্রুত হয়।

দূরের রাস্তায় পীতাম্বরও চলে অবিশ্রান্ত গতিতে।

পথ এখন নির্জ্জন। একটা তেমাথার সামনে আসতে পীতাম্বরের গতি রুদ্ধ হল। আর যেন পা চলে না—সর্বদেহ অবসাদে ঝিম ঝিম করছে। কিন্তু তাকে যেতেই হবে—বিশ্রামের অবসর কোথায়। তবে কোন পথে পা বাড়াবেন তিনি—বামে না দক্ষিণে?

ও কি? কিসের ও তীব্র ধ্বনি?···ভট্ ভট্ ভট্—

পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলেন—ভট্ভটিয়া গাড়ী। এক সাহেব আসছে চালিয়ে। শংকায় তাড়াতাড়ি পাশ কাটাতে গেলেন তিনি—সাহেবও মোটর-বাইক সামলাতে না সামলাতে একটা ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন পীতাম্বর। ভগ্নকণ্ঠ থেকে আর্ত্তস্বর খসিয়ে উঠল: মা ব্রহ্মময়ি গো! সাহেবের বাইক তখন থেমে গেছে। ছুটে গিয়ে পীতাম্বরকে তুলে ধরলেন, গায়ের ধুলো ঝেড়ে হাত দু'টি ধরে আশ্বাস দিলেন: চীয়ার অপ্ মাই ওল্ড বয়—সংগে সংগে ফ্লাস্ক থেকে জল নিয়ে মুখে ঝাপটা দিতে লাগলেন। চোখ মেলে চাইলেন পীতাম্বর।

সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন; কোথায় টোমার বাড়ী আছে বাবু?

ধীরে ধীরে পীতাম্বর উত্তর করলেন: অনেক দূর সাহেব! বারাকপুর থেকে দশ ক্রোশ তফাতে শ্রীনগরে আমার বাড়ী।

হর্ষোৎফুল্ল মুখে সাহেব বললেন: অল্ রাইট! আমিও বারাকপুরে যাবে—তুমিকে তোমার গোড়ে লইয়া যাবে।

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই সাহেব অপূর্ব কৌশলে ও ক্ষিপ্রহস্তে পীতাম্বরকে তুলে বাইক-সংলগ্ন বেতের কেরিয়ারে বসিয়ে দিলেন। পীতাম্বর আপত্তি করলেন, বাধা দিতে গেলেন, অনেক কাকুতি-মিনতি করলেন, সাহেব শুধু হাসেন—হাসতে হাসতে তাঁর বাইকে ষ্টার্ট দিলেন।

আবার ভট্ ভট্ ভট্ শব্দে রাতের নির্জন রাজপথ কাঁপিয়ে সাহেবের মোটর-বাইক ছুটল।

খানিক পরে রাস্তার এই তেমাথায় এসে দাঁড়াল সীতার গাড়ী। বামে দক্ষিণে দুই দিকে দু'টি দীর্ঘ পথ। এখন কোন্ রাস্তায় তার গাড়ী যাবে?

পথ নির্জন, একটি লোকেরও দেখা নেই। তিনজনেই পরামর্শ করতে লাগল—কি করবে এখন, কোন্ পথে যাবে?

অগত্যা গাড়ী ফেরাতে হলো। সীতা বলল: বাড়ীতেই চল, মায়ের সংগে পরামর্শ করতে হবে—এ সব ব্যাপারে তাঁর যুক্তি চমৎকার। যা করবার, কাল করা যাবে।

হুকুম পেয়ে কোচোয়ান গাড়ী ঘুরিয়ে নিল। বৌরাণীর বাড়ীর অভিমুখে গাড়ী ছুটল।

*　　*

*

শ্রীনগরে বার্ষিক বারোয়ারী উৎসবটির দিন ঘনিয়ে আসায় এই সময় উদ্যোক্তাদের ঘন ঘন মিটিং-এর সংগে রীতিমত উদ্যোগ-আয়োজন চলেছে। উৎসব সুরু হবার কয়েকদিন পূর্বে 'বসুমতী' কাগজে ছাপা দু'টো খবর সারা গ্রামখানাকে হঠাৎ হক্-চকিয়ে দিল। প্রথম খবর বিয়োগান্ত—প্রত্যক্ষদর্শী কোন সংবাদদাতা অপমৃত্যুর যে মর্মন্তুদ খবরটি দিয়েছেন, এই গ্রামের সংগে তার সংযোগ থাকাতেই এই চাঞ্চল্য। উক্ত সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ: 'মৃগেন রায় নামে এক যুবা বারাকপুরের নিকট ট্রেণ চাপা পড়িয়া মারা গিয়াছে। মৃতের জামার পকেটে প্রাপ্ত কাগজ-পত্র হইতে তাহার নাম জানা গিয়াছে যে, সে খুলনা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর নামক কোন গ্রামের অধিবাসী। এক ঘোমটাওয়ালীর

সহিত নবদ্বীপ যাইতেছিল। কিন্তু তাহার সঙ্গিনীর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

অপর সংবাদে খুব বিস্তৃত ভাবে বৌরাণীর প্রসিদ্ধ যাত্রা-সম্প্রদায়ে অভিনীত 'ছিন্নমস্তা' নাটকের সমালোচনা সম্পর্কে রচয়িতা মৃগেন রায়ের প্রচুর সুখ্যাতি করা হয়েছে। নদীয়ার মহারাজার সভাপতিত্বে পণ্ডিত-মণ্ডলীর মান-পত্র ও উপাধি দান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য ইত্যাদি।

দু'টি খবর নিয়ে খুবই আলোচনা চলেছে। অপমৃত্যু সংবাদের মৃগেন যে যাদব রায়ের নিরুদ্দিষ্ট ছেলে তাতে কারুর সন্দেহের অবকাশ রইল না। আনন্দোৎসবে দুঃসংবাদটা খুবই মর্মান্তিক হোল। যাদব রায় শয্যা নিলেন।

গ্রাম্য মাতব্বররা বলাবলি করেনঃ দেখ অদৃষ্টের খেলা! একই নামের এক জন অপঘাতে প্রাণ দিলে, আর একজন কত যশ পেলে—'ছিন্নমস্তা' পালার কত নাম আজ!

শেষের খবরটাকেও গুরুত্ব দেবার কারণ এই যে, গ্রামের বারোয়ারীতে বৌরাণীর দলকেই বায়না করা হয়েছে—'ছিন্নমস্তা' পালার সুখ্যাতি শুনে।

গ্রামের সকলেই মৃগেন ছেলেটিকে ভালবাসত; বারোয়ারী উৎসবে সে-ও এক জন উদ্যোক্তা ছিল। অন্যান্য বার তারই নির্দেশ মত যাত্রা-দল বায়না করা হোত। আজ সবাই তার অভাব বোধ করে ব্যথা পেল—ছেলেরা বারোয়ারী-মণ্ডপে একটা শোক-সভাও করল। তবে শোকটা আসন্ন উৎসবের আবর্তে আর স্থায়ী হতে পারল না।

এই বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্যেই পীতাম্বরের বাড়ীতে মায়ার বিয়ের আয়োজন একটা যেন নূতনতম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। গ্রামশুদ্ধ সবাই জানত, যাদব রায়ের ছেলে মৃগেনের সঙ্গে হবে পীতাম্বর অধিকারীর

মেয়ে মায়ার বিয়ে। মৃগেনের অপমৃত্যু সংবাদটির সংগে সংগেই যে, সারদার ছেলে কানাইয়ের হাতে মায়াকে তুলে দেবার ব্যবস্থা হবে, সেটা কেউ কল্পনাও বুঝি করেনি; কিন্তু এ বিবাহের ব্যবস্থা না করেও যে উপায় ছিল না—কে তা বুঝবে! একান্ত অসহায় ও নিরুপায় হয়েই গোকুলকেও এ-বিবাহে মত দিতে হয়েছে; আর, রুগ্ন মৃতকল্প সর্বস্বান্ত ভাইয়ের জীবন এবং এই সংসারটির ভবিষ্যৎ ভেবে মায়াও এই বিবাহের নামে মর্মচ্ছেদী যূপকাষ্ঠে স্বেচ্ছায় নিজের মাথাটি গলিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছে। সরস্বতী পূজার পর যে লোকের ফেরবার কথা প্রচুর অর্থ নিয়ে,—সে স্থলে প্রায় দেড় মাস অতীত হয়েছে, পীতাম্বরের আসা ত দূরের কথা, কোন খবর পর্যন্ত তার পাওয়া যায় নি। চিঠির জবাব না পেয়ে পরেশ পালের নামে জবাবী কার্ডে যে চিঠি লেখা হয়েছিল, পরেশ পাল খুব সংক্ষেপে তাতে লিখে জানিয়েছে যে, সরস্বতী পুজোর আগের দিন ঝগড়া করে অধিকারী এখান থেকে চলে গেছে। তার পরের খবর সে জানে না।

এর পর অভাবের তাড়নায় দুঃখ চরম হয়ে দাঁড়ায়, তার উপর সারদার তাগাদা। যে ভাইকে মহাজন সাজিয়ে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়েছিল সারদা—সে ভাই এখন বোনের ইসারায় কঠোর তাগাদায় বাড়ী মাথায় করে তুলেছে। ভাবনায়-চিন্তায় গোকুল আকুল হয়ে যখন ভাবতে থাকে—মৃত্যু ছাড়া আর মুক্তি নেই; ঠিক সেই সময় অতুল এসে ক্রমাগতই কাণে মন্ত্র দিতে থাকে—মায়া মনে করলেই ত সব গোল মিটে যায়; কোন ভাবনাই থাকে না।

কথাটার অর্থ বেশ বুঝেও গোকুল মৌন থাকত প্রথম প্রথম—কথার উপযুক্ত উত্তর তার কণ্ঠে এলেও ভগ্ন দেহে সামর্থের অভাবে প্রয়োগ করতে

পারত না। এর পর যখন মৃগেনের অপমৃত্যুর খবর এলো, তখন অতুল বললো: আর কেন, যার আশায় ছিলে সেই যখন গেল, আর মিছিমিছি ঝঞ্ঝাট বাড়িয়ে কাজ কি? বাপের ভিটে যদি নিলেমে ওঠে—ভাই ভাজ গিয়ে রাস্তায় দাঁড়ায়, না খেয়ে মরে—মায়া কি তাতে খুসি হবে?

গোকুল তথাপি গুম হয়ে থাকে—কোন উত্তর দেয় না। মায়াকেও বিনিয়ে বিনিয়ে অতুল কথাটা শোনায়। এর পর মায়া আর কি করতে পারে? মৃগেনের অপমৃত্যুর খবর যদিও সে ঠিকমত বিশ্বাস করেনি, তবুও কত বড় ঘা যে সে পেয়েছে, কী ভীষণ যাতনা যে মুখ বুজে সে সহ্য করেছে, অন্তর্য্যামী ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কে তা বুঝবে? যিনি বুঝতেন—সেই স্নেহময় বাবা আজ কোথায়? বেঁচে আছেন কিনা কে জানে! অগত্যা এক দিন জোর করে বুকে শক্তি এনে মুখখানা শক্ত ক'রে সে অতুলকেই বললে: আমি রাজী হলে যদি সব দিক্ রক্ষা হয়, আমি মত দিচ্ছি, তুমি যা করবার কর ছোড়দা!

ইসারাতে এত দিন এরা কল-কাটি ঘোরাচ্ছিল; সে আশা পূর্ণ হতেই পারিপার্শ্বিক হাওয়া যেন যাদুমন্ত্রের মত বদলে গেল। যারা কড়া তাগাদায় বাড়ীর উঠান পর্যন্ত দমিয়ে দিয়েছিল, এখন তাদের আলাদা মূর্ত্তি—দাতাও বরদারূপে নূতন সুর তুলেছে। গোকুল অবস্থাটা উপলব্ধি করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। করুণা আঁচলে চোখ-মুখ চেপে নীরবে কাঁদে। সংসার এখন তাদের হাতে, অর্থাৎ রিক্ত সংসারটি হাতে নিয়ে অতুল ও প্রসাদী করেছে পূর্ণ—পিছনে প্রচ্ছন্ন আছে নীরদা।

করুণা মুখখানি ম্লান করে কত কি ভাবে—সেই দারুণ অভাব, সদা নেই-নেই—সে-ও বুঝি অনেক ভালো ছিল এর চেয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে ও-পক্ষের কাবলেওলার চেয়েও চড়া তাগাদা, রুগ্ন স্বামীর অসহায় অবস্থা

মনে পড়লেই সর্ব্বাঙ্গ শিউরে ওঠে, ভয়ে সে চোখ বুজায়; কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি কোথায়? অমনি যে চোখের সামনে ভেসে ওঠে মায়ার ম্লান মুখখানি! বুকের ওপর কে যেন অদৃশ্য হাতে হাতুড়ির ঘা দেয়। ও! নিজেদের নিষ্কৃতির জন্যে হাস্যময়ী নির্মল কমলিনীর উপরে কী নির্মম ব্যবহার করতে হয়েছে আজ! কিন্তু কি করতে পারে এখানে অভাগিনী করুণা—তার অক্ষম সামর্থহীন রুগ্ন স্বামী? ভাই শত্রু, ভাজ শত্রু, চার দিকে শত্রু,—অথচ এই শত্রুরাই আজ দরদী হয়ে তার সংসারের উপর কর্তৃত্ব করছে, জানাতে চাইছে—কি উপকারই করছে অসময়ে! কিন্তু অবস্থার ফেরে আজ এদের মাথা তোলবারও শক্তি নেই, 'না' বলতে ভাষা বার হয় না মুখ দিয়ে—সবই সইতে হচ্ছে! ও, ভগবান! এ কি সাংঘাতিক অবস্থায় ফেললে!

এই সঙ্গীন অবস্থার মুখে উৎসব-মত্ত পল্লীকে সচকিত এবং আনন্দ-নিরানন্দে দিশেহারা বাড়ীখানাকে চমৎকৃত করে অপ্রত্যাশিত ভাবে উপস্থিত হোলেন গৃহস্বামী পীতাম্বর। প্রথমে কেউ তাঁকে চিনতেই পারেনি; আর চিনবেই বা কেমন করে? দামী জামা-কাপড় পরে বাবু সেজে হাওয়া-গাড়ী চড়ে দরিদ্র শিল্পী পীতাম্বর অধিকারী যে গ্রামে আসবে, কেউ কি এটা কোন দিন ভাবতে পেরেছিল?

এখানে বলা আবশ্যক—সেই সাহেব বারাকপুরে গভীর রাতে পৌঁছেও পীতাম্বরকে ছেড়ে দেননি, সাদরে এক সুন্দর কুঠিতে নিয়ে যান। হিন্দু বেয়ারাকে দিয়ে সেই গভীর রাত্রেই দোকান খুলিয়ে খাবার আনিয়ে তাঁকে খাওয়ান। তার আগেই আসবার সময় দীর্ঘপথে তাঁর সম্বন্ধে সব কিছুই প্রশ্ন করে করে জেনে নিয়েছিলেন সেই সদাশয় সাহেব। খাবার পর নতুন ক্যাম্প খাটে তাঁর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে বলেন: মত ডরো

মিঃ অডিকাড়ি—কল্য টুমি গরে যাইবে—আমি বন্দোবস্ট করিয়া ডিবে।

তখনো কি পীতাম্বর জেনেছিলেন যে, সাহেব জেলার কলেক্টর ?… পরদিন সকালে সামান্য একটি ঘটনাকে অবলম্বন করে পীতাম্বরের অদৃষ্ট দেবতা নতুনরূপে দেখা দিলেন যেন। খুব ভোরেই পীতাম্বরের ওঠা অভ্যাস ছিল, সেদিনও উঠেছিলেন তিনি। ভোরের আলোয় হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল, দরদালানে কতকগুলি মূর্ত্তি এলোমেলো ভাবে পড়ে রয়েছে। দেখেই তাঁর শিল্পী-মনটিও বুঝি কি এক গভীর বেদনায় টন-টন করে উঠল; শিল্পীর হাতে গড়া জিনিসগুলির প্রতি এতখানি অশ্রদ্ধা তিনি সহ্য করতে পারলেন না—সব ভুলে গিয়ে অন্তরের দরদ দিয়ে মূর্ত্তিগুলিকে নিয়ে পড়লেন পীতাম্বর। কতক্ষণ সেই কাজে লিপ্ত আছেন খেয়াল নেই তাঁর, হুঁস হলো পিছন থেকে সাহেবের পূর্ব-রাত্রের সেই অশুদ্ধ অথচ মিষ্ট কণ্ঠস্বরে। কোন প্রদর্শনীর ব্যাপারে সাহেব নিজেই এই মূর্ত্তিগুলি আনিয়েছিলেন—এদের আদর্শে নূতন মূর্ত্তি গড়িয়ে কতকগুলি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাকে উৎকীর্ণ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। পীতাম্বরের পিছনে দাঁড়িয়ে সাহেব কৌতুহলী হয়েই তাঁর কাজ দেখছিলেন; ক্রমে কৌতুহল শ্রদ্ধায় পরিণত হলো। এই শিল্পটির প্রতি পঠদ্দশা থেকেই সাহেব অল্প-বিস্তর অনুরক্ত ছিলেন—কর্ম্মরত পীতাম্বরকে এক-নজরে দেখেই তিনি তাঁর শিল্পী-মনের সত্যিকার পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর সযত্ন সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলির আদর্শ তাঁরই নির্দ্দেশে কতিপয় শিল্পী নিয়ে গেছেন, কিন্তু মূর্ত্তিগুলিকে যথাযথ ভাবে স্থাপিত করার দিকে কেউই মনোযোগী হননি।

সাহেব ডাকলেন: মিঃ অডিকাড়ি ?

পীতাম্বর সাহেবকে দেখেই সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন, কুণ্ঠিত ভাবে বলতে লাগলেন : এগুলো যাচ্ছেতাই করে রেখেছে দেখে চুপ করে থাকতে পারিনি হুজুর, যেখানে যেটি থাকা দরকার, তেমনি করে রেখিছি।

সাহেব বুঝলেন, তাঁর পরিচারকদের কাছেই পীতাম্বর জানতে পেরেছেন যে তিনি জেলার হাকিম। মৃদু হেসে বললেন : আপনকার সহিত আলাপ করিয়া আমি কাল জানিয়াছিল যে আপনি শিল্পী আছেন, এখন টাহা প্রট্যয় হইল। এবং জানিল যে আপনি বাষ্টব শিল্পী born artist হইটেছেন।

পীতাম্বর বললেন : হুজুর, আমরা হচ্ছি কারিকর, দরদ দিয়ে মূর্ত্তি গড়ি, মনে করি—তারও প্রাণ আছে। তাই যখন দেখলাম—কোনোটার মাথা নিচু হয়ে আছে—পা দু'টো ওপরে, কোনোটা বা হেলে পড়েছে, কেউ উপুড় হয়ে আছে—দেখেই শিউরে উঠি হুজুর, মনে হলো, বুঝি আমার মাথাটাই কেউ নিচে রেখে পা দুটো শূন্যে তুলে দিয়েছে!

সাহেব বললেন : আমি এক পুষ্টক মড্যে আপনকার বাক্য পাঠ করিয়াছে। এক পণ্ডিত মনুষ্য যেখন ডেখিল টাহার লাইব্রেরীর কেটাব সকল ঐ মূর্ত্তি সকলকার ন্যায় ডিজ্-অর্ডার হইয়া রহিয়াছে, টিনি অনুভব করিল যেন কোন দুড়ণ্ট আড্মি টিনিকে বন্ধন্ কড়িয়া মষ্টক নিম্নে নটো কড়িয়া ডিল।

এর পর সাহেব তাঁকে ড্রয়িং-রুমে ডেকে নিয়ে গেলেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করে পূর্ব্ববৎ বিকৃত বাঙলা ভাষায় যা বললেন, তার মর্ম্ম হচ্ছে : বড়লাট বাহাদুরের উদ্যোগে শীগ্গির একটা খুব বড় একজিবিসন খোলা হবে। কলেক্টর সাহেব সেই সম্পর্কে কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন। অনেক রকমের অনেক মূর্ত্তি গড়ানো হবে।

সাহেব এক-নজরে পীতাম্বরকে দেখেই চিনে নিয়েছেন। এর ভার তিনি তাঁরই উপর দিতে চান। তিনি বিভাগীয় অফিসারকে ডেকে এখুনি তার ব্যবস্থা করবেন। পীতাম্বরের সব কথাই সাহেব পথে শুনে জেনেছিলেন তাঁর টাকার এখন খুব দরকার। সাহেব তারও ব্যবস্থা করে দেবেন।

ব্যবস্থা করতে বিলম্ব হয়নি। অফিসারকে আনিয়ে সাহেব একটা চুক্তিপত্র লিখিয়ে নেন। পীতাম্বরকে সাতশো টাকা তখনি আগাম দেওয়া হয়। সাহেব তাঁর কর্ত্তব্য এইখানেই শেষ করেননি। চাপরাশিকে দিয়ে বাজার থেকে ভাল জামা-কাপড় আনিয়ে বাবু সাজিয়ে মোটর গাড়ী করে তাঁকে বাড়ী পাঠিয়ে দেন। কথা স্থির হয়েছে যে, মেয়ের বিয়ে দিয়েই পীতাম্বর বারাকপুরে গিয়ে কাজের ভার নেবেন। এই ভাবে ভাগ্যের পরিবর্ত্তনের সংগেই পীতাম্বরের চেহারারও আশ্চর্য্য রকম পরিবর্ত্তন হয়েছে।

পীতাম্বরকে দেখে মায়া ডুকরে কেঁদে উঠল: বাবা, তুমি সত্যিই এলে?···যে কান্না এত দিন চেপে রেখেছিল, আজ আর বাধা মানল না। সাড়া পেয়ে টলতে টলতে গোকুল এসে বসে পড়লো দাওয়ার ধারে। তারও চোখে অশ্রুর বন্যা নেমেছে। গোকুলকে দেখেই পীতাম্বর বললেন: য়্যাঁ, এ কি চেহারা তোর হয়েছে রে গোকুলো! বলেই নিশ্বাস ফেললেন জোরে। করুণা ছুটে এসে হেঁট হয়ে শ্বশুরের পায়ে গড় করে উঠানেই একটা মোড়া পেতে দিল। পীতাম্বর যেই মোড়াটির উপর সোজা হয়ে বসেছেন, অমনি অতুলের ঘর থেকে শাঁখ বেজে উঠল। চমকে উঠে পীতাম্বর জিজ্ঞাসা করলেন: ও কি, শাঁখ বাজে কেন রে? ব্যাপার কি?···মায়া আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। গোকুল মুখ ফিরিয়ে

নিল। করুণা চোখে আঁচল দিল। অবাক্ হয়ে তিন জনের মুখের পানে তাকিয়ে পীতাম্বর বললেন: তোরা সবাই যে কাঁদতে সুরু করে দিলি! কেউ ত বললিনি, শাঁখ বাজল কেন?

অতুল ছুটে এসে প্রশ্নের উত্তর দিল: মায়ার যে বিয়ে হচ্ছে কাল, আজ অধিবাস কি না···ও-বাড়ী থেকে শুভকর্মের জিনিসপত্তর এলো এই মাত্তর। ভালোই হলো, তুমি এসে পড়েছ—

সঙ্গে সঙ্গে প্রসাদীও ছুটে এসে শ্বশুরকে গড় করে স্বামীকে একটা ইসারা করলো। সেই সংগে অতুল পীতাম্বরকে বলল: চল না, জিনিসগুলো দেখবে।

মায়ার বিয়ের কথা শুনেই পীতাম্বর একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। এতক্ষণে যেন, অবস্থাটা কতক বুঝতে পেরে মুখখানা তুলে অতুলের পানে চেয়ে বললেন: মায়ার বিয়ে! শুভকর্মের জিনিস এল? ও, তাই গোকুল মুখ ফিরিয়ে বসেছে, বড় বউমা চোখে আঁচল দিয়েছেন, মায়া অঝোরে কাঁদছে, আর তোদের দু'জনের মুখে দেখছি হাসি আর ধরছে না! বাড়ীতে যেন একসঙ্গে আলোছায়ার খেলা চলেছে—ব্যাপারখানা খুলেই বল না রে অত লো—তোর মুখেই শুনি; কার সনে মায়ার বিয়ে দিচ্ছিস্ তোরা?

মুখখানা শক্ত করে অতুল বলল: কেন, কানায়ের সঙ্গে।

পীতাম্বর বললেন: বটে! ও, তাই ওদের চোখে জল, আর তোদের মুখে হাসি! মায়ার বে; অথচ, আমি কিছুই জানলুম না।

অতুল: জানবে কি করে? ছিলে কোথায় য়্যাদ্দিন? জানো, সর্বস্ব বিকিয়ে যাবার যো হয়েছিল,—বাড়ী-জমি বাঁধা দিয়েছিলে মনে নেই? সুদে-আসলে এক-কাঁড়ি হোয়েছিল—গলা পর্য্যন্ত ডুবেছিলুম—

পীতাম্বর : না হয় মাথা পর্যন্তই ডুবতিস্,—কিন্তু কানায়ের সঙ্গে মায়ায় বিয়ে দিলেই কি উদ্ধার পাবি ভেবেছিস্?

অতুল : পাবোই তো, আমাদের মহাজন নবীন সমাদ্দার যে কানায়ের মামা, তা ত জানতে না? আসলে টাকাটা হচ্ছে কানায়ের মা'র—বিয়ে হলে সব ছেড়ে দেবে বলেছে।

পীতাম্বর : তাই বল্, মায়াকে বেচবার মন করেছিস্। বোনকে বেচে বাঁচতে চাস্—এই ত? ও!···এত দূর···

এই সময় পা টিপে-টিপে কানায়ের মা সারদা সামনে এসে দাঁড়াল; মুখখানা ঘুরিয়ে হাসতে হাসতে বলল : এই যে বেই, কেমন আছেন? ভালো হলো এসে পড়েছেন! দেখুন না কাণ্ড—কোথায় মিগেনের সংগে মেয়ের তোমার বিয়ে থা হবে, তা সে হতভাগা ত অপঘাতে মরে আমাদেরও মেরে গেল—

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একটা ঝাঁকুনি খেয়ে পীতাম্বর সোজা হয়ে বসলেন, সংগে সংগে বলে উঠলেন : কি বললে কানায়ের মা? মিগেন···আমাদের মৃগ···

সারদা : হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাদের মিরগো—রেলগাড়ী চাপা পড়ে মরেছে না···

পীতাম্বর : য়্যাঁ, মৃগেন মারা গেছে?

মায়া এবার ডুগ্‌রে কেঁদে উঠলো।···কথাটা উঠতেই প্রসাদী চট করে সরে গিয়েছিল—এই সময় 'বসুমতী' কাগজখানা এনে অতুলের হাতে দিল। অতুল খবরটা এক-নিশ্বাসে পড়ে গেল—সংবাদদাতার নামটি পর্যন্ত।

মনে মনে কৌতুক বোধ করে পীতাম্বর বললেন : ভারি তাজ্জব ত! এই সে দিনও তার সংগে যে আমার দেখা রে?

মায়া সর্বাগ্রে ধড়মড় করে আরো সোজা হয়ে দাঁড়ালো—এতক্ষণ খুঁটিটি ধরে কোন রকমে যেন আধ-ভাঙ্গা হয়ে খাড়া ছিল সে।

পীতাম্বর বলে চললেন: ওরে, আমি ত মরেই যেতুম মৃগেন না থাকলে। পথে মুখ থুবড়ে পড়েছিলুম—হঠাৎ মৃগ এলো দেবদূতের মতন সেখানে; তুলে নিয়ে গেল তার বাসায়। পাকা বাড়ী, খাসা ব্যবস্থা, তোফা বিছানা, ভালো-ভালো জামা, কাপড়, কি খাইদায়ের ঘটা, বড় বড় ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা···ওরে, কি তোয়াজই করছিল আমার—

গোকুলও এতক্ষণে সোজা হয়ে বসেছে—উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: বলছ কি বাবা, মৃগ—আমাদের মৃগেন?

পীতাম্বর: হ্যাঁ হ্যাঁ—বললে, চাকরীর সন্ধানে এসেছি! তার পর হলো কি—বেশ সেরে উঠিছি তখন, দেখলুম, এক পরমা সুন্দরী মেয়ে—রাজকন্যের মতন তার রূপ—কত গয়না-গাঁটি গায়ে—গাড়ী করে এলো, এসেই মৃগেনের হাত ধরে নিয়ে তুললো গাড়ীতে—ওপরের ঘরে দাঁড়িয়ে দেখলুম আমি—মাথাটা অমনি ঘুরে গেলো—মনে হলো, চোখ দু'টো সেই মেয়েটা গেলে দিয়ে গেলো! তার পরই ত তখুনি সেই দণ্ডেই সেখান থেকে চলে আসি রে!

পীতাম্বরের মুখের পানে ঠায় তাকিয়ে তার কথাগুলি সারদা শুনছিল, এই সময় বলে উঠল: তাহলে ত ঠিকই মিলে যাচ্ছে—ঐ হারামজাদীই তাহলে সেই খেমটাউলী ছুঁড়ি—

অতুলও সোৎসাহে বলল: সারদা দিদি ঠিক বলেছে—আমারো মনে হচ্ছে, এর পরেই ঐ অপঘাত ঘটেছে—

মুখখানা শক্ত করে পীতাম্বর বললেন: না না, সে হতে পারে না, ও-খবর মিছে।

অতুল : মিছে বললেই হলো, কাগজে ছেপেছে—

পীতাম্বর : ও অমন ছাপে। মনে নেই—সে বছর রাঘব দারোগার মরার খবর কাগজে ছেপেছিল। তা নিয়ে কি হৈ-চৈ; তার পর, দেশ থেকে রাঘব দারোগা সশরীরে এসে হাজির! এ-ও ঠিক তাই—এতে মৃগর পরমায়ু বেড়েছে।

আরো প্রতিবাদ উঠতে পীতাম্বর বললেন : ভাল কথা, কাগজখানা কোন তারিখের দেখ ত?

অতুল কাগজখানা খুলে তারিখ দেখে বললো : ২৭শে মাঘ, শনিবার।

পীতাম্বর : আর ৫ই ফাল্গুন বুধবার তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি। তাহলে কি করে এ খবর সত্যি হবে? এ কোনো দুষ্টু লোকের কাজ!

অতুল ও প্রসাদীর উৎসাহ দমে গেলেও সারদা হাল ছাড়ল না, সে বলল : তবে বাপু সাফ্ কথা বলি; ও খবর মিছেও যদি হয়, ওকে মরার সামিল বলেই ধরে নেওয়া উচিত। অমন ছেলে বেঁচে থাকলেই বা কি—গেরামে যখন আর মুখ দেখাতে পারবে না। সমাজ ত ওর মুখও দেখবে না—যে একটা বেহুস্তে খেমটাউলীকে নিয়ে ···

মুখখানা বিকৃত করে পীতাম্বর বললেন : থামো বাপু, থামো; এখন যেন সব খোলসা হয়ে আসছে···অতুলো বললে যে, আমাদের মহাজন নবীন সমাদ্দার হচ্ছে কানায়ের মামা····আর ঐ সমাদ্দারই আমাকে চিঠিতে ঐ খেমটাউলীর কথা লেখে! সে না কি বারাকপুর ইষ্টিসানে মৃগের সঙ্গে খেমটাউলীকে দেখেছে। আচ্ছা বাপু, বল ত—টাকার তাগাদা করতে বসে এ খবরটা আমাকে দেবার কি মাথাব্যথা পড়েছিল ঐ সমাদ্দারের?

অতুল বলল : তাহলে কি তুমি বলতে চাও—ওঁর খবরটা মিছে ? তবে বলি, তোমার কথাই যে সত্যি তা মানবো কি করে ? তুমিও ত নিজের মুখে এইমাত্র বললে—গয়না-গাঁটি পরা একটা সুন্দরী মেয়ে এসে মৃগর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়ীতে তুলেছে···তুমি স্বচক্ষে দেখেছ, তার পর তাই দেখেই চলে এসেছ ? তবে ?

ছেলের মুখে এ কথা শুনে পীতাম্বর স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তাই ত, এ প্রশ্নের কি উত্তর তিনি দেবেন ? নিজের মুখের কথাই যে তাঁর এ কথার বিরুদ্ধে চলেছে !

সারদা শ্লেষের সুরে বলে উঠল : আহা—থামো না বাপু, কেন আর মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিচ্ছ ! এসেছেন তেতে-পুড়ে, আগে জিরোতে দাও, মাথাটা ঠাণ্ডা হোক, তখন সবই বুঝবেন ! এখন এদিক্‌কার কাজ ··· '

'এই কি পীতাম্বর অধিকারী মশায়ের বাড়ী ?'

বলতে বলতে উঠানে এসে দাঁড়ালো সীতা। তার পিছনে অশোক চৌধুরী, আর উর্দীপরা এক গুর্খা সিপাহী—কোমরে তার কুকরি বাঁধা, মাথায় মিলিটারী টুপী, চাপরাসে লেখা রয়েছে—এষ্টেট বৌরাণী চৌধুরাণী।

সীতাকে দেখেই পীতাম্বর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন। 'তার পর বড় বড় দু'টো চোখের দৃষ্টি একই ভাবে নিবদ্ধ রেখে সোৎসাহে বললেন : এই যে ! হ্যাঁ···এই ত সেই মেয়েটি···এরই হাত ধরে মৃগেন—

কথাটা তাঁকে শেষ করতে না দিয়েই সীতা বলল : আর, আপনি বুঝি তাই দেখেই আমাকে আপনার মহাজন নবীন সমাদ্দারের উড়ো চিঠির খেম্‌টাউলী মনে করে তখুনি মৃগেন বাবুর বাসা ছেড়ে পালিয়ে এলেন ?

আমি কে, কেন গিয়েছিলুম, কেন তাঁকে ডেকে নিয়ে গেলুম অত তাড়াতাড়ি, সে সব জিজ্ঞাসা করাও দরকার মনে করেননি ?

অপ্রস্তুতের মতন মুখখানার এক বিমূঢ় ভংগি করে পীতাম্বর বললেন : ঠিক, ঠিক, মস্ত ভুলই আমার হয়েছিল তখন। পথের মড়াকে তুলে যে সারালে, অত তোয়াজ করলে, আমি তাকে কিছু না বলেই—

সীতার মুখ তখন খুলে গেছে ; উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সে বলতে লাগল : জানেন, আপনার জন্যই তিনি সৌভাগ্যের সাদর আহ্বানকেও গ্রাহ্য করেননি। আপনাকে জানাননি যে—তিনিই 'ছিন্নমস্তা' পালার নাট্যকার। তাঁর সুখ্যাতি লোকের মুখে আজ ধরে না। তাঁকে মানপত্র দেওয়া হবে—এই খবর দেবার জন্যে আমি তাঁর বাসায় যাই—জোর করে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসি। মৃগেন বাবু আমার ভাই, তাঁর সৌভাগ্যে সুখী হয়ে ছোট বোনটির মতনই আমি তাঁর হাত ধরেছিলুম।

মায়া টলতে টলতে সীতার সামনে এসে দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল : আপনি যেই হোন, শুধু বলুন···তিনি—তিনি তাহলে··· সত্যি সত্যিই···উদ্গত অজস্র অশ্রুর আবেগে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল !

সীতা তার মুখখানা তুলে ধরে সস্নেহে বলল : বুঝতে পেরেছি, তুমিই মায়া। কিন্তু শোনা কথার ত দাম নেই ভাই····নিজের চোখেই তাঁকে এখুনি দেখবে। আমরা যে মৃগেন বাবুকেও ধরে এনেছি। তিনি তাঁর বাবার সংগে আসছেন। সেখানেই যে শুনেছি—আজ তোমার অধিবাস ; তাই····

তার পর পীতাম্বরের দিকে ফিরে বলল : আপনার মহাজন সমাদ্দার মশায়ের চিঠিখানাও রাগ করে ফেলে এসেছিলেন। তা থেকেই সব

জানতে পেরেছি, আর সে চিঠিখানাও এনেছি। কিন্তু সমাদ্দার কোথায়? তাকে ত দেখছি নে?

সারদা এই সময় এগিয়ে এসে চড়া সুরে বলল: তাহলে শোন বলি বাছা, সে যখন মহাজন—মহাজনের মতনই আসবে গামছা নিয়ে ঐ জোচ্চোর মিন্‌সের গলায় দিয়ে···

মুখে এক-ফালি হাসির তীক্ষ্ণ ঝিলিক তুলে সীতা বলল: দেনার ভয় দেখাচ্ছেন ত? আপনিই বুঝি কানায়ের মা? বলি, তাহলে শীগগির যান—তাঁকে বলুন গে, সেই গামছায় বেঁধে যেন দলিলখানাও নিয়ে আসেন—জানেন, মৃগেন বাবুর এখন আয় কত? একখানা পালা লিখে কত টাকা পেয়েছেন? দেনার টাকা আগেই তিনি তুলে রেখেছেন।

পীতাম্বর নীরবেই সীতার কথা শুনছিলেন। এখন সংযত কণ্ঠে বললেন: তার আবশ্যক হবে না মা-লক্ষ্মী! জামায়ের টাকায় দেনা শোধবার লজ্জা থেকে লজ্জা-নিবারণী মা আমাকে বাঁচিয়েছেন। যাঁর প্রতিমা গড়ি—তিনিই রেখেছেন মুখ। ওগো কানায়ের মা—খতখানা শীগগির আনো—আমার এই মা-লক্ষ্মী যা বললেন—

এখন শেষের অস্ত্রটি নিক্ষেপ করল সারদা। তীক্ষ্ণ শ্লেষের সুরে বলল: খেম্‌টাউলী ত মা-লক্ষ্মী হলেন দেখছি; তা এই মা-লক্ষ্মীটি কে শুনি? ভাটপাড়ার কোন্ মা-ঠাকরুণ ইনি গো?

সারদার এ প্রশ্নের উত্তর করল অশোক চৌধুরী। এ পর্যন্ত কোন কথা বলবার সুযোগ না পেয়ে সে যেন অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল। সারদার কথাটি ইটের মত পড়তেই সে-ও তৎক্ষণাৎ পাটকেলটি প্রয়োগ করে বসল। মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বলল: আমার মুখেই শুনুন না বলি—ঠাকুরুণটির পরিচয় পেলে মনের ঝাঁঝটুকু কমে যাবে নিশ্চয়ই। বৌরাণীর নাম

শুনেছেন ত ? এই পরগণার বারো আনার মালিক তিনি—এখানকার জমিদারীর মালিকানা স্বত্বেও তাঁর হিস্যা আছে—ইনি তাঁরই কন্যে, বুঝলেন ?

জোঁকের মুখে যেন নুন পড়ল। অশোক চৌধুরীর কথাগুলো যে সক্রিয়, সারদার পরবর্তী অবস্থা থেকেই সেটি বুঝা গেল। ক্রুদ্ধ মুখখানা তখন ছায়ের মত বিবর্ণ হয়েছে, দুই চোখের দীপ্তি ম্লান হয়ে গেছে। সারদা শুনেছিল, শ্রীপুর এষ্টেটের বড় সরীকের হিস্যাটি বৌরাণীর সরকার চড়া দরে সম্প্রতি খরিদ করেছেন এবং সারদার ভিটে-বাড়ী-জমি-জেরাৎ সব কিছুই এই জমিদারীর মধ্যে।

সারদার মনোরাজ্যে যখন এই বিপ্লব চলেছে, সেই সময় মৃগেনকে নিয়ে উল্লাসের সুরে অধিকারীকে ডাকতে ডাকতে বাড়ীর উঠানে উপস্থিত হলেন যাদব রায়। পীতাম্বরকে অভ্যর্থনা করবার অবসর না দিয়েই তিনি বলে উঠলেন : ভাই অধিকারী, সবই জেনেছি আমি, সব শুনেছি। এই দেখ—মেগাকে নিয়ে এসেছি, আজ থেকে এর ওপরে আমার অধিকার নেই—মৃগেন এখন তোমাদের।

পীতাম্বর উত্তর করলেন : মা জগদম্বা আমারো মুখ রেখেছেন ভায়া! 'মরদকা বাত, হাতীকা দাঁত!' পণের টাকা আমার সব তৈরী—ধুলো পায়েই দোব বলে এখনো পায়ে জল দিইনি ; এই নাও।

বলতে বলতে পীতাম্বর জামার পকেট থেকে খামে ভরা নোটের পুলিন্দাটি বার করলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, যাদব রায় যেন একেবারে বদলে গেছেন, মাথা নাড়তে নাড়তে কণ্ঠস্বর গাঢ় করে বললেন : না হে অধিকারী না—টাকার কথা আর বোল না দাদা! তোমার মৃগেন ঢের টাকা এনেছে—উপলক্ষ হয়েছেন ঐ সীতা মা! বিনা পণেই আমি

তোমার মেয়েকে নিতে এসেছি—আয় মা, আয়, অধিবাস সত্য হোক, সার্থক হোক—

সীতাও এই সময় এগিয়ে গিয়ে মৃগেন ও মায়ার হাতে হাত মিলিয়ে সহাস্যে বলল : মায়া মৃগ এক হোক্—সেই সংগে জেগে উঠুক গ্রাম।

সীতার কথার সংগে সংগে শাঁখ বাজিয়ে করুণা সত্যিই গ্রামখানাকে জাগিয়ে দিল।

সমাপ্ত